সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

নির্বাচিত রচনাবলী

১

দ্বিতীয় ভাগ

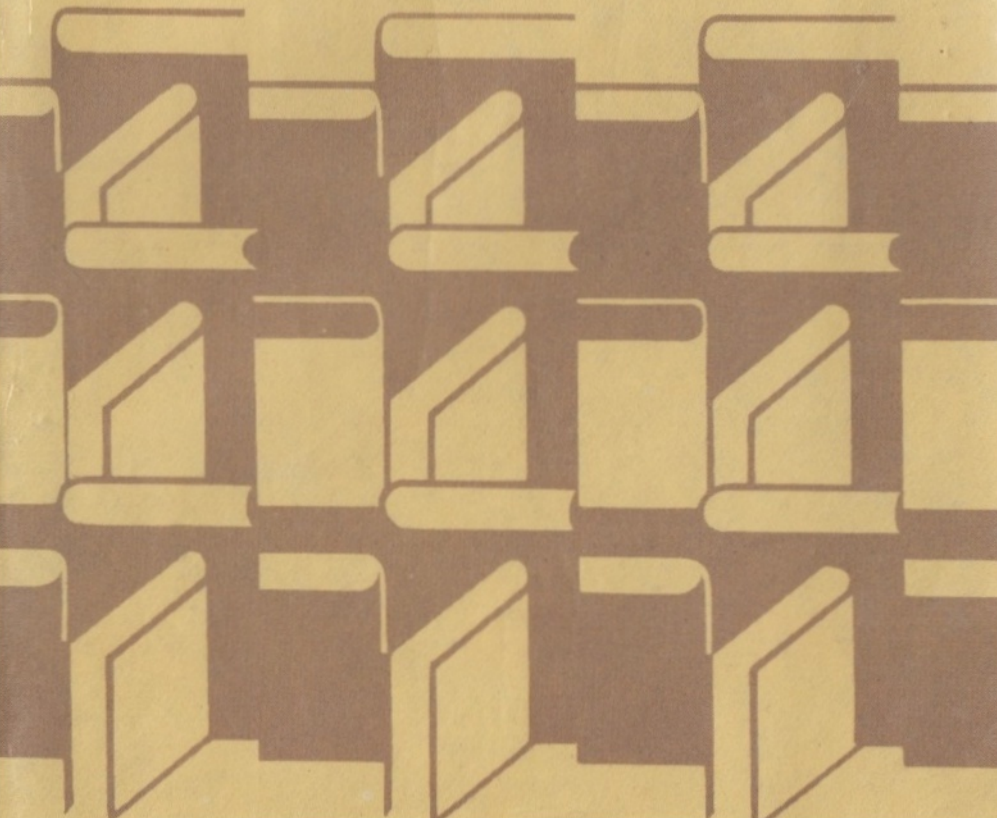

নির্বাচিত রচনাবলী

প্রথম খন্ড—দ্বিতীয় ভাগ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ১৮৪

১ম সংস্করণ
জমাদিউস সানি ১৪১৩
অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
ডিসেম্বর ১৯৯২

বিনিময়ঃ ৮০·০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تفہیمات -এর বাংলা অনুবাদ

NIRBACHITO RACHONABALI by Sayyed Abul A'la Maudoodi
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka- 1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane,Banglabazar,Dhaka-1100.

Price: Taka 80·00 only.

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

আমাদের কথা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সবাই তাঁর এ পরিচয় জানে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুমুখী। তবে আমি বলবো, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর লেখা। তাঁর চিন্তার ধারার লিখিত রূপ। তাঁর লিখিত কুরআনের তাফসীর তাফহীমুল কুরআন আজ বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি যুবক যুবতীর দৈনন্দিনকার পাঠ্য বই। বস্তুত, তাঁর সমস্ত লেখাই জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ফল্গুধারা। তাঁর লেখা পড়ে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ যুবকের ঘুম উঠে গেছে।

তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম 'তাফহীমাত'। এর অর্থ, বুঝিয়ে দেয়া বা বুঝে নেয়ার বিষয়। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যুক্তি প্রমাণের নিখাঁদ শৈলীতে লেখা কতিপয় প্রবন্ধ নিবন্ধের সংকলন তাঁর এ গ্রন্থ। গ্রন্থটি চমৎকার রচনা শৈলীতে মনোজ্ঞ। ভাবের সম্মোহনে গতিমান। যেন জ্ঞানের চৌমোহনা। জ্ঞান পিপাসুর সুশীতল পাণীয়। এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়টি নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন, সে বিষয়েই জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা নিবারণ করার মতো করে লিখেছেন। তা পড়ে নেবার পর মন প্রশান্তি লাভ করে।

গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ১ম খন্ডটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে 'মওদূদী রচনাবলী' নামে প্রকাশ হয়েছিল। অনেকেই এ নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আসলে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা কষ্টকর। তাই, আমরা এখন ভেবেচিন্তে গ্রন্থটির নাম রাখলাম 'নির্বাচিত রচনাবলী'।

গ্রন্থটি দ্বারা চিন্তাশীল মহল উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

নাজাতের জন্যে কালেমায়ে তাওহীদ-ই কি যথেষ্ট?	১১
নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী?	২৪
নবুয়াতের প্রতি ঈমান	৩৮
কুরআনের প্রতি সব চাইতে বড়ো অপবাদ	৫১
বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়াত	৭২
রসূলের আনুগত্য ও অনুবর্তন	৯১
রসূলের ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তা	১০৮
নবুয়াত ও তার বিধিবিধান	১১৭
হাদীস ও কুরআন	১৫২
সুষম মতবাদ	১৮২
প্রশ্নোত্তর	১৯৬
হাদীস সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন	২০২
কুরআন ও সুন্নাতে রসূল	২১০
একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তার জবাব	২১৭

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাজাতের জন্যে কালেমায়ে তাওহীদ-ই কি যথেষ্ট?

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ এই হাদীসে প্রথমত ঈমান বির্ রিসালাত (নবুয়াতের প্রতি ঈমান) ছাড়াই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআন মজীদে স্পষ্টত ঈমান বির্ রিসালাতের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাকীদ করা হয়েছে। এমন কি, ঈমান রির্ রিসালাত ছাড়া কেউ হেদায়াত বা কল্যাণপথ লাভ করতে পারে না—পরকালীন জীবনেও তার জন্যে কোনো সাফল্য নেই। দ্বিতীয়ত, এই হাদীসে সৎকর্মেরও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সৎকর্ম যদিও ঈমানের অংশ নয়, কিন্তু কুরআনে করীমে পরকালের সাফল্য ও পুরস্কার এবং জান্নাতের সুসংবাদ কেবলমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরই দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ . . . جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ -(البينه : ٧-٨) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ -(النساء : ٥٧) وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ -(لتغابن : ٩)

আমার স্থূল দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীসটিকে কোরআনের বিপরীত বলে মনে হয়। মেহেরবানী করে আপনার গভীর পাণ্ডিত্য ও সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে এই বিভ্রান্তি নিরসন করে আমায় বাধিত করবেন। (জনৈক সত্যসন্ধ, নিজামাবাদ)

আলোচ্য হাদীসটি কুরআনের বিপরীত—এটি একটি ভুল ধারণা। কাজেই সর্বপ্রথম এই ভুল ধারণাটিরই অপনোদন হওয়া উচিত। কারণ কুরআন মজীদেও এক জায়গায় বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

-(حم السجده : ٣٠)

www.bjilibrary.com

'নিশ্চয়ই যারা বলেছে যে, আল্লাহই আমাদের প্রভু, অতপর (একথায়) দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তাদের ওপর ফেরেশতাগণ অবতরণ করে (এবং বলে যে,) তোমরা ভয় পেয়ো না, শঙ্কিতও হয়ো না; বরং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানেও আপনার উদ্ধৃত হাদীসের কথাই অন্য ভাষায় বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে যেমন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না যে, পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের জন্যে তওহীদ বিশ্বাসই যথেষ্ট—এ ব্যাপারে ঈমান বির-রিসালাত ও সৎকর্মের আদৌ প্রয়োজন নেই, তেমনি উপরিউক্ত হাদীস থেকেও এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি যেমন আপনার পেশকৃত আয়াতগুলোর বিরোধী নয়, তেমনি আলোচ্য হাদীসটিও ঐ আয়াতগুলোর পরিপন্থী নয়।

হাদীস ও কুরআন উপলব্ধি করার ব্যাপারে সাধারণত একটি মস্ত ভুল করা হয়। তা হলো এই যে, কুরআন ও হাদীস-গ্রন্থকে লোকেরা সাধারণ পুস্তকের মতোই দেখতে ইচ্ছুক। তারা মনে করে যে, অন্যান্য পুস্তকে যেমন এক একটি বিষয় এক এক জায়গায় পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়, কুরআন ও হাদীসেও বুঝি তেমনি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি মোটেই সেরূপ নয়। কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থা উপলক্ষে ও প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। অনুরূপভাবে তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন অবস্থা, উপলক্ষ ও প্রয়োজন অনুযায়ী হযরত (স) যে সকল কথা বলেছেন, হাদীসে তা-ই একত্রিত করা হয়েছে। এই দুই গ্রন্থের প্রথম বিষয় হলো ইসলামের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও আদর্শ—এটি বারবার বিভিন্নরূপে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো ইসলামের বিস্তৃত বিধিবিধান—এটি কোথাও একত্রে, আবার কোথাও পৃথক পৃথকরূপে বিভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে বিবৃত করা হয়েছে। কাজেই এ থেকে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সমস্ত বিষয়ের ওপর ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। নচেত কোনো জায়গা থেকে একটি খণ্ডিত অংশ নিলে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একেই একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জিনিস মনে করে বসলে নিশ্চিতরূপে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কুরআনের কোথাও শুধু ঈমান বিল্লাহর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (ওপরে যেমন উদ্ধৃত হয়েছে)। কোথাও শুধু

www.bjilibrary.com

পরকাল বিশ্বাসের জন্যে তাকীদ করা হয়েছে (আনআম ঃ ৪)। কোথাও আল্লাহর সাথে পরকালের উল্লেখ করা হয়েছে (বাকারাহ ঃ ৮)। কোথাও আল্লাহর সাথে নবীদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (আলে-ইমরান ঃ ১৮)। কোথাও আল্লাহর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ করা হয়েছে (নূর ঃ ৯)। কোথাও পরকাল ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস পোষণের জোর তাকীদ করা হয়েছে (নিসা ঃ ১)। কোথাও আল্লাহ, রসূল ও ফিরেশতাদের প্রতি অবিশ্বাসকে কুফরী ও ফাসেকী আখ্যা দেয়া হয়েছে (বাকারাহ ঃ ১২)। কোথাও ঈমানের পাঁচটি শাখা—অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান, রসূলের প্রতি ঈমান, কিতাবের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ও পরকালের প্রতি ঈমান—বিবৃত করা হয়েছে (বাকারা ঃ ২২)। এসব বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে মূলত কোনোই বিরোধ নেই। বরং এক জায়গায় ঈমানের গোটা বিষয়বস্তুকে একত্রে বিবৃত করে অন্যান্য স্থানে তার দু' একটিকে প্রয়োজন অনুসারে বেশী গুরুত্বের সাথে পেশ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি এই মূল জিনিস থেকে বিচ্যুত হয়ে যে কোনো একটি আয়াত নিয়ে দাবী করে বসে যে, মুমিন হবার জন্যে শুধু আল্লাহর একত্বের প্রতি কিংবা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি অথবা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনাই যথেষ্ট, আর সেই সঙ্গে ঈমানের বিষয়বস্তু থেকে কতক বিষয়কে অস্বীকার করলেও কতক বিষয়ের স্বীকৃতি মানুষের পক্ষে লাভজনক হতে পারে বলে ধারণা পোষণ করে—তবে তা হবে কুরআনের ভাষা ও তার বাচনভঙ্গি সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক।

অনুরূপভাবে কুরআনের কোথাও শুধু ঈমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমনঃ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا কোথাও মুক্তির জন্যে ঈমানের সাথে সৎকর্ম ও তাকওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমনঃ

وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -(ال عمران : ١٧٩) وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ পরন্তু সৎকর্মের মধ্যেও কোথাও একটির প্রতি তাকীদ করা হয়েছে, কোথাও করা হয়েছে অপরটির প্রতি। কোথাও নামায-রোযার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোথাও সততা, ন্যায়পরতা ও সদাচরণের প্রতি, কোথাও নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্বের প্রতি, কোথাও সহৃদয়তা ও নিকটাত্মীয়দের অধিকারের প্রতি,

www.bjilibrary.com

কোথাও ইয়াতীম ও মিসকীনদের তত্ত্বাবধানের প্রতি, কোথাও পিতামাতার খেদমতের প্রতি, কোথাও বৈবাহিক আইনের সীমারক্ষার প্রতি আবার কোথাও হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়কে নিজ নিজ জায়গায় এমনিভাবে বিবৃত করা হয়েছে, যেনো মুক্তি ও কল্যাণ সম্পূর্ণত এর ওপরই নির্ভরশীল। যদি কেউ এই গোটা বিধিবিধান ও হেদায়াত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কেবল একটি মাত্র আয়াত আকড়ে ধরে এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কুরআন মজীদ সৎকর্ম ছাড়া শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই মুক্তির সুসংবাদ দেয় কিংবা সৎকর্মের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়া শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত বা সতীত্ব-সহৃদয়তাকেই যথেষ্ট মনে করে, তবে তা হবে একান্তভাবেই তার জ্ঞান ও বুদ্ধির দৈন্যের ফল। কারণ কুরআন তার সামগ্রিক শিক্ষার ভেতর মানুষের আদর্শিক ও বাস্তব জীবনের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পেশ করেছে। তাতে ঈমান-আকীদা, নীতিদর্শন, বাস্তব আইন-কানুন সব কিছুই যথাযথভাবে বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এই জিনিসগুলোকে অন্তর্নিবিষ্ট করার জন্যে সে একটি বিচক্ষণ পন্থা অবলম্বন করেছে। তাহলো এই যে, এক একটি হেদায়াতকে সে পৃথক পৃথকভাবে যথাযোগ্য সময় ও সুযোগে মানব-মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। উদাহরণত বলা যায়ঃ কখনো একটি বিশেষ ঘটনা সামনে এলো। দেখা গেলো, তখন এক বিশেষ হেদায়াত গ্রহণ করার জন্যে লোকদের মন তৈরী। অমনি সে হেদায়াতটি নাযিল করা হলো এবং এমনি গরুত্ব সহকারে নাযিল করা হলো যে, লোকদের হৃদয় ও আত্মার সাথে তা একেবারে মিশে গেলো। এমনিভাবে কখনো কোনো বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর শিক্ষার জন্যে হযরতকে আদেশ করা হয়েছে। তখন সেই জন-গোষ্ঠীর বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে তার সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় হেদায়াতই দেয়া হয়েছে। কখনো কোনো বিশেষ জিনিস শিক্ষা দেবার প্রয়োজন দেখা দিলো। এ জন্যে প্রথমত ইপমা-উদাহরণ অতীত জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত, নবীদের কাহিনী এবং বহির্জগতের দৃশ্যাবলীর সাহায্যে লোকদের মনকে তা গ্রহণের, উপযোগী করে তোলা হলো। তারপরেই আসল শিক্ষাটি পেশ করা হলো, যাতে করে তার প্রভাব মানবাত্মার সাথে একাকার হয়ে যেতে পারে। মানুষের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে এহেন বিচক্ষণ নীতি এ জন্যেই অবলম্বন করা হয়েছিলো যে, নিছক একটি পরিকল্পনা ও একটি হেদায়াতনামা রচনা করে দেয়াই আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং প্রকৃতপক্ষে সে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা এবং

www.bjilibrary.com

তদনুসারে একটি মানব গোষ্ঠীর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধান করাও তাঁর লক্ষ্য ছিলো। আর এ জন্যে পর্যায়ক্রম, ধারাবাহিকতা, সময় ও সুযোগের উপযোগিতা এবং মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি সুবিবেচনার একান্তই প্রয়োজন ছিলো।

নবী করীম (স)ও ঠিক এই বিচক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত নীতিই অনুসরণ করেছেন। ২৩ বছরের পয়গাম্বরী জীবনে প্রতি মুহূর্তই তিনি আদর্শের প্রচার, লোকদের সংশোধন ও হেদায়াত দানের কাজে মশগুল থাকতেন। সকল শ্রেণীর লোকই তাঁর কাছে আগমন করতো। প্রত্যেকের যোগ্যতা, প্রতিভা ও মানসিকতা এবং নৈতিক, আদর্শিক ও বাস্তব অবস্থা আলাদা ছিলো। এমতাবস্থায় তিনি যদি হামেশা সবাইকে একই গদবাঁধা কথা বলতেন এবং একই ধরনের হেদায়াত দিয়ে বিদায় দিতেন, তাহলে ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টির মতো সাফল্য তিনি কোনো দিনই লাভ করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন মহান কুশলীর প্রতিনিধি। সে কুশলী তাঁর নিজস্ব কিতাবে হেদায়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তিনিও তাঁর অনুসরণ করতেন। আদর্শ প্রচারের ব্যাপারে তিনি সময় ও সুযোগের উপযোগিতার প্রতি হামেশা লক্ষ্য রাখতেন। যখন যে কথার সুযোগ আসতো, তখন সে কথাই বলতেন এবং তা সোজা গিয়ে লোকদের অন্তরে বদ্ধমূল হতো। এ জিনিসগুলো হাদীস-গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলোর প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলেই জানা যাবে যে, নবী করীম (স)-এর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কি ছিলো এবং তা কিভাবে তিনি লোকদের অন্তর্নিবিষ্ট করাতেন। এমতাবস্থায় ঐ বিচ্ছিন্ন এককগুলোকে সম্মিলিত করে যদি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা তৈরী করা না হয়, বরং এক একটি অংশকে পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে তা থেকে আলাদা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা হয়, তবে ঠিক কুরআনী আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার মতো ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

এই নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সকল হাদীসে নবী করীম (স) ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করেছেন, সে সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

একবার তিনি সফরে ছিলেন। এক বেদুঈন এসে তাঁর উটের রজ্জু আকড়ে ধরে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমায় এমন জিনিস বাতলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী ও দোযখ থেকে দূরবর্তী করে দিবে। তিনি বললেনঃ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَ تُؤْتِى

www.bjilibrary.com

الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ "আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েক করো, যাকাত আদায় করো এবং নিকটাত্মীয়দের অধিকার দান করো।" লক্ষণীয়, আলোচ্য ব্যক্তি তাঁর নবুয়াতে বিশ্বাসী, পরকালে আস্থাশীল। সে ইসলামকে গ্রহণ করেছে। তার গোটা ঈমান, আকীদা ও বিস্তৃত নৈতিক শিক্ষা কাম্য নয়। সে কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যে হেদায়াত প্রার্থনা করছে। তাই নবী করীম (স) তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে পথনির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে বিশ্বাসের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায় করো। বস্তুত তার জন্যে এটুকু শিক্ষাই ছিলো যথেষ্ট।

আর একবার এক বেদুঈন এসে আরয করলোঃ হে রসূল! আমায় এমন কাজের কথা বলুন, যা আমায় জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ

تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَ تُؤْتِى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ সে কাজটি হলোঃ তুমি আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায আদায় করবে, নির্ধারিত যাকাত দান করবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে। সে বললোঃ আল্লাহর শপথ! আমি এর চাইতে কিছু বেশী বা কম করবো না। লোকটি চলে যাবার পর নবী করীম (স) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে চক্ষু শীতল করতে চায়, সে এই লোকটিকে দেখে নিক। এবার হযরতের শিক্ষা, লোকটির জবাব এবং তাঁর শেষ কথাটি প্রণিধান করার বিষয়। তাঁর সামনে একজন সাচ্চা মুসলমান ছিলো। তাঁর প্রতিটি হেদায়াত সে সত্য মনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো। কাজেই তাকে শুধু এই টুকু বুঝিয়ে দেবারই প্রয়োজন ছিলো যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্যে বড়ো বড়ো কৃচ্ছ্রসাধনা ও কষ্টসাধ্য ব্রত উদযাপনের প্রয়োজন নেই, উপর্যুপরি রাত জেগে তসবিহ্-ওজীফা পড়ারও আবশ্যকতা নেই। এ বৈষয়িক জীবনের কাজকর্মের মধ্যেই যদি তুমি তোমার আকীদা-বিশ্বাসকে শীর্‌ক থেকে মুক্ত রাখো এবং আল্লাহর আরোপিত ফরয কাজগুলো আদায় করতে থাকো, তা হলেই তুমি জান্নাত পেতে পারো।

এরপর আর এক ধরনের হাদীস দেখুন-

www.bjilibrary.com

একদা মায়াজ বিন্ জাবালকে কোথাও একটি মিশন নিয়ে পাঠাবার সময় তিনি বললেনঃ তুমি কিতাবধারীদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে পৌছবে। তাদেরকে সর্বপ্রথম তুমি কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্যদান করার এবং আমাকে আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে স্বীকার রবার আহ্বান জানাবে। এগুলো মেনে নিলে তাদেরকে বলবেঃ আল্লাহ্ দিনরাতের মধ্যে তোমাদের প্রতি পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। এটিও মেনে নিলে তাদেরকে বলবেঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যাকাতও ফরয করেছেন—যা তোমাদের ধনশালী লোকদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা এটিও মেনে নিলে—সাবধান! তাদের ধন-মালের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না এবং মজলুমের অভিশাপও ডেকে আনবে না; কারণ মজলুমের অভিশাপ আর আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনো অন্তরাল নেই। এই ধরনের আরো হাদীস রয়েছেঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ–

'আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতোক্ষণ না তারা 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' এই সাক্ষ্যদান করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। আর তারা যখনি এই কাজগুলো সম্পাদন করলো তো তাদের ধনপ্রাণ আমার থেকে বাঁচিয়ে নিলো; এরপর তাদের হিসেব আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ।'

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ–

'আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতোক্ষণ না তারা 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই' এই সাক্ষ্যদান করে এবং আমার ওপর ও আমি যেসব বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি সে সবের ওপর ঈমান আনে। তারা যখনি এ কাজগুলো সম্পাদন করলো তো আমার থেকে তাদের জানমাল বাঁচিয়ে নিলো—অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো হক

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা। এরপর তাদের হিসেব আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।'

এই হাদীসগুলোতে নবী করীম (স) ইসলামের শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) বিবৃত করেছেন। আর তা হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর একত্ববাদ ও হযরতের নবুয়াত বিশ্বাসের স্বীকৃতি দান করে, তখনি সে ইসলামের সীমার মধ্যে এসে পড়ে এবং যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক (Citizen) বনে যায়। সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন কিনা, তার মীমাংসা করার কাজ আল্লাহ্‌র—আমরা তার মীমাংসা করার অধিকারী নই। কারণ নবী করীম (স) স্পষ্টভাষায় বলেছেনঃ لَمْ أُوْمَرْ اَنْ اَشُقَّ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَلَا عَنْ بُطُوْنِهِمْ। 'আমাকে লোকদের হৃদয় চিড়বার এবং তাদের গোপন রহস্য উদ্ধারের মোটেই নির্দেশ দেয়া হয়নি।' বস্তুত জান ও মালের নিরাপত্তা (Security) শুধু কালেমায়ে তাওহীদ ও নবুয়াত বিশ্বাসের স্বীকৃতির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে না। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহ কিংবা মানুষের 'হক' আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে অপরাধ অনুযায়ী সাজা দেয়া যেতে পারে।

লক্ষণীয় যে, এখানে কোনো ব্যক্তি বিশেষ সামনে ছিলো না, বরং একটি এলাকার গভর্ণরকে আইনগত নির্দেশ দেয়া হচ্ছিলো। এই কারণে শুধু আইনের পরিধিই বিবৃত করা হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতিদান এবং ফরয কাজগুলো সম্পাদন করলেই প্রত্যেকের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে—একথা বলা হয়নি। পরন্তু এখানে তিনি ঈমানের সমগ্র শাখা-প্রশাখা ও বাস্তব কর্মবিধি সম্পর্কে প্রত্যেককে ওয়াকিফহাল করাবারও নির্দেশ দেননি। কারণ এখানে শুধু ইসলাম ও অনৈসলামের সীমারেখা এবং ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করামাত্র মানুষ কি কি আইনগত অধিকার লাভ করে, এটুকু বুঝিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো। এটা ঠিক কুরআনেরই একটি আয়াতের অনুরূপঃ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ 'তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে, নামায কায়েম করে, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও।' কাজেই এসব আইনগত নির্দেশ থেকে কারো এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই যে, নবী করীম (স) শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে এ ছাড়া আর কোনো জিনিসের গুরুত্ব ছিলো না।

www.bjilibrary.com

ওপরে দু'রকমের হাদীস উদ্ধৃত করা হলো। এক রকমের হাদীসের লক্ষ্য ছিলো বিশেষ প্রকৃতির লোক। তাতে নবী করীম (স) লোকদের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয় রকমের হাদীসে বিশেষ লোকদের প্রসঙ্গ ছিলো না বরং শাসনতান্ত্রিক বিধানের আলোকে মুসলিম ও অমুসলিমের নীতিগত পার্থক্য এবং মুসলমানের আইনগত অধিকার বিবৃত করাই ছিলো লক্ষ্য। এই দু'রকমের হাদীসের বর্ণনাভঙ্গিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এক জায়গায় তিনি জনগণের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকরূপে কথা বলছেন, অপর জায়গায় বলছেন একজন আইন-প্রণেতা এবং একটি নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতারূপে।

এবার আর এক রকমের হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এতে তাঁর লক্ষ্য ছিলো তৎকালীন আরবের বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ। এঁদেরকে তিনি আপন সমাজ থেকে বাছাই করে এনে নিজের সাহচর্যে রেখেছিলেন এবং বিশেষভাবে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে করে তাঁরা ইসলামের ভাবধারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তাঁর দাওয়াত প্রচারে মদদ্‌গার হতে পারে।

একবার হযরত সওয়ারীতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, মায়াজ ইবনে জাবাল ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। তিনি তিনবার থেমে থেমে উচ্চস্বরে বললেনঃ 'হে মায়াজ ইবনে জাবাল! হযরত মায়াজ প্রত্যেকবারই আরয করলেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! বলুন, আপনার খেদমতে আমি হাযির'। এভাবে তিনবার ডেকে যখন তিনি শ্রোতাকে খুব ভালো করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং এরপর শ্রোতা তাঁর কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শোনবে বলে তাঁর বিশ্বাস হলো, তখন তিনি বললেনঃ 'জানো, মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র কি হক রয়েছে?' তিনি নিবেদন করলেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন।' হযরত বললেনঃ 'মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র 'হক' হলো এই যে, মানুষ শুধু তাঁরই বন্দেগী ও গোলামী করবে এবং কাউকে তাঁর শরীক করবে না।' কিছু দূর চলার পর আবার তিনি উচ্চস্বরে বললেনঃ 'হে মায়াজ ইবনে জাবাল!' তিনি আরয করলেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! বলুন, আপনার খেদমতে আমি হাযির।' হযরত বললেনঃ 'মানুষ যখন এরূপ করে, তখন আল্লাহ্‌র ওপর তার কি অধিকার রয়েছে জানো?' তিনি নিবেদন করলেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন'। হযরত বললেনঃ 'মানুষের অধিকার হলো এই যে, আল্লাহ্

www.bjilibrary.com

তাদেরকে আযাব দান করবেন না'। একথা শুনে হযরত মায়াজ জিজ্ঞেস করলেনঃ 'আমি কি লোকদেরকে এর সুসংবাদ দেবো?' হযরত বললেনঃ 'না, তাদেরকে সুসংবাদ দিও না, কারণ তারা শুধু এর ওপরই ভরসা করে বসবে।' অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা বুঝতে পারবে না, ববং এ ভুল ধারণা পোষণ করে বসবে যে, শুধু মুখে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিলেই মুক্তি অনিবার্য হয়ে যাবে।

আর একবার হযরত তাঁর বিশিষ্ট ছাহাবীদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি সেখান থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন। অনেকক্ষণ চলে যাবার পর– হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে সাহাবাদের আশঙ্কা হলো। তাঁরা হযরতের তালাশে বেরোলেন। সর্বপ্রথম গেলেন হযরত আবু হোরয়রা (রা)। তিনি হযরতকে তালাশ করতে করতে আনসারদের একটি বাগানের কাছে গিয়ে পৌছলেন। কিন্তু তিনি তালাশ করেও বাগানটির দরজা খুঁজে পেলেন না। অবশেষে একটি ক্ষুদ্র নালার পথ ধরে তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, হযরত বসে আছেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেনঃ এখানে তুমি কি করে এলে? আবু হোরায়রা সব ঘটনার কথা বললেন। হযরত তাঁর পাদুকাদ্বয় তুলে তাঁকে দিলেন এবং বললেন, এ দু'টি নিয়ে যাও এবং বাগানের পেছনে যে ব্যক্তিকে কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্যদানকারী এবং তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস পোষণকারী রূপে পাও, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আবু হোরায়রা এই নির্দেশ পালন করার জন্যে রওয়ানা হলেন। পথে সর্বপ্রথম তিনি হযরত উমরকে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'এ পাদুকা কার?' আবু হোরায়রা বললেনঃ এ নবী করীম (স)–এর পাদুকা। তিনি আমায় অমুক অমুক কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উমর একথা শুনে তাঁকে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'তুমি শীগ্‌গীর ফিরে যাও। এ বেচারা উঠতি পড়তি করে দৌড় দিলেন এবং হযরতের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। ইতিমধ্যে উমরও সেখানে গিয়ে পৌছলেন। হযরত বললেনঃ 'উমর! কি কারণে তুমি এহেন কাজে উদ্যোগী হলে?' তিনি বললেনঃ 'আমার মা–বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক! আপনি কি আবু হোরায়রাকে অমুক অমুক কথা বলার জন্যে পাঠিয়েছিলেন?' হযরত বললেনঃ 'হাঁ'! উমর নিবেদন করলেনঃ 'এরূপ করবেন না; কারণ আমার ভয় হয় যে, লোকেরা শুধু এর ওপরই ভরসা করে বসবে। তাদেরকে বরং কাজের জন্যে ছেড়ে দিন।' তিনি বললেনঃ 'আচ্ছা, তাহলে ওদেরকে কাজের জন্যেই ছেড়ে দাও।'

www.bjilibrary.com

একবার হযরত আবু জার গীফারী উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, হযরত একটি সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তিনি ফিরে গিয়ে আবার এসে দেখলেন যে, হযরত ইতিমধ্যে উঠেছেন। তিনি আবু জারকে দেখেই বললেনঃ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই বলে ঘোষণা করেছে এবং এই প্রত্যয়ের জন্যে জীবন দিয়েছে, সে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ সে যদি জেনা এবং চুরি করে থাকে? হযরত বললেনঃ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ তিনি আবার একই কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং হযরতও পুনরায় একই জবাব দিলেন। তিনি তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলে হযরত বললেনঃ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ

এই তিনটি হাদীসই প্রণিধানযোগ্য। হাদীসের শ্রোতা হচ্ছেন এমন লোক, যারা নিসন্দেহরূপে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী। কুরআনের শিক্ষাদীক্ষা ও ইসলামের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা শুধু ওয়াকেফহালই নন্ বরং সে সবের পূর্ণ পালনকারীও। তাঁদের সমাজে হযরত যা কিছু বলেছেন, তা থেকে তাঁরা তাওহীদ ছাড়া ইসলামের অন্যান্য বুনিয়াদী আকীদা, অধিকার ও ফরয কাজগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে নিবেন—এরূপ আশঙ্কা করার কোনো অবকাশই ছিলো না। এ কারণেই তিনি তাদেরকে সরাসরি এ নিগূঢ় সত্যটি বাতলে দিয়েছেন যে, ইসলামে আসল ও বুনিয়াদী জিনিস হচ্ছে তাওহীদ বিশ্বাস। আর মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুর বন্দেগী ও গোলামী থেকে মুক্ত করা এবং তাকে শুধু আল্লাহ্র গোলামে পরিণত করাই হলো দুনিয়ায় নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে গায়রুল্লাহ্র বন্দেগী থেকে মুক্তিলাভ করা এবং মাত্র এক আল্লাহ্র বান্দাহ্ হয়ে থাকার ওপরই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। এ পরম সত্যটি যে ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে এবং যার হৃদয়ে একথাটি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো শক্তির এতোটুকু প্রভুত্বের অধিকার নেই এবং কেবল এক আল্লাহ্রই আনুগত্য, আইন পালন ও গোলামী করাই তার কর্তব্য—সে নিশ্চিতরূপেই নিজের জীবনে সরল পথ অনুসরণ করবে এবং সর্বত্র কুটিল পথ এড়িয়ে চলবে। তার মেজাক ও ঝোঁকপ্রবণতা হবে সৎপ্রকৃতির। সত্য ও সততাকে সে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করবে তাকওয়া ও পরহেজগারী সে নিসঙ্কোচে অবলম্বন করবে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সমস্ত হক ও অধিকার সে আদায় করবে। এবং তাঁর বিধিবদ্ধ সকল ফরয কাজ সে পালন করবে। কাজেই এই একটি মাত্র জিনিসই তার ধ্যান-ধারণাকে সুস্থ ও স্বচ্ছ

www.bjilibrary.com

করে তুলবে। তার নৈতিক জীবনে পবিত্রতা আনবে। তাকে একজন সৎকর্মশীল লোক হিসেবে গড়ে তুলবে। অবশ্য এরপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে সে গোনাহ্‌র কাজ করে বসতে পারে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই তাকে গোনাহ্ থেকে তওবা করতে বাধ্য করবে। কারণ ঈমানের সাথে সাথে সে গোনাহ্ ও পাপাচারকেও আকড়ে ধরে থাকবে—এটা অসম্ভব ব্যাপার।

বস্তুত পূর্বোল্লেখিত হাদীসগুলো এবং তাদের সমার্থক অন্যান্য হাদীসের এ অর্থই সাহাবায়ে কেরাম বুঝেছিলেন এবং তাঁদের মনে এ-ই ছিলো সে সবের প্রকৃত অর্থ। তাঁদের কেউই এরূপ ধারণা পোষণ করেননি যে, ব্যস তাওহীদ বিশ্বাসই যথেষ্ট; এরপর নবুয়াত বিশ্বাস ও কালামুল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই। কিংবা নৈতিক পবিত্রতা ও সৎকর্মশীলতারও আবশ্যকতা নেই। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তারা কিছুতেই পোষণ করতে পারতেন না। কারণ ইসলাম বলতে কি বুঝায়, তাতে কি কি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ, কোন্ কোন্ এবাদাত প্রতিপালন, কোন্ কোন্ সীমারেখার সংরক্ষণ, কোন্ কোন্ আইনের অনুবর্তন এং কোন্ কোন্ রীতিনীতি পরিবর্তন আবশ্যক—এসব তাঁদেরকে পুরোপুরি বাত্‌লে দেয়া হয়েছিলো। এ কারণেই হযরত এ ধরনের শিক্ষা শুধু পূর্ণাঙ্গ মুসলমানদেরকেই দিয়েছেন এবং সাধারণ লোকদের সামনে এসব বিবৃত করতে বারণ করেছেন। মায়াজ ইবনে জাবাল সংক্রান্ত হাদীসে তিনি নিজেই এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, সাধারণ লোকেরা একথা শুনে ভুল ধারণা পোষণ করে বসবে। আবু হোরায়রা সংক্রান্ত হাদীসে এ ধরনের কথা তিনি সাধারণ লোক পর্যন্ত পৌছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা, কারো মনে এরূপ সন্দেহ জাগতে পারে। স্বয়ং হযরত উমরেরও এরূপ সন্দেহই হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে পূর্ণাঙ্গ মুসলমানদের সুসংবাদ দেয়াই ছিলো হযরতের উদ্দেশ্য। তাই হযরত উমর তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে একমত হন। অনুরূপভাবে হযরত আবু জার সংক্রান্ত হাদীসেও কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারে না যে قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলতে শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকেই বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত অন্যান্য জায়গায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, জান্নাত লাভের জন্যে তাওহীদের প্রতি পূর্ণ ঈমানের প্রয়োজন। এ জন্যে কোথাও তিনি বলেছেন وَمُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ কোথাও বলেছেন عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ আবার কোথাও তিনি এরই সমার্থক অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যাই হোক, এটা খুব ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে হাদীসগুলোতে তাওহীদের গরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে এমন

www.bjilibrary.com

লোক, যারা তামাম শর্তাবলী সহ ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হয়েছে। যারা আদতে মুসলমানই নয়, এ ধরনের হাদীস তাদের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া মুসলমানদেরকেও তাওহীদ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেবার তাৎপর্য এ নয় যে, তারা শুধু আল্লাহর একত্ববাদের মৌখিক স্বীকৃতি দিবে এবং তারপর নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছামতো ভ্রান্ত বিশ্বাস, নাফরমানী, সীমালংঘন, আল্লাদ্রোহিতা ও পাপাচারে লিপ্ত থাকবে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যটুকু জানিয়ে দেয়া যে, মুসলমানদের সাফল্য তাওহীদ বিশ্বাসের সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপরই সবচাইতে বেশী নির্ভরশীল। এর ভেতরে বিকৃতি এসে পড়লে আর কোনো জিনিসই তাদের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। আর এটা যদি নির্ভুল ও সুদৃঢ় হয় তবে চূড়ান্ত সাফল্য তারা লাভ করবেই। বস্তুত এরূপ অর্থপূর্ণ হাদীস কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

(حم السجدة : ٣٠)-

(প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৩৭)

www.bjilibrary.com

নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী?

এক ভদ্রলোক আমার 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' নামক বইয়ের ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে নিম্নোক্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ঃ

'ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাওহীদ ও আল্লাহর এবাদাত। নবীরা হচ্ছেন শুধু মাধ্যম, তাঁদের প্রতি ঈমানটা আসল লক্ষ্য নয়। ঈমানের জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জ্ঞান ও চিন্তার সামর্থ পর্যন্ত দায়ী। কাজেই কোনো অমুসলিম যদি তাওহীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং নিজস্ব পন্থায় আল্লাহর এবাদাত করে, কিন্তু নিজস্ব জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও নবুয়াত সম্পর্কে সদিচ্ছার বশবর্তী হয়েই সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য না করার পেছনে কী যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে? এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ প্রণিধানযোগ্যঃ

يَاْهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

(ال عمران : ٦٤)

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ *-(ال عمرن : ١١٠) . . . لَيْسُوا سَوَاءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاءِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ* يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ - (ال عمران : ١١٣-١١٥)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ -(الحديد : ٢٨)

শেষোক্ত আয়াতে উল্লেখিত كِفْلَيْنِ শব্দের তাৎপর্য কি, আশা করি ব্যাখ্যা করেবলবেন।'

www.bjilibrary.com

আপনার প্রথম বাক্যে ইসলামের যে লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামী লক্ষ্যের পুরোপুরি বর্ণনা নয়। বরং তার একটি অংশ মাত্র। কিন্তু কথা দীর্ঘায়িত হবার আশঙ্কায় আমি আপাতত সে আলোচনায় যাবো না। এখানে আমি শুধু এ টুকুই বলবো যে, ইসলামের যে মূল লক্ষ্য আপনি নির্ধারণ করেছেন, তা অর্জন করতে হলেও নবীদের পথনির্দেশ একান্ত অপরিহার্য।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম চিন্তা করা দরকার যে, ইসলামের যে লক্ষ্য আপনি ঘোষণা করেছেন, তা অর্জন করার সুনিশ্চিত উপায় কি। যে জিনিসটিকে 'তাওহীদ' বলা হয়, তা কেবল 'আল্লাহকে এক ঘোষণা' করাই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে আল্লাহর সত্তা ও গুণরাজি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ। তেমনিভাবে 'আল্লাহর এবাদাত' বলতে শুধু যেনতেন প্রকারে আল্লাহর পূজা-অর্চনা করাকেই বুঝায় না, বরং সঠিক অর্থে শির্কের তামাম কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে গোটা মানব জীবনকে সেই মহান ও পবিত্র সত্তার বন্দেগীর জন্যে উৎসর্গ করাই হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত। এই দুটি জিনিস (অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্থতা ও এবাদাতের একনিষ্ঠতা) ইসলামী পরিভাষায় 'হেদায়াত' নামে অভিহিত। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আর কুরআনের ভাষায়, হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহ্‌রই তরফ থেকে প্রদত্ত জিনিস-

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ -(ال عمران : ٧٣)

আল্লাহর কাছ থেকে এই হেদায়াত পাবার মাত্র দুটি উপায় হতে পারেঃ হয় কারো কাছে আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি হেদায়াত আসবে, নচেত যার কাছে হেদায়াত এসেছে, তার অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের ভাষায় এর প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন নবী বা রসূল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুমিন' বা 'মুসলিম'। কাজেই তাওহীদ সম্পর্কে যদি কেউ নির্ভুল জ্ঞান রাখে এবং তার বন্দেগী ও এবাদাত এক আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে স্বভাবতই সে কোনো নবী কিংবা নবীর অনুসারী হবে। কিন্তু সে যদি এ দুয়ের কোনোটিই না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাছে প্রকৃত জ্ঞান নেই—আছে শুধু আন্দাজ আর অনুমান (النجم : ٢٨) وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا আর তার কাছে যখন প্রকৃত জ্ঞানই নেই, তখন তার এবাদাত বন্দেগীও খালেছ আল্লাহর জন্যে একনিষ্ট হতে পারেনা। কারণ আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভুল ও সঠিক জ্ঞান লাভের ওপরই এবাদত-বন্দেগীকে তার জন্য উৎসর্গ করার কাজ নির্ভরশীল।

www.bjilibrary.com

অবশ্য কুরআনের এই দাবীর স্বপক্ষে আপনি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দাবী করতে পারেন। সে দাবী পূরণ করতে আমিও প্রস্তুত।

একথা নিসন্দেহ যে, মানুষের প্রকৃতিতে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপাদান বর্তমান রয়েছে। মানুষ শুধু আল্লাহরই বন্দেগী ও দাসত্ব করবে—তার প্রকৃতিতে এ চাহিদাও বিদ্যমান রয়েছে। তাই কুরআনে বলা হয়েছেঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا – (الروم : ٣٠) অনুরূপভাবে হাদীসে নববীতে বলা হয়েছেঃ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الاسلام 'প্রত্যেক শিশুই ইসলামের প্রকৃতির ওপর জন্মলাভ করে।'[৫] কিন্তু এই প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। আর এটা সহজেই বোঝা যায় যে , সে সব শর্ত প্রত্যেক ব্যক্তি পূরণ করতে পারে না।

এর প্রথম শর্ত হলো পর্যবেক্ষণ শক্তির নির্ভুল ব্যবহার—যাতে করে মানুষ চক্ষু উন্মীলন করেই বিশ্বপ্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণু, এমন কি খোদ মানুষের নিজ সত্তার মধ্যে বিরাজমান আল্লাহ্‌র গুণরাজির লক্ষণগুলোকে চিনে নিতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির এক বিপুল অংশই এরূপ পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ নয়। তারা প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর বাহ্যরূপটাই শুধু দেখে, আর প্রচ্ছন্ন দিকটির প্রতি আদৌ মনোযোগ দেয় না। তাই কুরআন এ সম্পর্কে অভিযোগ করছে–

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ *–(يوسف : ١٠٥) 'আসমান ও জমিনের বহু নিদর্শনাবলীকে লোকেরা এমনিই অতিক্রম করে যায় এবং সে সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।' وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ *– (يونس : ٩٢) 'লোকদের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল।' একথা সুস্পষ্ট যে, যারা আদৌ পর্যবেক্ষণ শক্তি ব্যবহার করে না, তাদের জন্যে জ্ঞানের দরজাও কখনো উন্মুক্ত হতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, মানুষের মধ্যে নির্ভুল ও সুস্থ চিন্তাশক্তি বর্তমান থাকতে হবে—যাতে করে মানুষ তার পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাবলীকে সঠিকরূপে বিন্যস্ত করে সেগুলো থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারে। কিন্তু এই শর্তটির অভাব প্রথম শর্তের চাইতেও বেশি। প্রথমত, চিন্তা-ভাবনা করার মতো লোকই মানব সমাজে খুব কম ; আর যারা চিন্তা করে, তাদের মধ্যেও নির্ভুল

www.bjilibrary.com

চিন্তাশক্তি সম্পন্ন লোক অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। তাই কুরআন মজীদ বারবার বলছেঃ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ- وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُوْنَ চিন্তা-ভাবনার এই অভাব এবং সুস্থ চিন্তাশক্তির এই অপ্রতুলতাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথে মানুষের এক মস্তবড়ো বাধা। এটিই তাকে সরল পথের পরিবর্তে কুটিল পথে চালিত করে। যদিও চারদিকে সরল পথের নিদর্শনাদি পুরোপুরি বর্তমান ; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ নিদর্শনাদি দেখতেই পায় না, কিংবা দেখলেও সেগুলো থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, সে কী করে নির্ভুল পথ পেতে পারে? এ কথাটিই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে নিম্নোক্তরূপেঃ আমরা আপন নিদর্শনাদি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করি, কিন্তু তা বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে-(الروم : ٢٨) * كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ঠিক এই কথাটিই অন্যত্র কিরূপ জোরালোভাবে বলা হয়েছে, তাও লক্ষণীয় ঃ

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ *- (الاعراف : ١٧٩)

"আমরা জ্বিন ও মানুষের এক বিরাট অংশকে দোযখের ইন্ধনরূপে পয়দা করেছি। তাদের অবস্থা হলো এই যে, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তদ্বারা বোঝবার চেষ্টা করে না ; চোখ আছে কিন্তু তদ্বারা দেখে না ; কান আছে কিন্তু তদ্বারা শোনে না। তারা হচ্ছে পশুর মতো ; বরং তার চাইতেও বেশী গোমরাহ। আর এরাই হচ্ছে গাফেল লোক।"

তৃতীয় শর্ত হলো এই যে, তার স্বভাব-প্রকৃতি হবে সুস্থ ও নির্মল। সামাজিক প্রভাব, বাপ-দাদার শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ইত্যাদি দ্বারা সে আদৌ প্রভাবিত হবে না, বরং এ সকল আবরণ ভেদ করে সত্যের আলোকে সে স্পষ্টভাবে চিনে নিবে। এ শর্তটির অভাব প্রথম দু'টি শর্তের চাইতে অনেক বেশী। বড়ো বড়ো জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরও দেখা যায় যে, সমাজ ও পরিবারের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হতে পারেন না। সামাজিক পরিবেশ তাদেরকে যে পথে নিক্ষেপ করেছে, সে পথেই তারা এগিয়ে চলছেন এবং তাকেই সত্য জ্ঞান করছেন। কুরআন মজীদ একেও গোমরাহীর এক বিরাট কারণ বলে উল্লেখ করেছে-

www.bjilibrary.com

قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاءُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ ٭-(المائده : ١٠٤)

চতুর্থ শর্ত হলো এই যে, মানুষের মধ্যে প্রবল সত্যপ্রিয়তা ও তীব্র ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে—যাতে করে সে আপন প্রবৃত্তির বাসনা ও প্রবণতার মুকাবিলা করতে পারে। কারণ প্রবৃত্তির বাসনা প্রথমত সত্যের সন্ধানেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর কেউ সত্যের সন্ধান পেলেও তাকে নিজস্ব জ্ঞান অনুসারে কাজ করতে বাধা দান করে—প্রতি পদক্ষেপে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বস্তুত মানবীয় সত্তার ভেতরে এ এমন এক প্রচণ্ড শক্তি, যা প্রায়শ তার বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং কখনো কখনো তাকে জেনেশুনে ভ্রান্ত পথে চলতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, যেসব বড়ো বড়ো ব্যক্তি জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বোধশক্তির দিক থেকে অনন্য—এই মহাশত্রুর অনিষ্ট থেকে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারেন না। কুরআন মজীদে এ জিনিসটিকেও গোমরাহীর সবচাইতে বড়ো কারণ বলে ঘোষণা করা হয়েছেঃ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط (القصص : ٥٠) 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত পথনির্দেশ বর্জন করে নিজের প্রবৃত্তির বাসনাকে অনুসরণ করেছে, তার চাইতে বড়ো গোমরাহ আর কে হতে পারে!' اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً (الجاثيه) 'তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছো, যে জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও নিজের প্রবৃত্তির বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে? কিন্তু (সে যখন এরূপ করেছেই, তখন) আল্লাহও তাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করেছেন, তার অন্তরের ওপর মোহর অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ টেনে দিয়েছেন।' আর সাধারণ লোক কোন্ ছার, কখনো কখনো পয়গাম্বররা পর্যন্ত এই মহাশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই হযরত দাউদের মতো সুবিখ্যাত পয়গাম্বরকেও একবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছেঃ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط (ص : ٢٦) 'প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না, নচেত এ তোমায় আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।'

সর্বশেষ শর্ত হলো এই যে, মানুষের বিবেক-শক্তিকে জাগ্রত থাকতে হবে। তার মানসিক গড়ন হবে এমন যে, সঠিক ও সত্যকথা উপলব্ধি করার

www.bjilibrary.com

জন্যে সে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির বেশী মুখাপেক্ষী হবে না। বরং মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়কে গ্রহণ করতে সে স্বভাবতই অস্বীকৃতি জানিয়ে দিবে এবং ধারণা-অনুমান ও যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই অনুভূতির (Intuition) সাহায্যে সাচ্চা ও সত্য বিষয়কে চিনে নিবে। এ শর্তটি সবচাইতে বেশী কড়া, কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্যে এটি সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের পর্যবেক্ষণ হয়তো নির্ভুল হতে পারে, চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণে হয়তো সে বিভূষিত হতে পারে, অন্যের অন্ধ অনুবৃত্তি ও নফসের গোলামীর শিকল থেকেও হয়তো সে মুক্ত হতে পারে কিন্তু তার ইন্দ্রিয়নিচয়ের বাইরে যেসব মৌলিক সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং যেগুলোর চৌহদ্দী পর্যন্ত তার বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাপ্তিলাভ করতে সমর্থ নয়—নিছক বাহ্য নিদর্শনাদির পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বদৌলতেই সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে না। মানুষ সে মৌলিক সত্যগুলোর কাছাকাছি পৌছতে পারে, কিন্তু সেগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির বলে সে বড়োজোর এটুকু বলতে পারে যে, 'হয়তো এরূপ হবে' 'এরূপ হাবার সম্ভাবনাই বেশী' কিংবা খুব বেশী হলে 'এরূপ হওয়াই উচিত।' কিন্তু নিছক বুদ্ধিবৃত্তি তাকে এতোখানি শক্তি সরবরাহ করতে পারে না, যাতে করে সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারে যে, বাস্তব হচ্ছে এরূপ—এটিই সত্য ও যথার্থ এবং এছাড়া আর সবকিছুই মিথ্যা ও ভ্রান্ত। এহেন দৃঢ় প্রত্যয় ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান শুধু 'অনুভূতির' সাহায্যেই সৃষ্টি হতে পারে। জ্ঞানের চরম পর্যায়ে পৌছে আন্দাজ-অনুমান ও যুক্তি-প্রমাণে কোনো কাজ হয় না। সেখানে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় অন্তর্লোকে একটি আলোকের প্রকাশ ঘটে এবং তা মুহূর্তের মধ্যে সত্যের পর্যবেক্ষণ করিয়ে দেয়—কোনো দৃশ্যমান জিনিস যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি, এ পর্যবেক্ষণও ঠিক তেমনি। এরূপ পর্যবেক্ষণের ওপরই ঈমান ও প্রত্যয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার মতো দুর্বল ও টলটলায়মান ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় না ; বরং সে মনশ্চক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে-এমন একটি দেখাশোনা জিনিসের ওপর ঈমান আনে, যার সত্যতায় কোনো শোবা-সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বালাই পর্যন্ত থাকে না। এরই নাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। আর জ্ঞানের এ স্তরে পৌছতে না পারা পর্যন্ত মানুষ যেমন পুরোপুরি আল্লাহর পরিচয় পেতে পারে না, তেমনি আল্লাহর জন্যে তার বন্দেগী ও দাসত্বও একনিষ্ঠ হতে পারে না। কিন্তু অনুভূতির যে আলোর ওপর জ্ঞানের

www.bjilibrary.com

পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল, তা মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। মানুষ তার স্বরূপ সম্পর্কে যেমন অবহিত নয়, তেমনি তাকে সৃষ্টি করতেও সমর্থ নয়, আর চেষ্টা–সাধানা বলেও তা অর্জন করা যেতে পারে না। এ কেবল আল্লাহর দেয়া জিনিস। আর একেই কুরআন মজীদে আল্লাহর দেয়া নূর (نور خداداد) 'খোদায়ী প্রমাণ' (برهان رب) 'খোদায়ী পথনির্দেশ(هدايت الهى)খোদায়ী শিক্ষা' (تعليم خداوندى) ইত্যাকার ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَه مِن نُّوْرٍ (النور : ٤٠) 'আল্লাহ যাকে আলো দেননি, তার জন্যে আর কোনো আলো নেই।' হযরত ইউসুফ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰبُرْهَانَ رَبِّهٖ ط * – (يوسف : ٢٤) 'যদি সে আপন প্রভুর প্রমাণ না দেখতো, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।' হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে আদেশ করা হয়েছেঃ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج – (الانعام – ١٦١) 'লোকদের বলে দাও, আমার প্রভু আমায় সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।' হযরত মূসা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط–(قصص : ١٤) 'যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে পৌছলেন এবং পূর্ণ মানুষে পরিণত হলেন, তখন আমরা তাকে বিচারশক্তি ও জ্ঞান–বুদ্ধি দান করলাম।'

এবার এ পাঁচটি শর্ত সম্পর্কে চিন্তা করুন। এর কোনো শর্তের প্রয়োজনীয়তা যদি অস্বীকার করতে চান তবে তার কারণ বিবৃত করুন। এর কোনো শর্ত ছাড়া মানুষ সত্যতা ও যথার্থ পর্যন্ত পৌছতে পারে বলে যদি মনে করেন তবে তার স্বপক্ষে দলিল পেশ করুন। আর সত্যতা অবধি পৌছুবার জন্যে এ পাঁচটি শর্তের পূর্ণতাকে যদি আপনি অপরিহার্য মনে করেন তবে কতো লক্ষ বা কোটি নয়, বরং কতো শত কোটি মানুষের মধ্যে একজনের ভেতর এ শর্তাবলী পূর্ণরূপে পাওয়া যেতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালার ন্যায় অতীন্দ্রিয় মহান সত্তা সম্পর্কে সে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তা বলুন। পক্ষান্তরে আপনি যদি স্বীকার করেন যে, এই জরুরী জিনিসটি খুব দুর্লভ, তা হলে যে কোটি কোটি মানুষ এ থেকে বঞ্চিত কিংবা এতে ভূষিত হলেও পূর্ণ মাত্রায় নয়, তাদের পরিণাম কি হবে আমায় বলুন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি নিজ নিজ অসম্পূর্ণ উপায়–উপকরণসহ জীবন পথে ছেড়ে দেয়া চলে? নিজ নিজ অন্ধ চোখ ও পঙ্গু পায়ের সাহায্যে প্রত্যেকেই পথ খুঁজে নিবে, সদিচ্ছার সাথে যে জিনিসকে ইচ্ছা আল্লাহ মনে করবে এবং যেভাবে ইচ্ছা তার পূজা–অর্চনা করবে—এভাবে কি তাদের স্বাধীনতা দেয়া যায়? এটাই যদি আপনার

www.bjilibrary.com

ধারণা হয়, তাহলে নিজের রোগের চিকিৎসা নিজেরই করা উচিত, কোনো ডাক্তার বা চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই ; নিজের পথ নিজেরই সন্ধান করা উচিত কারো কাছ থেকে পথের সন্ধান জানা কিংবা কারো পথ-নির্দেশ করার প্রয়োজন নেই ; নিজের জ্ঞান নিজেরই অর্জন করা উচিত, কোনো শিক্ষকের আবশ্যকতা নেই—একথা কেন বলেন না? ..... এই দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থাপনা কি এভাবেই চলছে?

বস্তুত মানুষের মন-মানস অত্যন্ত সীমিত ও অপ্রশস্ত ; সমগ্র দুনিয়ার যোগ্যতা প্রতিভা যুগপৎ একই ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত হবে, এমন কি সে কোনো কাজেই অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না—এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। অপরদিকে মানুষের প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপক ও সংখ্যাতীত ; তার প্রত্যেকটির জন্যে বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন। পরন্তু জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই নিজ নিজ অবস্থার উপযোগী যোগ্যতা ও প্রতিভার দাবী করে। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন মানবীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দিয়েছেন এবং সে লোকদের চিকিৎসার প্রয়োজন পূরণ করছে। এভাবে কাউকে আইনশাস্ত্রের প্রতি, কাউকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি, কাউকে চাষাবাদের প্রতি, কাউকে শিল্পকলার প্রতি আর কাউকে রাজনীতি ও রাজ্যশাসনের প্রতি আগ্রহ দেয়া হয়েছে। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানবজাতির প্রয়োজন পূরণ করছে। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কার্যাবলীতে অন্যান্য সকল বিভাগের লোকেরা এই বিশেষ বিভাগের লোকদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ ব্যাবস্থাপনাকে চূরমার করে যে ব্যক্তি নিজেই নিজের চিকিৎসক, নিজের উকিল, নিজের কৃষক, নিজের ব্যবসায়ী ও নিজের কারিগর হতে চেষ্টা করবে, সে যতোই 'সদিচ্ছার' সাথে এহেন নির্বুদ্ধিতা করুক না কেন, প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা বানচাল করার কুফল তাকে অবশ্যই ভুগতে হবে এবং নিশ্চিতরূপে ব্যর্থ জীবনই সে যাপন করবে।

এ ব্যবস্থাপনা জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের বেলায় যেমন সত্য, ধর্মীয় ব্যাপারেও তেমনি সত্য। এখানেও আল্লাহ্কে জানা এবং সঠিক পন্থায় তাঁর এবাদাত করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভা সবার মধ্যে পাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ এ যোগ্যতা ও গুণপনাও বিশেষ বিশেষ লোককে দান করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সত্যিকার পরিচয় জেনে তাঁর

www.bjilibrary.com

নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে বিবৃত করেছেন। তাঁর এবাদাত ও বন্দেগীর সঠিক পন্থাও তাঁরা বাত্‌লে দিয়েছেন। সুতরাং এই বিশেষ ক্ষেত্রে এ ক্ষেত্রেরই বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করা, তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শকে হৃদয় ও আত্মার মাঝে বদ্ধমূল করা এবং তাঁদের কথা ও কাজ থেকে প্রমাণিত বন্দেগীর পদ্ধতিকে অনুসরণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সে নিসন্দেহে নিজের বিচার-বুদ্ধিকেও প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে সে নিজেই নিজের অসম্পূর্ণ শক্তিনিচয় ও সীমিত উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে রাস্তা সন্ধান করবে এবং নিজের মতে যেটিকে সঠিক মনে হয় সেটি ধরেই এগিয়ে চলবে—বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের নির্ভুল পন্থা এটা নয়। বরং এর নির্ভুল পন্থা হলোঃ নিজের জন্যে সঠিক পথনির্দেশ সন্ধান করা, ধর্মীয় ব্যাপারে পথনির্দেশের দাবীদার ব্যক্তিদের জীবনধারা ও শিক্ষাদীক্ষার ওপর সাধ্যানুযায়ী সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং তাঁদের মধ্যে কে সবচাইতে বেশী উত্তম ও নির্ভুল পথনির্দেশ দান করেন, কার মধ্যে হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় পাঁচটি শর্ত পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কার শিক্ষা সবচাইতে বেশী কার্যোপযোগী—ইত্যাদি বিষয় জেনে নেয়া। এভাবে যিনি এ পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবেন, তাঁর শিক্ষা মেনে নেয়া এবং তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণের চেষ্টা করাই কর্তব্য।

এই যুক্তিসঙ্গত পন্থা ছেড়ে যে ব্যক্তি অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করবে, সে যতোই 'সদিচ্ছাপরায়ণ' হোক—নিজের ভ্রান্তির কুফল সে অবশ্যই দেখতে পাবে। কারণ সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে হোক কি অসদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে—তার দায়িত্ব ও ফলাফল থেকে মানুষ কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত সে যদি চিকিৎসাবিদের সন্ধান এবং তার ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ওপর ভরসা করে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে থাকে, তবে এই ভ্রান্তি সে যতোই সদিচ্ছার সাথে করুক না কেন, এর কুফল তাকে অবশ্যই ভুগতে হবে যে ব্যক্তি আইনগত ব্যাপারে আইনজ্ঞকে পরিত্যাগ করে নিজের অসম্পূর্ণ মতের ভিত্তিতে কাজ করবে, সে এ কাজটি পরম সদিচ্ছার সাথে করলেও এই নির্বুদ্ধিতার কুফল থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। বস্তুত ভ্রান্তি সর্বাবস্থায়ই ভ্রান্তি; আর ভ্রান্তির যে স্বাভাবিক ফলাফল নির্দিষ্ট রয়েছে, তা আত্মপ্রকাশ করবেই। অবশ্যই অসদিচ্ছার ফলে আর একটি অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

www.bjilibrary.com

এবার আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যে আয়াতগুলো পেশ করেছেন, সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করা যাক। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই সাধারণ রীতিটি মনে রাখা দরকার যে, কোনো বিষয়ে কুরআন মজীদ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করতে হলে দু-একটি আয়াত বেছে নেয়া কোনো নির্ভুল পন্থা নয়। বরং এর জন্যে গোটা কুরআনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন ; কারণ এতে করে বিষয়টির সমস্ত দিকই সামনে এসে যাবে। আপনি জানেন যে, কুরআন মজীদ কোনো ধারাবাহিক রচনা নয়, এতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিষয়কে এক এক জায়গায় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়নি, বরং সুদীর্ঘ ২৩ বছরকালে বিভিন্ন সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে যে আয়াতগুলো নাযিল হচ্ছিলো, এ হচ্ছে তারই সঙ্কলন গ্রন্থ। এ কারণেই ইসলামের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কোনো এক জায়গায় পুরোপুরি ও সবিস্তারে বিবৃত হয়নি, বরং তা সমগ্র কুরআনে বিস্তৃত হয়ে আছে এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে বিভিন্ন আয়াতে তাদের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কাজেই নবুয়াত সম্পর্কে আপনি কুরআনের শিক্ষাকে যথাযথভাবে জানতে চাইলে গোটা কুরআনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করুন। বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি আয়াত বেছে নিলে আপনি ভুল ধারণায় জড়িয়ে পড়বেন।

এই নিয়ম অনুসারে কুরআন অধ্যয়ন করলে আপনি স্বতই বুঝতে পারবেন যে, কুরআনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই নিজের পথ সন্ধান করার ব্যাপারে স্বাধীন নয় এবং যে কোনো পথকে সে সদিচ্ছার সাথে নির্ভুল মনে করলেই আদতে তা নির্ভুল হয়ে যায় না। কুরআন বলেঃ আল্লাহ যখন বনী আদমকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তখন থেকেই তাকে সরল পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং তাকে স্পষ্টত বলে দিয়েছেন যে, আমার তরফ থেকে যে পথনির্দেশ তোমাদের কাছে পৌঁছবে, তার অনুসরণ করাই হচ্ছে তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র উপায়- فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ * - (البقره : ٣٨-٣٩)

পরন্তু তিনি একথাও বলেছিলেন যে, এই পথনির্দেশ প্রত্যেকের কাছে আলাদা- আলাদাভাবে পৌঁছবে না, বরং এ জন্যে তোমাদের

www.bjilibrary.com

মধ্য থেকেই কিছু লোককে আমি বাছাই করে নেবো এবং তাঁদের ওপর এই পথনির্দেশের দায়িত্ব অর্পণ করবো ; তাঁদেরকে তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে প্রেরণ করবো। যারা আমার এই রসূল এবং তাঁর আনীত পয়গামকে সত্য মনে বিশ্বাস করবে, তারাই সত্য পথের সন্ধান পাবে- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *- (اعراف : ٣٥) আর যারা আমার পয়গাম্বরকে অবিশ্বাস করবে, তারা তার উচিত শাস্তি লাভ করবে- اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ *-(ص : ١٤) পরন্তু কিয়ামতের দিন যখন তাদের শাস্তি দেয়া হবে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হবেঃ তোমাদের কাছে কি রসূল আসেন নি? তারা কি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনান নি এবং এ দিনের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন নি?[১]

اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط-(الزمر: ٧١)

এর সঙ্গে সঙ্গেই কুরআন স্পষ্টত বলে দিচ্ছেঃ যে ব্যক্তি নবীদের মানে না, তার পক্ষে আল্লাহকে মানা মোটেই লাভজনক নয়ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا* اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ - (النساء : ١٥٠-١٥١)

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, কতকের প্রতি বিশ্বাস ও কতককে অবিশ্বাস করার কথা বলে এবং তার মধ্য থেক কোনো বিশেষ পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা নিশ্চিতরূপে কাফের।"

---

১. নবীদের অবিশ্বাস করার মানে হলো ঃ তাদের নবুয়াতের দাবী মানতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতি সদিচ্ছার সাথে করা হোক, কি অসদিচ্ছার সাথে-অস্বীকৃতিই। অবশ্য অসদিচ্ছার সাথে হলে অস্বীকৃতির দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। যে ব্যক্তি ভুল পথকে ঠিক মনে করে অবলম্বন করে, সে পথভ্রষ্ট বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঠিক জেনেও ভুল পথে চলে সে পথভ্রষ্টই নয়, অভিশপ্তও।

www.bjilibrary.com

কুরআনের দৃষ্টিতে তারাই হচ্ছে মুমিন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর রসূলের প্রতিও ঈমান পোষণ করে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –(الحجرت : ١٥، النور:٦٢)

"মুমিন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে।"

পরন্তু যে ব্যক্তি রসূলের মাধ্যমে হেদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হবার পরও তা অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে জাহান্নাম থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। এ ব্যাপারে সদিচ্ছা ও অসদিচ্ছার কোনো প্রশ্নই নেইঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا *

(النساء :١١٥)–

"যে ব্যক্তি হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও রসূলের সাথে বিতর্ক ও মতানৈক্য করে এবং মুমিনদের পথ অবলম্বন করে না, সে যেদিকে ঘুরে গিয়েছে, সেদিকেই আমরা তাকে ঘুরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"

এ হচ্ছে কুরআনী শিক্ষার মূলনীতির অঙ্গীভূত। কুরআনের কোথাও এর বিপরীত কথা পাওয়া যেতে পারে না। আপনি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে আয়াতগুলো পেশ করেছেন তা দৃশ্যত এর সাথে বিরোধপূর্ণ মনে হতে পারে ; কিন্তু সূরায়ে আলে-ইমরানের ষষ্ঠ রুকূ থেকে দ্বাদশ রুকূ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পড়লে বিরোধের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। ষষ্ঠ রুকূতে রসূলে করীম (স)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ * فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا . . . ثُمَّ نَبْتَهِلْ–(ال عمرن : ٦١)

"এই সত্যজ্ঞান তোমার প্রভুর তরফ থেকে আগত। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্গত হয়ো না। অতপর তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরও যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে তর্ক করবে, তাকে বলে দাওঃ এসো। .... তারপর উভয়ে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি ....."

www.bjilibrary.com

এরপর নবী করীম (স)–কে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কিতাবীদেরকে সহজ ও সুস্পষ্ট অর্থাৎ খালেছ তাওহীদের দিকে আহবান জানাও। তাদেরকে বলো ঃ যে ইবরাহীম সম্পর্কে তোমরা তর্ক করো, তিনি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন খাঁটি তাওহীদবাদী। যারা তাঁর অনুসরণ করে চলে তাঁরাই তাঁর সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক রাখে। অতপর বলা হয়েছে ঃ পয়গম্বারদের কাছ থেকে—বিশেষত (তাঁদের উম্মতদের কাছ থেকে) হামেশা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, তোমাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে আগত প্রত্যেক নবীর প্রতি তারা ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এই প্রতিশ্রুতি যারা ভঙ্গ করে, তারা হচ্ছে ফাসেক—সীমা লংঘনকারী। সামনে এগিয়ে আরো বলা হয়েছে ঃ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীদের প্রতি যা কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনো, এটাই হচ্ছে ইসলাম—আর যে ব্যক্তি এই ইসলাম ছাড়া অপর কোনো দীনের প্রত্যাশী হবে, তার সে দীন আদৌ গ্রহণ করা হবে না। ফলত পরকালে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত–وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ –(ال عمران) পরিশেষে কিতাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ (ال عمران) 'কিতাবীরা যদি ঈমান আনতো তবে তাদের পক্ষেই উত্তম হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে ; আর বেশীর ভাগ লোকই হচ্ছে অবাধ্য।' এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান বলতে এখানে রসূলে আরবীর প্রতি ঈমানকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ যারা 'কিতাবধারী' তারা মূসা বা ঈসা (আ) কিংবা উভয়কে এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহকে মানে এবং আল্লাহর প্রতিও তারা বিশ্বাসী।

সবশেষে সূরায়ে হাদীদ থেকে যে আয়াতটি আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে অতীত নবীদের প্রতি ঈমান পোষণকারী সমস্ত মানুষকে দুটি জিনিসের দিকে আহবান জানানো হয়েছে। প্রথমটি আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাকওয়া অবলম্বন আর দ্বিতীয়টি আল্লাহ্‌র রসূল অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান পোষণ। অতপর বলা হয়েছেঃ তোমরা যদি এই দু'টি বিষয় গ্রহণ করো আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দু'টি অংশ পাবে। অর্থাৎ এক অংশ অতীত নবীদের প্রতি ঈমান ও তাকওয়ার পুরস্কার আর দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান

www.bjilibrary.com

আনার পুরস্কার। এ থেকে বোঝা যায়, যারা তাকওয়া ও পরহেজগারীর সঙ্গে অতীত নবীদের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা সঠিকভাবে পালন করে, তারাও আল্লাহ্‌র রহমতের কিছু না কিছু অংশ পাবে। অন্যান্য আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমনঃ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَبِ وَاَقَامُوا الصَّلوةَ اِنَّا لاَ نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (اعراف: ١٧٠) يَاَهْلَ الْكِتَبِ لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرةَ وَالاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ط- (المائده : ٦٨)

কিন্তু অন্যত্র একথাও তো বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط-(الرعد:١٩)

"যে ব্যক্তি তোমার ওপর অবতীর্ণ কিতাবকে সত্য বলে জানে, সে কি অন্ধ ব্যক্তির মতো হতে পারে?"

পরন্তু এ-ও বলা হয়েছে যে, যারা অতীত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে, তারা জানে যে কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত এবং সত্যাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ- (انعام:١١٤)

কাজেই এ দুই বিষয়ে আয়াতকে মিলালে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেতে পারে যে, যারা অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের কারণে রসূলে আরবীর সত্যতায় বিশ্বাসী নয়, তবে অতীত নবীদের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার জীবন যাপন করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে এটুকু অংশ পাবে যে, তাদের শাস্তিটা কমে যাবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ-

(প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)

www.bjilibrary.com

নবুয়াতের প্রতি ঈমান

পূর্বেকার প্রবন্ধটি যে ভদ্রলোকের অনুরোধক্রমে লেখা হয়েছিলো, তিনি আবার লিখছেনঃ

ঈমান বির-লিসালাত (নবুয়াতের প্রতি ঈমান) সম্পর্কে আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এখনো দু'একটি বিষয়ের মীমাংসা প্রয়োজন; সংক্ষেপে নিম্নে তা বিবৃত করছিঃ

(ক) আপনি বলেছেন যে, 'মানুষের প্রকৃতিতে আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তাঁর জন্যে নিষ্ঠাবান বন্দেগীর যোগ্যতা বর্তমান রয়েছে.....কিন্তু এই স্বাভাবিক যোগ্যতাকে কাজে লাগাবার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে এবং অতি সহজেই বোঝা যায় যে, এই শর্তগুলো সবার মধ্যে পুরোপুরি থাকে না।' এরপর এই শর্তগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আরয এই যে, আল্লাহ্র ভাষণ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (ال عمران) অনুসারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ পর্যন্ত জিম্মাদার—এটা প্রথম প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে। এখন যদি শিক্ষা-দীক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা এ শর্তাবলীর পূর্ণতার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই অপূর্ণতার দায়িত্ব এ বেচারার ওপর কেন আরোপিত হবে? পথ নির্বাচনের ব্যাপারে সে আপন সামর্থ অনুযায়ী চিন্তাশক্তি ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে এবং এ পর্যন্তই সে জিম্মাদার ছিলো। এমতাবস্থায় তাকে অপরাধ ও শাস্তির কবলে নিক্ষেপ করা দৃশ্যত তার সামর্থের বেশী বলে মনে হয়।

(খ) আপনি বলছেন যে, 'কুরআন শরীফ কোনো ধারাবাহিক রচনা নয়, এতে সুশৃংখলভাবে প্রতিটি বিষয়কে এক এক জায়গায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়নি। বরং সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনে মাঝে মাঝে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, এ হচ্ছে তারই সঙ্কলন মাত্র।' কিন্তু তুবও বলছেন যে, 'সূরায়ে আলে-ইমরারে ৬ষ্ঠ রুকূ' থেকে ১২শ রুকূ' পর্যন্ত ক্রমাগত পড়ে গেলে বৈপরিত্যের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যাব না।' প্রশ্ন পাঠাবার পূর্বেও ওই অংশটি পড়েছিলাম, আবারও ওই আয়াতগুলো পড়ে নিয়েছি। কিন্তু তাতে সমস্যার

www.bjilibrary.com

সমাধান হয় না। কিতাবীদের ঝগড়া-বিবাদ, একগুয়েমী, শিরক ইত্যাদি দেখে একটি সুসম নীতির দিকে তাদের আহবান জানানো হয়েছিলো এই বলে ঃ تَعَالَوا الى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم এ কথাগুলো এবং এ আহবানের কী মর্ম ও উদ্দেশ্য ছিলো? দৃশ্যত তা এই যে, তোমরা যদি নিজেদের খাঁটি শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করো এবং শিরক পরিত্যাগ করো, তাহলে আল্লাহ্‌র পথে আহবানের সাধারণ কাজে তোমরা ও আমরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করবো। এ কথাগুলো শুধু এমনি প্রথাগতভাবে অভিযোগ খণ্ডনের জন্যেই বলা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে কর্মীয় ঐক্যের দিকে আহবান জানানো উদ্দেশ্য ছিলোনা,—এটা মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

(গ) প্রশ্নটি লেখার সময় মানস-পটে কিতাবীদের কথাই ছিলো। উদ্ধৃত আয়াতটি এ জন্যেই সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়েছিলো। লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কিতাবীদের দায়িত্বশীল, আল্লাহভীরু, আমানতদার ও ধর্মপরায়ণ দলটির প্রশংসা যেখানেই করা হয়েছে, কতিপয় মুফাস্‌সির আপনার ধারায়ই তার তফসির করেছেন। অর্থাৎ এ দলটিতে রয়েছে তারা, যারা মুসলমান হয়েছিলেন, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, সা'লবাহ্, নাছারী, নাজরান প্রমুখ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, কুরআনের কথাও এটা সমর্থন করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ -(ال عمران : ١١٠)

আয়াতের তরজমায় আপনি বলেছেন যে, তাদের মধ্যে কিছুলোক ঈমান এনেছে আর অধিকাংশই হচ্ছে অবাধ্য-নাফরমান। আয়াতে فَاسِقُوْنَ ও مُؤْمِنُوْنَ উভয়ই একত্রে উল্লেখিত হয়েছে এবং উভয়ই হচ্ছে কর্তৃপদ। এর একটির অর্থ অতীতকালে নেয়া এবং অপরটি বর্তমানকালে এবং তারপর مِنْهُمْ ও اَكْثَرُهُمْ শব্দদ্বয়ের অর্থ নির্ণয় না করা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাতে এরূপ অপব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই এবং আপনি তার তরজমাও করেননি। তা হলো ঃ

لَيْسُوْا سَوَاءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ * يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ اُولٰئِكَ مِنَ

www.bjilibrary.com

الصّٰلِحِينَ * وَمَا يَفعَلُوا مِن خَيرٍ فَلَن يُكفَرُوهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ*
(ال عمران : ١١٣-١١٥)-

'সবাই সমান নয় ; কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা রাতের পর রাত জেগে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, সিজদা করে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে বারণ করে এবং সৎকাজের বেলায় তাড়াহুড়া করে—আর এরাই হচ্ছে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যে ধরনের সৎকাজই করুন না কেন, কখনো তার অনাদর হবে না। আর মুত্তাকী ও পরহেজগার লোকদের আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। কুরআনের যে আয়াতে খৃষ্টানদের এই মর্মে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে ধর্মপরায়ণ লোক রয়েছে এবং তারা অহংকারী নয়, সে আয়াত থেকেও এর সমর্থন মেলে। যদি উল্লেখিত আয়াতে আপনার উদ্দিষ্ট লোকদেরই বুঝান হতো, তবে কোরআনের বিশিষ্ট বাচনভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের শব্দাবলীও ভিন্নরূপ হতো।

ঘ) يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهٖ يُؤتِكُم كِفلَينِ مِن رَحمَتِهٖ (الحديد)
এ আয়াত সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, 'এতে সাবেক নবীদের প্রতি ঈমান পোষণকারী তামাম লোকদের দু'টি জিনিসের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। একটি হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর রসূল অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনা। তারপর বলা হয়েছে, তোমরা যদি এই দু'টি জিনিস অবলম্বন করো তবে আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা দু'টি অংশ পাবেঃ এক অংশ সাবেক নবীদের প্রতি ঈমান ও তাকওয়ার পুরস্কার হিসেবে আর দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমানের পুরস্কার হিসেবে। এর থেকে বুঝা যায় যে, যারা তাকওয়া ও পরহেজগারীর সঙ্গে পূর্বতন নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং তাদের প্রদত্ত শিক্ষা যথাযথভাবে পালন করে, তারাও আল্লাহর রহমতের একটি অংশ পাবে। অন্য আয়াত থেকেও এর সমর্থন মেলে। যেমনঃ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجرَ المُصلِحِينَ
কিন্তু এসব আয়াত মিলিয়ে প্রবন্ধের শেষে যে সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছেছেন, তা বিস্ময়কর।

জ্ঞানের দৈন্য হেতুই সন্দেহগুলো পেশ করলাম। যদি আপনি এবং অন্যান্য আলেমগণ এর নিরসন করে দেন, তা হলে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর নিকট অনুগৃহীত থাকবো।

www.bjilibrary.com

আপনি যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে পেশ করছিঃ

১। আপনার যুক্তিধারা যদি যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে শুধু নবুয়াত অবিশ্বাসীদেরকেই সত্যাশ্রয়ী বলে স্বীকৃতি দিতে হবে না, মুশরেক-নাস্তিক নির্বিশেষে প্রত্যেকের মতবাদকেই তার নিজের জন্যে মানা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ পর্যন্ত দায়ী এবং সত্যের সন্ধানের ব্যাপারে কোনো ভ্রান্তি বা অক্ষমতার দায়িত্ব তার নেই, তখন মুশরেক, নাস্তিক ও তাওহীদবাদী সবাই একই পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা সত্ত্বেও নবুয়াত সম্পর্কে 'সদিচ্ছা'র সাথে সন্দেহ পোষণকারী তাওহীদবাদী যেমন অপরাধ ও শাস্তির উপযোগী হবে না তেমনি 'সদিচ্ছা'র সাথে কোনো পাথর, বৃক্ষ ও জানোয়ারকে খোদায়ী মর্যাদা দানকারী মুশরেকও কোনোরূপ শাস্তির যোগ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'সদিচ্ছা'র সাথে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী নাস্তিকও কোনো শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে না। এই কারণে যে, এরা সবাই তো নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ পর্যন্তই দায়ী। আর যেটুকু এরা পৌঁছতে পেরেছে, এদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধিও ততোটুকু। বস্তুত এই নীতিকে স্বীকার করে নিলে মুমিন, কাফের ও মুশরেকের পার্থক্যটাই একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে এবং দীন ইসলাম প্রচারের পক্ষে কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিই বাকী থাকবে না। কারণ যেসব জিনিসের দিকে দীন-ইসলাম আহবান জানায়, জ্ঞান-বুদ্ধির অক্ষমতার কারণে—অথচ 'সদিচ্ছা'র সাথে—কোনো ব্যক্তি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেও সে পুরোপুরি সত্যাশ্রয়ীই থাকবে এবং এহেন কাজের জন্যে সে কোনোরূপ অপরাধ বা শাস্তির উপযোগী হবে না।

আপনি এই নিয়মটির ভিত্তি (البقرة)-لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط (আল্লাহ্ কাউকে তার সামর্থের বেশী কোনো জিনিসের কষ্ট দেন না)-এর ওপর স্থাপন করেছেন। কিন্তু আমি বলবো ঃ আপনি যা বুঝেছেন, তা-ই যদি এর অর্থ হয় তবে এ আয়াতটিকে কুরআন মজীদের গোটা শিক্ষার বিপরীত বলতে হবে এবং এমতাবস্থায় কুরআন মজীদ দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী নীতি পেশ করছে বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। একদিকে সে মানুষকে আল্লাহ্, ফিরেশতা, কিতাব, রসূল ও পরকালের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানাচ্ছে এবং এই জিনিসগুলো না মানলে মানুষ কাফের হবে, তাকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে বলে সাবধান করে দিচ্ছে। অপর দিকে সেই কুরআনই (আপনার

www.bjilibrary.com

ধারণা অনুসারে) লোকদেরকে শুধু নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ পর্যন্ত জিম্মাদার বলছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যদি ঈমানের পাঁচটি বিষয়, কিংবা তার কোনো একটি বিষয়কেও আয়ত্ত করতে না পারে এবং এ আয়াতের কারণে তারা একটি কিংবা সব কয়টিকেও অস্বীকার করে বসে এবং তার বিপরীত কোনো ভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে, তবুও তাদের ওপর কোনো দায়িত্ব আরোপিত হবে না এবং তারা কোনো অপরাধ বা শাস্তির উপযুক্ত হবে না বলে অভয় দান করছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কুরআন মজীদের শিক্ষার ভেতর বাস্তবিকই এরূপ বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা বর্তমান থাকলে কোনো বুদ্ধিমান লোকই তাকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে মানতো না।

কাজেই পূর্বেকার নিবন্ধে আমি যা বলেছি, তা-ই হচ্ছে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। নিজেন সীমাবদ্ধ শক্তির সাহায্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর বন্দেগীর সঠিক পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করার কোনো ঝক্কিই তিনি মানুষের ওপর চাপাননি। যে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ কতোটুকু তা তিনি জানেন। তিনি আরো জানেন, তাঁর মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি বহির্ভূত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে যে সুউচ্চ মর্গে আরোহণ করতে হয়, সেখানে পৌছবার উপযোগী চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানার্জন প্রতিভা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। তিনি এও জানেন যে, সাধারণ মানুষ তার পয়দায়েসী দুনিয়া ও পারিপার্শিক প্রভাবের দরুন নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার বলে নিজের গোটা এবাদাত-বন্দেগীকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেয়ার মতো পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ হতে পারে না। এই কারণেই তার শক্তি-সামর্থের চাইতে বেশী কষ্টের বোঝা তিনি তার ওপর আরোপই করেননি। এর পরিবর্তে তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাদেরকে সৎপথ সংক্রান্ত তাবৎ জ্ঞান সরবরাহ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে তার নিদর্শনাদি সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত করা ও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে শিক্ষাদান করার জন্যে তাঁদেরকে নিয়োজিত করেছেন- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * (الاعراف : ٣٥)- অবশ্য মানুষকে একটি ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, মানুষ নিরাসক্তভাবে আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের জীবন-চরিত ও শিক্ষাধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং দেখবে যে, আল্লাহর পথে

www.bjilibrary.com

আহবানের ভেতর তাঁদের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। তাঁরা মিথ্যাবাদী বা ধোঁকাবাজ নন। তাঁদের আহবান সততা, তাকওয়া ও কল্যাণের বিপরীত দিকেও নয়—তখন তাঁদের প্রতি ঈমান আনবে এবং সকল কাজে তাঁদের অনুবর্তন করবে। একে সামর্থ বহির্ভূত বলা যায় না। বরং হেদায়েত বা সৎপথের সন্ধানকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির এতো নিকটবর্তী করে দেবার পরও যদি কেউ সদিচ্ছা বা অসদিচ্ছার সাথে তাকে গ্রহণ না করে এবং তার বিপরীত পথে চলে তাহলে এই গাফলতির পরিণাম ফল তার অবশ্যই ভোগ করা উচিত।

আপনি আবার হয়তো বলবেন যে, কেউ যদি জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ অনুযায়ী রসূলদের জীবন-চরিত্র ও শিক্ষাধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেও তাঁদের নবুয়াত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তাহলে বোধশক্তির এই অক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি অনধিগম্যতার জন্যে তার ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তাকে অপরাধ ও শাস্তির উপযোগী বিবেচনা করা উচিত নয়। কিন্তু আমি বলবো, কোনো জিনিস যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত থাকে এবং কোনো মানুষ সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তখন সে অবশ্য অক্ষম বলেই বিবেচিত হবে। কারণ সে জিনিসটি পর্যন্ত পৌঁছুনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু কোনো জিনিস যদি জ্ঞান-বুদ্ধির সীমার মধ্যে থাকে এবং মানুষের পক্ষে সাধারণ মানসিক শক্তি দ্বারাই সে পর্যন্ত পৌঁছুনো সম্ভবপর হয়, আর তা সত্ত্বেও কেউ সেখানে না পৌঁছে, তবে তার পেছনে অবশ্যই দু'টি কারণ থাকবে ঃ হয় এ অনধিগম্যতার ব্যাপারে তার প্রবৃত্তির তাড়না প্রভাবশীল হবে, নচেৎ এই অনধিগম্যতা সম্পূর্ণত তার বোধশক্তির অক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হবে। প্রথম অবস্থায় তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এই নির্বোধ মানুষটির জন্যে আপনার যতোই করুণার উদ্রেক হোক না কেন, নিজের অক্ষম বুদ্ধির বলে যে সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেছে তা যে প্রকৃত সত্য নয়, এটা অনস্বীকার্য। আর যে ব্যক্তি সত্য অবধি পৌঁছিতে পারেনি, তার পরিণতি সত্যে উপনীত ব্যক্তিদের পরিণতির সমান হবে, এটা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত কথা হতে পারে না।

এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, প্রতিটি মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ পর্যন্তই চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। এ সীমা ছাড়িয়ে সামনে এগোনো তার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সত্য ও সত্যতা কি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত

www.bjilibrary.com

চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল জিনিস অথবা কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, তা একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় জিনিস? আপনি যদি প্রথম জিনিসটি বিশ্বাস করেন, তা হলে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, ৫০ ও ৩০ এর যোগফল কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, বরং প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা ও ভাবনা করার পর 'সদিচ্ছার' সাথে যে সংখ্যায়ই পৌঁছবে, -ত। ৭৯, ৮১ কিংবা ৮০ যা-ই হোক না কেন—তাই হবে সঠিক যোগফল। কিন্তু এটা এমনই অযৌক্তিক কথা যে, আপনি এটা বিশ্বাস করবেন বলে আশা করি না। কাজেই আপনাকে স্বভাবতই দ্বিতীয় জিনিসটি মানতে হবে। অর্থাৎ কারো জ্ঞান-বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারুক আর না পারুক, ৫০ ও ৩০ এর যোগফল হচ্ছে ৮০। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি ৫০ ও ৩০-এর যোগফল ৭৯, ৮১ কিংবা অন্য কিছু বলে, সে নির্বুদ্ধিতার কারণে 'সদিচ্ছা'র সাথেই তা বলুক আর বুঝে সুজে অসদিচ্ছার সাথে বলুক-উভয় অবস্থায়ই তার হিসাব ভুল হবে। এ ভুলের কারণে তার হিসাবের তালিকা শেষ পর্যন্ত ভুলই সাব্যস্ত হবে এবং এ তালিকা প্রস্তুতে ব্যয়িত তার সমগ্র শ্রমমেহনতই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বস্তুত হিসাবের শুদ্ধাশুদ্ধিতে 'সদিচ্ছা' ও 'অসদিচ্ছা'র কোনো স্থান নেই। কাজেই যে ব্যক্তি 'সদিচ্ছা'র সাথে কোন ভুল হিসাব করে, তাকে নির্ভুল হিসাব গ্রহণকারীর সমান মর্যাদাও দেয়া যেতে পারে না। অবশ্য অসদিচ্ছাপরায়ণ দুষ্কৃতিকারীকে যতোটা শাস্তি দেয়া হবে, সদিচ্ছাপরায়ণ নির্বোধকে ততোটা দেয়া হবে না—এটুকু পার্থক্য হয়তো করা হবে।

(২) কুরআন মজীদের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছিলাম, তদ্বারা কুরআনী আয়াতের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক সূত্র নেই—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং এ দ্বারা আমি এ ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলাম যে, কুরআনের কোথাও এক একটি বিষয় সম্পর্কে একজায়গায় ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়নি। বরং যেখানে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেখানে সমস্যার বিভিন্ন দিকের মধ্যে এক বা একাধিক দিক বিবৃত হয়েছে। এ কারণেই কুরআনের পাঠক কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে চাইলে কোরআনের গোটা শিক্ষাকে সামনে রাখা তার পক্ষে অপরিহার্য। নচেৎ এক বা কয়েকটি মাত্র আয়াতের ওপর নির্ভর করে বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত পরিহার করলে সে কিছুতেই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

(৩) অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সূরায়ে আলে-ইমরানের ৬ষ্ঠ রুকূ থেকে ১২শ রুকূ পর্যন্ত বারংবার পড়েও আপনার মনের খটকা দূরীভূত হয়নি অথচ

www.bjilibrary.com

৬ষ্ঠ রুকূর গোড়াতেই আপনি দেখতে পাবেন যে, যারা হযরত ইবরাহীম, ইয়াকুব, মূসা এবং বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীদের প্রতি ঈমান রাখতো, তাদেরকে হযরত ঈসার প্রতি ঈমান না আনার কারণে পরকালে কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, এই লোকগুলো নবুয়াতের দাবী শুনে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির সামর্থ অনুসারে চিন্তা করেছে এবং সে সম্পর্কে তাদের মন সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলেই তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা আপনার প্রস্তাবিত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -এর নীতি প্রয়োগ করেননি বরং তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেনঃ فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -(ال عمرٰن : ٥٦) আর শুধু এখানেই নয়, কুরআন মজীদের অন্য কোথাও একথা বলা হয়নি যে, যারা হযরত ঈসার নবুয়াতের প্রতি সদিচ্ছার সাথে সন্দিহান, অথচ শিরকের আবশ্যকতা থেকে মুক্ত এবং তাকওয়ার পথে অবিচল, তারা এ শাস্তির ঘোষণা থেকে ব্যতিক্রম।

(৪) বিভ্রান্তির বড়ো কারণ হচ্ছে আলে-ইমরানের সেই আয়াতটি, যাতে সমস্ত আহলে-কিতাবকে একটি সাধারণ বাণীর দিকে আহবান করা হয়েছে, কিন্তু নবুয়াতে মুহাম্মাদীর প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আয়াতটির মূল বক্তব্য আমাদের সামনে রাখা দরকার।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ *-(ال عمران : ٦٤)

"(হে মুহাম্মাদ!) বলে দাও, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি বাণীর দিকে যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান। তাহলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবো না, কাউকে তার সাথে শরীক করবো না, আর আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া আপন প্রভু বানাবো না। অতপর তারা এ দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা মুসলিম।"

এ আয়াতের কোনো শব্দ থেকে আপনি এ অর্থ বের করেছেন যে, আল্লাহর পথে আহবানের কাজে মুসলমানদের সাথে শরীক হওয়ার জন্যে ইহুদী ও

www.bjilibrary.com

খৃষ্টানদের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোই এ বাণীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো? আর এ কথাই বা কোথায় বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের খাঁটি শিক্ষা অনুসরণ করো এবং শিরক পরিহার করে চলো, তবে আল্লাহর পথে আহবানের সাধারণ কাজে আমরা এবং তোমরা সমান হবো? আর এ অর্থ গ্রহণেরইবা কোন্ ইঙ্গিতটা রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়াতের প্রতি অবিশ্বাসীরাও ঈমান পোষণকারীদের মতোই সত্যাশ্রয়ী এবং সমান মর্যাদার অধিকারী?

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রসূলে করীম (স) আহলে কিতাবের (ইহুদী ও খৃষ্টান) সামনে আপন নবুয়াতের দাবী উপস্থাপন করলে তারা তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় (আলোচ্য আয়াতের পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে।) তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে আদেশ দেন যে, তোমার এবং তাদের মধ্যে যে বিষয়টি সাধারণ, তার প্রতি তুমি তাদেরকে আহবান জানাও। অর্থাৎ সে বিষয়টি হলোঃ

* আল্লাহ্ ছাড়া কারো বন্দেগী করো না।
* আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না।
* আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের মধ্যকার কাউকে প্রভু, ইলাহ ও প্রকৃত শাসনকর্তা বানিয়ো না।

এ তিনটি বিষয় মূসা (আ)-এর আসল শিক্ষায়ও বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এগুলোকে পরিত্যাগ করে বসেছিলো। বরং খৃষ্টানরা উল্টো হযরত ঈসা ও মরিয়াম (আ)-কেই উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো। এভাবে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর সাথে অন্যান্যকে শরীকদার করতে শুরু করেছিলো- قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ(التوبه) ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ে তাদের পীর, আলেম ও ধর্মীয় নেতাদেরকে 'আল্লাহর' আসনে বসিয়ে নিয়েছিলো- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -(التوبه : ٣١) যেহেতু মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মৌলিক শিক্ষা বর্জনের ফলেই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহীর সূচনা হয়েছিলো, তাই আদেশ দেয়া হয় যে, যে জিনিসটি তাদের স্বীকৃত ধর্মের শিক্ষা এবং তোমাদেরও দীনের ভিত্তি, প্রথমে সেদিকেই তাদের আহবান জানাও। এই দাওয়াতের দু'টি উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত, যেসব সত্যসন্ধ ও সুস্থ বুদ্ধির আহলে কিতাব আপন ধর্মের শতাব্দী কালের উত্তরাধিকারী বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে, তাদের পক্ষে মুহাম্মাদ

www.bjilibrary.com

(স)–এর নবুয়াত স্বীকার করতে কোনো অসুবিধাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দ্বিতীয়ত, সাধারণ কালেমার প্রতি এই দাওয়াতের ফলে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই জানতে পারবে যে, মূসা, ইসা এবং অন্যান্য নবীগণ যে জিনিসটির দিকে আহবান জানিয়েছিলেন, মুহাম্মাদ (স)–ও ঠিক সেদিকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কাজেই প্রথমোক্ত নবীদের প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষে এই শেষ নবীকে অবিশ্বাস করার কী যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে?

এ হচ্ছে উক্ত আয়াতের পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট মর্ম। এ থেকে এ কথা কি করে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাবের কাছে মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান আনার দাবী এর উদ্দেশ্য ছিলো না? আর এ থেকে এ কথাইবা কি করে প্রতিভাত হয় যে, আহলে কিতাব যদি কেবল 'আপন খাঁটি শিক্ষা' অনুসরণ এবং শিরক পরিবর্জন করে, তা হলে মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি অবিশ্বাস কিংবা তাঁর নবুয়াতে সন্দেহ পোষণ করা সত্ত্বেও তারা সুপথপ্রাপ্ত এবং নাজাতের যোগ্য বিবেচিত হবে? তা হলে যে আয়াতে গোটা মানব জাতিকে মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, এ আয়াত কি তাকে নাকচ করে দিচ্ছে?–

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ... فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ ... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ*–(اعراف:١٥٨)

পরন্তু যে আয়াতে এই নবীর নবুয়াত এবং এর আনীত পয়গামের প্রতি অবিশ্বাসীকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে, এ আয়াত কি তাকেও রহিত করছে?– وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ *–(البقره :١٢١) কুরআনে কি এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় যে, কোনো জাতির কাছে নবী পাঠানোর পর তাঁকে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও সে জাতি হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং নাজাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে? যদি আল্লাহর তরফ থেকে আগত রসূলকে স্বীকার ও অস্বীকার করা এক কথাই হয় এবং অস্বীকৃতি সত্ত্বেও স্বীকৃতির মতোই নাজাত পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে পয়গম্বর প্রেরণের চাইতে অহেতুক ও ফালতু কাজ আর কি হতে পারে? দৃশ্যত এরূপ চিন্তাধারার মধ্যে বিরাট একটা উদারতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, আল্লাহর প্রতি এরূপ কথা আরোপ করা প্রকারান্তরে আল্লাহকে (মায়াজ–আল্লাহ) নির্বোধ প্রমাণ করারই শামিল।

www.bjilibrary.com

(৫) গ প্রসঙ্গে আপনি যা কিছু বলেছেন, তার জবাবে আমার উপরোক্ত বক্তব্যই যথেষ্ট। কিন্তু যে আয়াত দুটির প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেন, সে দুটির আরো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ (ال عمرٰن) এর মধ্যে اٰمَنَ বলতে মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া আর কি হতে পারে? এই আয়াতে 'আহলে কিতাব' বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের আহলে–কিতাব হওয়াই তো এটা প্রমাণ করছে যে, তারা আল্লাহ্, তাঁর কিবাত, তাঁর রসূল, ফেরেশতা এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে! এখন আপনিই বলুন, আর কার প্রতি ঈমান আনা বাকী রয়ে গিয়েছে? এভাবে مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ এর মধ্যে সেই আহলে কিতাবেরই কতিপয় ব্যক্তিকে যখন মুমিন বলা হয়েছে, এখন তার মর্ম এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এই মুমিনরা ছিলেন রসূলে করীম (স)–এর প্রতি ঈমান পোষণকারী আহলে কিতাব? আর এটা তো জানা কথাই যে, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নেহাতই মুষ্টিমেয়। তাদের বেশীর ভাগ লোকই রসূলের প্রতি ঈমান আনেনি এবং এদেরকেই বলা হয়েছে 'ফাসেক'। তরজমায় আমি অতীত ও বর্তমান কালের পার্থক্য শুধু মর্ম পরিষ্কার করার জন্যেই করেছিলাম। নচেৎ 'তাদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তি মুমিন এবং বেশীর ভাগই ফাসেক'—এরূপ তরজমা করলেও মর্ম পরিবর্তিত হয় না এতটুকু।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের মধ্যেও মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি দল রাতের বেলায় এবাদাত করে, কিতাব পড়ে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং পরহেজগারীর সাথে জীবন যাপন করে। এরা শুধু নিজেরাই সৎকর্মশীল নয়, বরং অন্যদেরকেও সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। অপর একটি দল আল্লাহর বাণীর প্রতি অবিশ্বাসী, সত্যবিমুখ, দুষ্কৃতিকারী ও অবাধ্যাচারী। এর মধ্যে প্রথমোক্ত দল নিসন্দেহে দ্বিতীয় দলটির চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্তায় এ দু'টি দলকে একই রূপ মনে করলে এবং এদের পরিণামও একই রূপ হলে তা হবে ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই দুষ্কৃতিকারীদের মুকাবিলায় সৎকর্মশীলদের অবশ্যই মর্যাদা পাওয়া উচিত এবং তা পাবেও। কিন্তু এ কথাও পূর্বে বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই পরহেজগার ও সৎকর্মশীল আহলে কিতাবের পক্ষেও নবী উম্মীর প্রতি ঈমান আনা শ্রেয়তর ছিলো। (لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) কারণ,

www.bjilibrary.com

আল্লাহ নবীর আনুগত্যের জন্যেই তাঁকে পাঠিয়েছেন (وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলকে অমান্য করে, মূলত সে আল্লাহর কথাই অমান্য করে। (مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ) এরই নাম হচ্ছে فسق বা সীমালংঘন (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ) আর সীমা লংঘনকারীদের অবশ্যই তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।

(৬) (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আমি যা কিছু বলেছি, তা অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাষায়। প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ও পরহেজগার আহলে কিতাব আল্লাহ্‌র রহমতের কত অংশ পাবে এবং তাদের কৃতকর্মের সমাদরই বা কিভাবে হবে, আমি তা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। এটা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। আর আল্লাহ্ তাঁর কিতাবেই যখন এর কোনো ব্যাখ্যা দান করেননি, তখন আমার কিংবা অন্য কারোর এটা নির্ধারণ করার কোনো অধিকার নেই। আমি নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, তাদেরকে যেমন কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত তুচ্ছ জায়গায় রাখা হবে না, তেমনি তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার—তামাম রসূলের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি এবং তামাম কিতাবের সঙ্গে কুরআন মজীদের প্রতি বিশ্বাসী-লোকদেরও সমান মর্যাদা দেয়া হবে না। [১]

(প্রথম প্রকাশঃ নবেম্বর, ১৯৩৪)।

---

১. এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর বেশ কিছুকাল যাবত পুনর্দর্শনের সুযোগ পাওয়া যায়নি। এক্ষণে এই স্থানটির প্রতি নজর পড়তেই দু'টি হাদীস মনে পড়লো। হাদীস দু'টি আলোচ্য আয়াতে সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করছে।

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ-(رواه مسلم)

"যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ! এ জাতির মধ্যে এমন কোনো লোক নেই—সে ইহুদী হোক কি খৃষ্টান—যে আমার নবুয়াতের খবর শুনেছে অথচ আমার আনীত পয়গামকে অবিশ্বাস করেছে এবং তারপরও দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।"

www.bjilibrary.com

ثَلٰثَةٌ لَّهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ . . . . الخ -(بخارِ ومسلم)

"তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ প্রতিফল পাবে। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যে প্রথম আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং আপন নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো আর এখন মুহাম্মাদের প্রতিও ঈমান এনেছে।"

বস্তুত এক ব্যক্তি পূর্ববর্তী নবীকে মানার সাথে সাথে পরবর্তী নবীকেও মানতে শুরু করলে দ্বিগুণ প্রতিফল পাবে আর একব্যক্তি পরবর্তী নবীকে অস্বীকার করলে পূর্ববর্তী নবীকে স্বীকার করার প্রতিফল থেকেও বঞ্চিত হবে—দৃশ্যত একে একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়। বরং স্থূল দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় নবীকে মানার প্রতিফল দু'টি হলে একজনকে মানার প্রতিফল একটি হওয়াই উচিত। কিন্তু এটা শুধু অঙ্কশাস্ত্রের ভুল মাত্র, যা সামান্য একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দূরীভূত হয়ে যায়। ধরুন, একব্যক্তি সরকারের নিযুক্ত প্রথম গভর্ণরের অধীনে চমৎকার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। অতপর সরকার তার পরিবর্তে দ্বিতীয় গভর্ণর পাঠালে লোকটি তার অধীনেও সুষ্ঠুভাবে কাজ করলো। সরকার বলছেন যে, আমরা তার পূর্ববর্তী খেদমতেরও পুরস্কার দেবো আর পরবর্তী খেদমতেরও। এখন সরকারের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, যে ব্যক্তি প্রথম গভর্ণরকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার আনুগত্যও করেছে কিন্তু দ্বিতীয় গভর্ণরকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, সরকার তাকে অবশ্যই প্রথম গভর্ণনের অধীনে সম্পাদিত খেদমতের পুরস্কার দেবেন? এ প্রশ্নের যে কোনো জবাবই আপনি দিন না কেন, উভয় পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাসীদের পুরস্কার দ্বিগুণ কেন এবং পরবর্তী পয়গাম্বরের প্রতি অবিশ্বাসী ও শুধু পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি আদৌ কোনো পুরস্কারের যোগ্য নয় কেন—এ সমস্যারও জবাব হচ্ছে ঠিক তাই। অবশ্য একথা সত্য যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তি যুলুম, পীড়ন ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত না হলে তার পরিণাম যালেম ও দুষ্কৃতিকারীদের মতো হবে না।

www.bjilibrary.com

কুরআনের প্রতি সবচাইতে বড়ো অপবাদ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *-(البقره : ٦٢)

কুরআন মজীদের আয়াতে অর্থগত বিকৃতি সাধনের চেষ্টা প্রত্যেক যুগেই চালান হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই কুটিল-মনা লোকেরা আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট ভাষণগুলোকে টেনে-হিচড়ে নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়না কিংবা অন্য মানুষের বাসনা ও চাহিদা অনুসারে ঢালাই করবার প্রয়াস পেয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান যুগে উপরোক্ত আয়াতটিতে যে অর্থগত বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, তার চাইতে বিভ্রান্তিকর বিকৃতি সম্ভবত আর কখনো করা হয়নি। অন্যান্য বিকৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে কাটছাঁট করেছে কিংবা ইসলামী শিক্ষার কোনো বিশেষ অংশের ওপর আঘাত হেনেছে। কিন্তু যে ভিত্তির ওপর কুরআন মজীদ সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক সরল পথের দিকে আহবান জানায়, এ বিকৃতি সেই ভিত্তিকেই একেবারে ধ্বসিয়ে ফেলে। বরং আরো সামনে এগিয়ে বলা যায়, মানব জাতির সৎপথ লাভের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে নিয়ম অনুসারে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত কিতাব অবতরণ ও নবী প্রেরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে, এর আঘাত সরাসরি তার ওপরে গিয়েই পড়ে। বস্তুত কুফরী ও ভ্রষ্টতার বড়ো বড়ো নায়করা পর্যন্ত বাতিল ও গোমরাহীর যে খেদমত আজাম দিতে পারেনি, এই বিকৃতি তাই দিতে সমর্থ হয়েছে। একদিকে অমুসলমানদেরকে কুরআনের সত্য দাওয়াত গ্রহণ না করার জন্যে খোদ কুরআন থেকেই দলিল সরবরাহ করছে। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে আত্মগোপনকারী যেসব মুনাফিক ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্যে উদগ্রীব, তাদেরকে খোদ ইসলামের জবানীতেই ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্য তুলে দেয়ার অনুমতি দান করছে। পরন্তু যে বিপুল সংখ্যক ঈমানদার লোক আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর আনুগত্যে অবিচল রয়েছে, এটি তাদের ঈমানের

www.bjilibrary.com

ভিতকে টলমলিয়ে দিচ্ছে। এমন কি, সে বেচারারা এরূপ সন্দেহে পড়ে যাচ্ছে যে, কুরআন মজীদ ও নবুয়াতে মুহাম্মদীকে অস্বীকার করেও যখন মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে এবং মুক্তির জন্যে কিতাব ও নবুয়াতের প্রতি ঈমান আনার আদৌ কোনো প্রয়োজনই নেই, তখন ইসলামের আনুগত্য করা একেবারেই অর্থহীন—আর আমাদের পক্ষেও মুসলমান হওয়া কিংবা হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী, ইয়াহুদী হওয়া সমান কথা। ফলকথা, ইসলামের ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই একটি প্রচণ্ড আঘাত (Master Stroke)। যে মানসিকতা হেদায়েতের কিতাব থেকে গোমরাহীর এহেন অস্ত্র বের করেছে, তার সত্যিই প্রসংশা করা উচিত!—সম্ভবত কুরআনের ওপর এর চাইতে বড়ো অপবাদ আর কখনো চাপানো হয়নি।

আমি বহুতরো মজলিসে এ বিকৃতির যাদুকরি প্রভাব দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা নিদারুণভাবে এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। 'তরজুমানুল কুরআনে'র কতিপয় পাঠকও আমায় লিখেছেন যে, এই আয়াতের 'আধুনিক ব্যাখ্যার' ফলে গুরুতর রকমের ভুল ধারণা বিস্তার লাভ করছে। কোনো কোনো অমুসলিম ধর্ম বেত্তার রচনা ও বক্তৃতা থেকেও অনুমান করা যায় যে, এই নয়া ব্যাখ্যা থেকে প্রচুর সুযোগ গ্রহণের প্রয়াস চলছে। এই ফেতনা দেখে কুরআন মজীদ থেকে আয়াতটির সঠিক অর্থ নিরূপণ করা এবং তারই আলোকে এর মনগড়া অর্থ খণ্ডন করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কারণ কথক নিজেই যখন নিজের কথার ব্যাখ্যা দান করেন, তখন তার কথার অন্যরূপ অর্থ করার অধিকারই থাকে না।

সর্বপ্রথম মূল আয়াতটি দেখুন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *-(البقره : ٦٢)

"নিশ্চিতরূপে যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ মুসলমান) আর যারা ইয়াহুদী, নাছারা ও ছাবী, তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের সবার জন্যে ভয় ও শঙ্কার কোনো কারণ নেই।"

www.bjilibrary.com

সূরা মায়েদার দশম রুকূতে এই বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ। উভয় আয়াতের অর্থ নিরূপণ করার পূর্বে পৃথক পৃথকভাবে এদের প্রতিটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন। অতপর এ দুই আয়াতের সংক্ষিপ্ত কথাটি কুরআনের অন্যান্য জায়গায় কিরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দেখতে হবে।

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا –এর শাব্দিক মানে হলো ঃ 'নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে।' কিন্তু এ উদ্দেশ্যেরই বিধেয় مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে) অংশে পুনরায় ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সভাবতই এই প্রশ্ন জাগে, ঈমানদার লোকদের ঈমান আনার অর্থ কি? اَلَّذِيْنَ বলতে যদি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণকারীদেরই বুঝায়, তাহলে তাদের জন্যে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলা একান্তই অর্থহীন বিবেচিত হবে। কাজেই এখানে মানতেই হবে যে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলতে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কেই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলতে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমান পোষণ করে—তার সম্পর্ক যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথেই থাকুক না কেন—তাকেই বুঝানো হয়েছে।

কুরআন অবতরণকালে মানুষের মন-মগজে দলগত বিভেদের যে ধ্যান-ধারণা প্রভাবশীল ছিলো, আজো তাই ক্রিয়াশীল রয়েছে। সে সব ধ্যান-ধারণার আলোকে এটা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, কুরআন মজীদ এখানে মূলত দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পার্থক্য করছে ঃ প্রথমত যারা ঈমানদার দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর দ্বিতীয়ত যারা বাস্তবিকই ঈমানী প্রাণবস্তুর অধিকারী। আজো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দুনিয়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই লোকদের মধ্যে পার্থক্য করছে। এক ব্যক্তিকে মুমিন কিংবা মুসলিম বলা হয় শুধু এই জন্যে যে, সামাজিক ভাগাভাগির দিক থেকে সে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সে প্রকৃতপক্ষেই 'মুসলিম' কিনা, এটি কোনো বিচার্যবিষয় নয়। অনুরূপভাবে একজন খৃষ্টান, ইয়াহুদী বা বৌদ্ধকেও তার বাহ্যিক সম্পর্কের দৃষ্টিতেই খৃষ্টান, ইয়াহুদী ইত্যাদি আখ্যা দেয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে সে নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করে কিনা, তা বিচার করা হয় না। কুরআনের অবতরণ কালেও ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতি বর্তমান ছিলো। প্রকৃত সত্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু বাহ্যিক অবস্থার দৃষ্টিতেই তখন মানব

www.bjilibrary.com

জাতিকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছিলো। অমুক ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স)–এর দলের লোক, অমুকে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক আর অমুক খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত—কেবল এই দৃষ্টিতেই লোকেরা ব্যক্তি ও দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতো। এই দলীয় ভাগাভাগির দৃষ্টিতে মুনাফেকরাও ঈমানদার লোকদের (الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) মধ্যে গণ্য হতো।—অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানই পোষণ করতো না।

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা এই দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তিকে লোকদের সামনে তুলে ধরতে চান। এ কারণে তিনি প্রকৃত সত্য বর্ণনা করার পূর্বে পৃথক পৃথকভাবে সম্প্রদায়গুলোর নামোল্লেখ করছেন এবং মুসলিম সম্প্রদায় থেকেই এর সূচনা করেছেন।

(২) وَالَّذِيْنَ هَادُوْا –শাব্দিক অর্থঃ 'যারা ইয়াহুদী হয়েছে।' ওপরে যে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে, এখানেও লক্ষ্য হচ্ছে তাই। 'ইয়াহুদী হয়েছে' কথার তাৎপর্য এ নয় যে, যারা মূলতই ইয়াহুদীদের আকীদা ও আর্দশ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যেই পরবর্তী বিধান প্রদত্ত হচ্ছে। বরং প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরই এখানে الَّذِيْنَ هَادُوْا বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(৩) وَالنَّصٰرٰى – আলোচনার ধারা অনুসারে এখানেও 'নাছারা' বলতে 'বিশ্বাসী খৃষ্টানদের' নয়, বরং খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বুঝানো হচ্ছে।

(৪) وَالصّٰبِئِيْنَ কুরআন অবতরণ কালে ইরাক ও তার সন্নিহিত এলাকার একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন নবীদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারকাপূজা ও ফেরেশতাপূজার আকীদা–বিশ্বাস মিশে গিয়েছিলো। আরববাসী এ শব্দটি সেই লোকদের সম্পর্কে ব্যবহার করতো। এখানেও صٰبِئِيْنَ বলতে শুধু ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরই বুঝানো হচ্ছে—ছাবী ধর্মে বিশ্বাসীদের নয়।

(৫) مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

শাব্দিক অর্থ হলোঃ 'যে কেউ ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি এবং যে কেউ সম্পাদন করেছে সৎকাজ, তাদের জন্যেই রয়েছে প্রতিফল তাদের প্রভুর কাছে।'

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা একটি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। তা হলো এই যে, নাম–ধাম ও বাহ্যিক সম্পর্কের দিক থেকে বিভিন্ন জাতি ও

www.bjilibrary.com

সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের হাশরও হবে সেই অনুসারে। ইয়াহুদীরা মনে করে, যারা তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত, তারাই আসলে নাজাত পাবে—এ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কারো জন্যে নাজাত নেই। খৃষ্টানদের ধারণা এই যে, তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত সকলেই হচ্ছে মিথ্যাশ্রয়ী। অনুরূপভাবে মুসলমানরাও এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে যে, শুধু নামধাম, খান্দান ও কতিপয় বাহ্যিক আকৃতি ও রসমের দিক দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে 'মুসলমান' হওয়া এবং এ দিক দিয়ে যারা এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারাই এর বহির্ভূক্ত লোকদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই ভ্রান্ত ধারার জবাবেই আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন যে, মানুষে মানুষে প্রকৃত পার্থক্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় না, বরং এর আসল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তি মুমিন নামে পরিচিত, কিন্তু ঈমান ও সৎকর্মের গুণে বিভূষিত নয়, প্রকৃতপক্ষে সে মুমিনই নয় এবং মুমিনদের জন্যে যে পরিণতি নির্ধারিত, তার পরিণতি তা হতে পারে না। অনুরূপভাবে যে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা ছাবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সে যদি ঈমান ও সৎকর্মের গুণে বিভূষিত হয় তবে সে আর ইয়াহুদী বা ছাবী থাকবে না বরং সে হবে মুমিন। আর মুমিন ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে নির্ধারিত হাশরই হবে তার হাশর। কিন্তু সে যদি এসব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকা যেমন কারো জন্যে মঙ্গলকর নয়, তেমনি ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ছাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াও কারো জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছেঃ

قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ * بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ*

(البقره :١١١-١١٢)-

"তারা বলেঃ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত কেউ বেহেশতে যাবে না। এটা শুধু তাদের মনগড়া কথা মাত্র। হে মুহাম্মাদ! তাদের বলে দাওঃ

www.bjilibrary.com

তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো প্রমাণ নিয়ে এসো। তবে হাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎকর্মশীল হবে তার জন্যেই আপন প্রভুর কাছে রয়েছে প্রতিফল। এমন লোকদের জন্যে কোনো ভয় বা শঙ্কার কারণ নেই।"

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط-(المائده : ١٨)

"ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়পাত্র। হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের গুণাহর জন্যে কেন তোমাদের সাজা দেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অন্য মানুষকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তোমরাও তেমনি মানুষ মাত্র।"

قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَّ غَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ * فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ قف وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ * -(ال عمران : ٢٤-٢٥)

"তারা বলে ঃ আমাদেরকে আগুন মোটেই স্পর্শ করবে না। আর স্পর্শ করলেও বড়ো জোর কয়েক দিনের জন্যে। তাদের এ মনগড়া কথাই তাদেরকে আপন দীন সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। অতপর সেদিনের সেই ক্ষণটি কেমন হবে, যেদিন আমরা তাদের জমায়েত করবো, যেদিনের আগমন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই—যেদিন প্রত্যেকেই আপন কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে এবং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।"

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ * -(البقرة : ٩٤)

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের ঘর যদি তোমাদের জন্যেই নির্ধারিত থাকে এবং অন্যান্য লোকেরা তার অংশীদার না হয়, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যুই কামনা করা উচিত—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এ আয়াতসমূহে এ সত্যই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোনো সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার কোনো আত্মীয়তা নেই। মুক্তির ব্যাপারেও কোনো

www.bjilibrary.com

জাতির একচেটিয়া অধিকার নেই। অমুক জাতির মধ্যে জন্ম হয়েছে কিংবা অমুক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে—কেবল এ হিসেবেই কেউ বিশেষ ব্যবহার পাবার অধিকারী নয়। মানুষ হিসেবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবাই সমান। কোনো জাতি শুধু নিজস্ব পরিচয়েই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র নয় আর কোনো জাতি অমুক নামে পরিচিত কিংবা অমুক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত—কেবল এ জন্যেই আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য নয়। আল্লাহ্‌র কাছে আত্মীয়-সম্পর্ক এবং জাতীয়তা নয়, বরং নীতি ও সত্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সাচ্চা মনে ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে ভালো প্রতিফল পাওয়া যাবে। আর ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত হলে যে কোনো সম্প্রদায়েরই পরিচয় থাকুক না কেন, মন্দ পরিণাম থেকে কোনো জিনিসই বাঁচাতে পারবে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নীতি। এই বিষয়টিই মুসলমান এবং আহলে কিতাব উভয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ لا وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا * وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا *-(النساء : ١٢٣-١٢٤)

"পরকাল তোমাদের আকাংখা এবং আহলে কিতাবদের কামনার ওপর নির্ভরশীল নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবেই এবং আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্যে সে কোনো সহায় ও সাহায্যকারীই পাবে না। আর যে কেউ সৎকাজ করবে ঈমানদার অবস্থায়, সে পুরুষ হোক কি নারী—এমন লোক অবশ্যই জান্নাতে যাবে। এদের কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও অবিচার করা হবে না।"

আলোচ্য আয়াতে এ কথাটিকেই এক নতুন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। যে পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, সেখানে মুসলিম হবার জন্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন আর সৎকর্মশীল হবার জন্যেই বা কি আচরণবিধি হওয়া উচিত—এটা কোনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। এসব খুঁটিনাটি বিষয় কুরআনের অন্যত্র বিবৃত করা হয়েছে। সেখানে কেবল এই সাধারণ নীতিটুকুই বিবৃত করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, আল্লাহ্‌র কাছে আসল বিচার্য বিষয় হচ্ছে মৌলিক সত্যের; দুনিয়ার মানুষ যে বহির্দৃশ্য, বহিরাকৃতি ও

www.bjilibrary.com

দৃশ্যমান সম্পর্কের জন্যে প্রাণপাত করে, তার কোনো গুরুত্ব নেই। এ কারণেই সেখানে মৌলিক সত্যের প্রতি একটা সামান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখন এ থেকে যদি কেউ এই মর্ম গ্রহণ করে যে, এ আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনার কথাই শুধু বলা হয়েছে, সুতরাং এ দুটি জিনিসই মানুষের মুক্তির জন্যে যথেষ্ট, এরপর কোনো নবী বা কিতাব বিশ্বাস করা এবং কোনো শরীয়াতের অনুবর্তন করার প্রয়োজন নেই অথবা যদি কেউ বলে যে, হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু এবং ইয়াহুদীকে খাঁটি ইয়াহুদী বানানো এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের স্বীকৃত ধর্মের অনুবর্তী করে তোলাই কুরআনের এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য—তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, সে কুরআনের ব্যাখ্যা দান করছে না বরং তার সঙ্গে উপহাস করছে মাত্র। আলোচ্য আয়াত দুটি ছাড়া বাকী গোটা কুরআনকে অস্বীকার না করলে এমন ব্যক্তির কথা কিছুতেই মানা যেতে পারে না।

একথা নিসন্দেহ যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানই হচ্ছে দীন-ইসলামের মূলভিত্তি। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম এরই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের স্বীকৃতিদানই শুধু আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান বলতে কি বুঝায়, তা কুরআনই আমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বাতলে দিচ্ছে।

بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *- (البقرة : ١١٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীলতা অবলম্বন করেছে, তার জন্যেই আপন রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার আর এমন লোকদের জন্যে কোনো ভয় বা শঙ্কার কারণ নেই।"

এখানে ঈমান বিল্লাহ্র ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এর লক্ষ্য হচ্ছে 'ইসলাম' (اِسْلَامٌ) অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ এবং নিজেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুগত করা। আর اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا আয়াতে যে প্রতিফলের কথা বলা হয়েছে, এখানেও ঠিক সেই প্রতিফলের কথাই বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন ঈমানদার ব্যক্তির পুরস্কার রয়েছে তার প্রভুর কাছে এবং তার জন্যে কোনোই ভয় বা শঙ্কার কারণ নেই।

www.bjilibrary.com

অন্যান্য জায়গায় বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এরূপ ঈমান কিংবা 'ইসলাম' মানুষ কেবল নবী এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে। কারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষে শুধু নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় এবং উন্নত চরিত্র সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ মতবাদ গড়ে তোলা কিংবা ব্যক্তিগত পসন্দের সাহায্যে বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু বিষয় বেছে নিয়ে কুরআনের দৃষ্টিতে মুমিন আখ্যা লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ . . . وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ * فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ-(البقرة : ١٣٦-١٣٧)

"বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের কাছে আগত কিতাবের প্রতি আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব-সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি, আর সমস্ত নবীকে তাঁদের প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত কিতাবসমূহের প্রতি। আমরা সেই নবীদের মধ্যে কাউকে পৃথক করি না, আমরা সেই আল্লাহ্‌রই একান্ত অনুগত (মুসলিম)। তারা যদি তোমার মতই ঈমান আনে, তবে নিসন্দেহে তারা সৎপথ পেয়েছে। আর যদি তারা এমনি ঈমান থেকে বিমুখ হয়, তবে তারা একগুয়েমীর ওপর রয়েছে।"

সূরায়ে 'আলে-ইমরানে' এ বিষয়টিরই আবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ পর্যন্ত উল্লেখ করার পর স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ * -(ايات: ٨٥) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই দীন পরিত্যাগ করে অপর কোনো দীন গ্রহণ করবে, তা আদৌ গ্রহণ করা হবে না আর পরকালেও সে হবে ব্যর্থকাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

পরন্তু এ সূরায়ই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَ اَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ-(ايات : ٢٠)

www.bjilibrary.com

"ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে, তা হলে বলো যে, আমি এবং আমার অনুসারীগণ নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধীন করে দিয়েছি। অতপর আহলে কিতাব, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং অশিক্ষিত লোকদেরকে (কিতাবহীন) বলো ঃ তোমরাও কি এমনিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছো? তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে তারা নিসন্দেহে সুপথ লাভ করবে।"

এ আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় সে, আলোচ্য আয়াতে ঈমান বিল্লাহ্‌র তাৎপর্য শুধু আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়াই নয়, বরং নবীগণ এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা অনুসারে মানাই হচ্ছে ঈমান বিল্লাহ্। আর এরই নাম হচ্ছে, ইসলাম। কুরআন অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথার পুনরাবৃত্তি করছে যে, মানুষের সৎপথ লাভের জন্য নবী ও কিতাবের মধ্যস্থতা একান্ত অপরিহার্য। এমধ্যস্থতাকে অগ্রাহ্য করে কোনো মানুষই সৎপথ লাভ করতে পারে না। আর এ হিসেবে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে নবীদের প্রতিও ঈমান পোষণ না করা পর্যন্ত ঈমানদার পদবাচ্যই হতে পারে না।

انَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –(النور : ٦٢)

"মুমিন হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ্ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে।"–আন নূর ঃ ১৬২

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا *–(النساء:١٣٦)

"আর যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে, সে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে।"–আন্ নিসা ঃ ১৩৬

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا لا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا –(الطلاق : ٨–٩)

"কতো জনপদের অধিবাসীরা আপন পরোয়ারদেগার এবং তাঁর নবীদের সঙ্গে অবাধ্যাচরণ করেছে। ফলে আমরা তাদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ

www.bjilibrary.com

করেছি, তাদেরকে বড়ো বড়ো শাস্তি দিয়েছি এবং তারা আপন কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে। আর শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষতির মধ্যেই পড়ে রয়েছে।"– আত্ তালাক ঃ ৮–৯

এ ধরনের বেশুমার আয়াতের মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। এতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, ঈমান বিল্লাহ্‌র সাথে ঈমান বিল্ কিতাব ও ঈমান বির্ রসূলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কাজেই নবুয়াতকে অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পরন্তু এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান বিল্ কিতাব এবং ঈমান বির্ রসূলের অর্থ শুধু নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁদের আনীত কিতাবের প্রতি মৌখিক বিশ্বাসই নয়। ঈমানের জন্যে কেবল ব্রাহ্ম সমাজ কিংবা গান্ধীজীর ন্যায় লোকদের অনুরূপ নিছক ভক্তিমূলক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্যে বাস্তব আনুগত্য এবং অনুবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে এই সাধারণ নীতিকে স্বীকার করাও একটি অনিবার্য শর্ত যে, নবীর সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Final Authority) এবং তার প্রতিকূলে যুক্তি প্রয়োগের অধিকার কোনো মুমিনের নেই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط–(النساء : ٦٤)

"আমরা এ জন্যেই রসূল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।"–আন্ নিসা ঃ ৬৪

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج–(النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।"

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا *

(النساء : ١١٥)–

"যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট হেদায়াত লাভের পরও নবীর সঙ্গে বিতর্ক করেছে এবং মু'মিনদের পন্থা (নবীর আনুগত্য) ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে, সে যেদিকেই ফিরেছে আমরা সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট স্থান।"

www.bjilibrary.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا .

"যখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন নিজের ব্যাপারে কোনো স্বতন্ত্র ফায়সালা করার অধিকার কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করছে, সে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে।"–আল্ আহযাব ঃ ৩৬

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * –(النساء : ٦٥)

"না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিরোধে (হে নবী) তোমাকেই ফায়সালাকারী মানবে। আর তুমি যে ফায়সালা করে দেবে, সে সম্পর্কে নিজের মনের ভিতরও কোনোরূপ দ্বৈধবোধ পোষণ করবে না, বরং নির্দ্বিধায় তাকে মেনে নেবে।"–আন্ নিসা ঃ ৬৫

এ প্রসঙ্গে একথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো একজন নবী কিংবা একখানি কিতাব অথবা কতিপয় কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত নবী এবং সকল খোদায়ী কিতাবের প্রতিই ঈমান আনা প্রয়োজন। এমন কি একজন নবীকে অবিশ্বাস করলে সমস্ত নবী এবং খোদ আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গেই কুফরী করা অনিবার্য হয়ে পড়ে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا * اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج –(النساء : ١٥٠–١٥١)

"যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় (অর্থাৎ আল্লাহ্কে মানবে, কিন্তু রসূলদের মানবে না), যারা কতক রসূলকে মানবে আর কতক রসূলকে না মানার কথা বলে এবং মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারা সকলেই নিশ্চিতরূপে কাফের।"–আন্ নিসা ঃ ১৫০–১৫১

www.bjilibrary.com

এর কারণ এই যে, নবীগণ হচ্ছেন একটি অবিভাজ্য জামায়াত। তারা সকলে একই দীন—একই সত্যের আহবায়ক। সুতরাং তাঁদের একজনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার, বরং আসল দীনকে অস্বীকার করারই নামান্তর। যদি দশ ব্যক্তি একই কথা বলে, তবে হয় সকলকে বিশ্বাস করতে হবে কিংবা সবাইকে অবিশ্বাস করতে হবে। যে ব্যক্তি এর নয়জনকে সত্যবাদী আর একজনকে মিথ্যাবাদী বলবে ; সে কেবল দশজনকেই অবিশ্বাস করবে না বরং তাঁদের সর্বসম্মত কথাকেও মিথ্যা প্রমাণ করবে।

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ ... ... * وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ * -(المؤمنون : ٥١-٥٢)

"হে নবীগণ!.. তোমাদের এই জামায়াত নিশ্চিতরূপে একই জামায়াত। আর আমি তোমাদের রব, সুতরাং আমাকেই ভয় করো।" -মুমিনুন ঃ ৫১-৫২

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সেই দীনের পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যার অহী আমি (হে মুহাম্মাদ) তোমার প্রতি নাযিল করেছি আর যার আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম ; তাহলো এই যে, এ দীনকে কায়েম রাখো এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কোরো না।"-আশ্ শূরা ঃ ১৩

এই সাধারণ রীতি অনুসারেই হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআন মজীদেরও সত্যতা স্বীকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ কেউ যদি সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনে আর শুধু হযরতের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে কিংবা আল্লাহ্র সমস্ত কিতাবকে বিশ্বাস করে আর শুধু কুরআনকে করে অবিশ্বাস, তা হলে সে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নবী, সকল কিতাব, বরং প্রকৃত আল্লাহ্র ধর্মের প্রতিই অবিশ্বাসী হবে। একথা কুরআনের এক জায়গায় নয়, বেশুমার জায়গায় বিবৃত করা হয়েছে। এ কারণেই পূর্বতম নবী ও গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআন মজীদের প্রতি

www.bjilibrary.com

ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এঁর প্রতি ঈমান না আনলে কুফরীর দায়ে অভিযুক্ত হবে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا فَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ * .. .. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق ـ

"আর যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের কাছে সেই কিতাবখানি এলো, যা তাদের কাছে পূর্ব থেকে বর্তমান গ্রন্থাবলীর সত্যতা স্বীকার করে, তখন তারা কি করলো? যদিও এই কিতাবের আগমনের পূর্বে এর প্রত্যাশায় তারা কাফেরদের মুকাবিলায় বিজয় লাভের জন্যে প্রার্থনা করতো কিন্তু এর আসার সঙ্গে সঙ্গেই একে মেনে নিতে অস্বীকার করলো অথচ একে তারা ভালোমতোই চিন্‌তে পারছিলো। অতএব এই কাফেরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত.. আর যখনি তাদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ জিনিসের প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বলেছে যে, আমরা শুধু আমাদের কাছে আগত কিতাবকেই বিশ্বাস করবো। তাছাড়া অন্যান্য কিতাব মানতে তারা অস্বীকার করে।"–আল্ বাকারা ঃ ৯১

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ . . . . اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط–(ال عمران : ٣–٤)

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি এই সত্যাশ্রয়ী কিতাব অবতরণ করেছেন। এটি এর পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করেছে। নিসন্দেহে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অবিশ্বাস করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ط–(النساء : ٤٧)

www.bjilibrary.com

"হে কিতাবধারীগণ! আমরা যে কিতাব নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের কাছে বর্তমান কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করে, সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনো—আমরা যাতে লোকদের মুখাবয়বকে বিকৃত করে উল্টিয়ে না ফেলি কিংবা 'সাবত'বাদীদের মতো তাদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করে না দেই, তার পূর্বেই এরূপ করো।"–আন্ নিসা ঃ ৪৭

নিম্নোক্ত আয়াতে এর চাইতেও কঠিন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ ... اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط –(ال عمران : ١٩٩)

"কিতাবধারীদের মধ্যে এমন লোকও অবশ্যই রয়েছে, যারা আল্লাহ্, তোমার প্রতি অবতীর্ন কিতাব এবং তাদের কাছে প্রেরিত কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান এনেছে। .... এমন লোকদের জন্যেই পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে।"–আলে–ইমরানঃ ১৯৯

এই শেষোক্ত আয়াতটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা দান করছে। ওখানে বলা হয়েছিলো যে, মুসলমান, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, ছাবী—এদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে, তার পুরস্কার সে আপন রবের কাছ থেকে পাবে। আর এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে ঃ মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআনের আগমনের পর যেসব কিতাবধারী আল্লাহ্ এবং তার প্রেরিত পূর্বতন গ্রন্থাবলীর প্রতি ঈমান পোষণের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতিও ঈমান আনবে, কেবল তারাই আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে। এর চাইতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে?

এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াত থেকে এ অর্থ গ্রহণ করতে চায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে ইয়াহুদীরা খাঁটি ইয়াহুদী হওয়া এবং খৃষ্টানের প্রকৃত খৃষ্টান হওয়াই হেদায়েত ও পুরস্কার লাভ করার জন্যে যথেষ্ট, মূলত সে কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষণের বিপরীত তফসীরই করে থাকে। একথা সত্য যে, কুরআন ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুবর্তন করতে আহবান জানায়। কিন্তু এ আহবানের অর্থ কি, এটা কি সবার জানা আছে? এর

www.bjilibrary.com

অর্থ আদৌ এ নয় যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কুরআন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে পরিত্যাগ করে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুবর্তন করবে; বরং এর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর আনীত পয়গামের অনুসরণ করার জন্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অনুবর্তন করতে হবে। তাই কুরআনে স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, এখন কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-এর অনুবর্তনই হচ্ছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত অনুবর্তন।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط-(المائده : ٦٨)

"হে কিতাবধারীগণ! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আগত কিতাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হও, তোমাদের সত্যপ্রীতির দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন।"-আল-মায়েদা ঃ ৬৮

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز . . . . . اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *-(الاعراف : ١٥٧)

"যারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত এই রসূল ও 'উম্মী' নবীর অনুসরণ করে.....মূলত তারাই হচ্ছে কল্যাণ প্রাপ্ত।"-আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৭

এটা কেবল এই কারণে নয় যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল যে আল্লাহ্র শিক্ষা পেশ করেছিলো, কুরআনও সেই শিক্ষা পেশ করছে। বরং এটা এ কারণেও অপরিহার্য যে, কুরআন ঐ আল্লাহ্র শিক্ষার আধুনিকতম (Latest) এবং সর্বশেষ সংস্করণ (Last Edition)। এতে এমন বহুতরো জিনিস সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যা পূর্বেকার সংস্করণগুলোতে ছিলো না। আবার এমন বহুতরো জিনিস পরিবর্জন করা হয়েছে, যেগুলোর এখন কোনেতই প্রয়োজন নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সংস্করণের অনুসরণ করবে না, সে কেবল আল্লাহ্র অবাধ্যতার দায়েই অভিযুক্ত হবে না বরং এই সর্বশেষ ও আধুনিক সংস্করণে প্রদত্ত কল্যাণরাশি থেকেও বঞ্চিত হবে।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط -(المائده : ١٥)

www.bjilibrary.com

"হে কিতাবধারীগণ। তোমাদের কাছে আমাদের পয়গাম্বর এসেছেন ; তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের বহুতরো বিষয় স্পষ্টভাবে বাত্‌লে দেন, যা তোমরা গোপন করে থাকো। আর বহুতরো বিষয়ে তোমাদের ক্ষমাও করে থাকেন।"–আল্ মায়েদা ঃ ১৫

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط–(الاعراف : ١٥٧)

"তিনি তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেন এবং তাদের ওপর চাপানো ভারী বোঝা, বেড়ি ও শৃংখল অপসারণ করে দেন।"–আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৭

পরন্তু এটা এ জন্যেও প্রয়োজন যে, কিতাবধারীরা (ইয়াহুদী ও নাছারা) আল্লাহ্‌র পূর্বতন গ্রন্থাবলীতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি ঢুকিয়ে এবং বহুতরো জিনিসকে গোপন করে ফেলেছে। আর কোনো কোনো কিতাব তো একেবারে হারিয়েই ফেলেছে, যার ফলে এখন কুরআনের অনুবর্তন ছাড়া মূসা (আ) ও ঈসা (আ) এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুবর্তন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ج . . . . وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص –(المائده : ١٣–١٤)

"ইয়াহুদীরা শব্দের আসল অর্থকে বিকৃত করেছে। তারা তাদেরকে প্রদত্ত হেদায়াতের এক বিরাট অংশও গোপন করে ফেলেছে ..... যারা বলে যে, আমরা খৃষ্টান, তাদের কাছ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদেরকে প্রদত্ত হেদায়াতের এক বিরাট অংশ গোপন করে ফেলেছে।"–আল্ মায়েদা ঃ ১৩–১৪

এ থেকে স্পষ্টত জানা গেলো যে, যেসব জাতিকে আল্লাহ্‌র কিতাব দেয়ার কথা খোদ কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাদের জন্যেও কুরআনের অনুবর্তন ছাড়া কোনো পথ নেই। এমতাবস্থায় যাদেরকে শুধু لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ এর সাধারণ রীতি অনুসারেই কিতাবধারী বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তারা কুরআনের অনুবর্তন ছাড়া কিভাবে সৎপথ পেতে পারে?

www.bjilibrary.com

দৃশ্যত এ ধরনের কথার মধ্যে খুবই উদারতা দেখা যায় যে, ইসলাম শুধু নিজেকেই সত্যাশ্রয়ী বলে না, বরং অন্যান্য ধর্মমতকেও সাচ্চা মনে করে ; তার দাবী এ নয় যে, লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুক্তিপথ খুঁজে পাবে না, বরং সে প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্মের আসল শিক্ষাই অনুসরণ করতে বলে—কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কথা। দুটি বিন্দুর মধ্যে যেমন একটি মাত্র সরল রেখাই টানা যেতে পারে, তেমনি মানুষ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে সরলপথও (ছিরাতে মুস্তাকীম) মাত্র একটিই হতে পারে। ইসলাম যখন নিজেকেই একমাত্র সরলপথ হিসেবে দাবী করে, তখন সেই সঙ্গে অন্যান্য পথগুলোকেও ভ্রান্ত এবং কুটিল পথ আখ্যা দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কোনো পথকে সরলপথ বলা এবং তার পর অন্যান্য পথকেও সোজা পথ আখ্যা দেয়া কোনো বুদ্ধিমান লোকের কাজ হতে পারে না । একে উদার নীতি বললে তা হবে নেহায়েতই মিথ্যা উদারনীতি। এ ধরনের উদারনীতিকে ইসলাম স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। কুরআন মজীদে মুহাম্মাদ (স)–কে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে নির্দেশ করা হয়েছে ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ * –(الانعام : ١٥٣)

"এ হচ্ছে আমার সোজা পথ, সুতরাং এ পথই অনুসারণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ কোরো না, কারণ তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। এ হচ্ছে তোমার জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়াত, যাতে করে তোমরা পরহেজগার হতে পারো।"–আল্ আনআম ঃ ১৫৩

হযরত মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় এসেছিলেন গোটা মানব জাতিকে নিজের দিকে ডেকে আনতে—নিজেরই পতাকাতলে সমবেত করাতে। এ কারণে যে, নিজের সত্যাশ্রয়ী, সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় আত্ম–প্রত্যয় ছিলো। তিনি কখনো দো–মনা, দোদুল্যমান ও সন্দেহবাদী ছিলেন না। কিংবা বিভিন্ন পথের পথিকদের সঙ্গে আপোষরফা (Compromise) করার মতো তোষামুদেও (মায়াজাল্লাহ্) ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

উদারতা যতোটা সুন্দর জিনিস, তার চাইতে অনেক বেশী অসুন্দর জিনিস হচ্ছে মিথ্যা। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করতে চায় সে নিজের তরফ থেকে এ ধরনের কথা বলতে পারে ; কিন্তু কুরআনের পক্ষ থেকে এরূপ কথা বলার তার কি অধিকার রয়েছে? কুরআন তো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে, মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআনের অনুসরণ ছাড়া কোনো পথই নির্ভুল নয় ; সমগ্র মানব জাতির জন্যে এবং চিরকালের জন্যে এ পথটিই হচ্ছে একমাত্র সঠিক মুক্তিপথ ; যে ব্যক্তি এ পথ অবলম্বন না করবে, তার পরিণাম দুনিয়ায় ভ্রষ্টতা আর আখেরাতে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -(الاعراف : ١٥٨)

"বলে দাওঃ হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের সবার প্রতিই আল্লাহর রসূল।"-আল্ আ'রাফ ঃ ১৫৮

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط-(الانعام : ١٩)

"আমার প্রতি এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে করে তোমাদের এবং যাহাদের কাছে এটি পৌঁছে, তাদের সবাইকে সতর্ক করতে পারি।"

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -(السبا : ٢٨)

"হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমায় সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।"-আস্ সাবা ঃ ২৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط-(البقره : ٢٠٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হও এবং কখনো শয়তানের পথ অবলম্বন কোরো না।"-আল্ বাকারা ঃ ২০৮

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط-(النساء -١٧٠)

"হে মানব জাতি! এ নবী তোমাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে সত্য (দীন) নিয়ে এসেছেন। কাজেই (এর প্রতি) তোমরা ঈমান আনো ; এর মধ্যেই তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর যদি কুফরী করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ আসমান ও জমিনের একমাত্র মালিক।"

www.bjilibrary.com

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ *

"হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি প্রেরণ করেছি ; যারা অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী, কেবল তারাই এসব নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারে।"–আল্ বাকারা ঃ ৯৯

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ * –(البقره : ١٢١)

"আর যারা একে অস্বীকার করবে, তারাই হবে ব্যর্থকাম।"–আল্ বাকারাঃ ১২১

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط . . . . وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ * –(العنكبوت : ٤٧)

এভাবেই আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব প্রেরণ করেছি। কেবল কাফেররাই আমাদের নিদর্শনাদি মানতে অস্বীকার করতে পারে।"

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * –(النور : ٦٣)

"যারা রসূলের আদেশ–নিষেধ ও বিধি–ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তারা কোনো অশান্তি ও ফেত্নায় জড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা তাদের ওপর কোনো কঠিন আযাব নেমে আসতে পারে।"

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط

"যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ হেদায়াতকে মেনে নিয়েছে, তারাই আপন রবের তরফ থেকে সত্যাশ্রয়ী। আল্লাহ্ তাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন এবং তাদের সামগ্রিক অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। এটা এ জন্যে যে,যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা বাতিলের অনুসরণ করেছে আর যারা বিশ্বাস করেছে তারা আপন প্রভুর তরফ থেকে আগত সত্যের অনুবর্তন করেছে।"–মুহাম্মদঃ ২-৩

www.bjilibrary.com

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদের কাছে নবীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শোনান, যাতে করে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনতে পারেন।"–আত্ তালাক ঃ ১০–১১

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ . . . . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ * – (ال عمران : ٣١–٣٢)

"হে মুহাম্মাদ! বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসতে চাও তবে আমার আনুগত্য করো, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। ....আর তারা যদি এ থেকে বিরত থাকে তো আল্লাহ্ অবশ্যই কাফেরদের ভালোবাসেন না।"–আলে ইমরান ঃ ৩১–৩২

উপরোক্ত আয়াতগুলোর জোরালো আবেদন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বস্তুত, যে কালামের প্রবক্তা নিজের সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হাবার ব্যাপারে পূর্ণাংগ ও নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী এবং যিনি নিজস্ব জ্ঞান অনুসারে মানব জাতির সংস্কার সাধনের সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন, কেবল তেমন কালামেই এরূপ দৃঢ়তা থাকতে পারে। পক্ষান্তরে যারা সত্য ও সততা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী নয় অথচ দুনিয়ার প্রত্যেককেই খুশী রাখার প্রয়াসী, তেমন দুর্বল চরিত্রের লোকেরা কিভাবে এরূপ কালামের সমাদর করতে পারে! তারা বড়োজোর এ কথাই বলতে পারে যে, 'ভাইসব! তোমরা সবাই ভালো লোক এবং সবাই সত্যবাদী!'

(প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ১৯৩৮)

www.bjilibrary.com

বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে মুহাম্মাদ (স)–এর নবুয়াত

কিছুক্ষণের জন্যে আপনার চর্মচক্ষু বন্ধ করে মনশ্চক্ষুটা খুলে দিন এবং এক হাজার চারশো বছর পেছনে ফিরে দুনিয়ার অবস্থার প্রতি তাকিয়ে দেখুন। তখন এ দুনিয়াটা কি রকম ছিলো? মানুষে মানুষে চিন্তার আদান–প্রদানের উপকরণ কতো কম ছিলো! মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধি ও জানা–শোনা কতো কম ছিলো! তার চিন্তাধারা কতোখানি সঙ্কীর্ণ ছিলো! তার ধ্যান–ধারণা কুসংস্কার ও বর্বরতায় কিরূপ আচ্ছন্ন ছিলো! অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের রোশনি কতো নিষ্প্রভ ছিলো। আর সে অন্ধকার যবনিকা *ঠেলে ঠেলে* জ্ঞানের আলোক কতো ধীরগতিতে বিস্তার লাভ করছিলো। সে যুগে দুনিয়ায় ছিলো না কোনো তার–যোগাযোগ, ছিলো না কোনো টেলিফোন ও রেডিও, ছিলো না কোনো রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজ। তখন ছিলো না কোনো ছাপাখানা ও প্রকাশনালয়, ছিলো না স্কুল–কলেজ ও মাদ্রাসার প্রাচুর্য। সেকালে না পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতো, না বই–পুস্তক প্রচুর পরিমাণে লিখিত হতো। তখনকার একজন পণ্ডিত ব্যক্তির জানাশোনা কোনো কোনো দিক থেকে আজকের দিনের একজন সাধারণ লোকের তুলনায়ও ছিলো কম। সে যুগের উচ্চশ্রেণীর একব্যক্তিও এ যুগের একজন মজুর শ্রমিকের তুলনায় কম সভ্য ছিলো। তখনকার একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিও আজকের একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির চাইতে বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো। আজকে যে কথা ছোট–বড় সবারই জানা, সেকালে তা বহু বছরের পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও গবেষণার পরও জানা খুব কঠিন ছিলো। যেসব জ্ঞান–তথ্য আজ আলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং চেতনা লাভ করা মাত্র প্রতিটি শিশু পর্যন্ত যা অর্জন করতে পারে, তার জন্যে সে যুগে শত–সহস্র মাইল সফর করতে হতো। তার সন্ধানে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়া হতো। আজ যেসব বিষয়কে অন্ধত্ব ও কুসংস্কার মনে করা হয়, সেকালে তা–ই ছিলো প্রকৃত ও নিগূঢ় জ্ঞান সূত্র। যেসব ক্রিয়াকাণ্ডকে আজ অসভ্যতা ও বর্বরতা আখ্যা দেয়া হয়, সে যুগে তাই ছিলো নিত্যদিনের কাজকর্ম। যেসব রীতিনীতির প্রতি আজ মানুষের বিবেক ঘৃণায় আঁৎকে ওঠে, সেকালের নীতি–দর্শনে তা শুধু সঙ্গতই ছিলো

www.bjilibrary.com

না, বরং এর প্রতিকূল কোনো রীতিনীতি হতে পারে, এটা কেউ ধারণাও করতো না। তখন বিস্ময়কর জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিলো মাত্রাতিরিক্ত রকমের। অতি প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ না হলে কোনো জিনিসকেই তারা সত্য, মহান ও পবিত্র বলে স্বীকার করতে পারতো না। এমনকি মানুষ নিজেকে এতো অধম মনে করতো যে, কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌কে পাওয়া কিংবা আল্লাহ্‌প্রাপ্ত কোনো সত্তার পক্ষে মানুষ হওয়া তার কল্পনার কাছেও ঘেঁষতে পারতো না।

এই অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে এমন একটি দেশ ছিলো, যেখানে এই অন্ধকার ছিলো আরো বেশী সমাচ্ছন্ন। সেকালের সভ্যতা ও তামাদ্দুনের দৃষ্টিতে যেসব দেশ সুসভ্য বলে বিবেচিত হতো, তাদের মধ্যে আরব দেশ ছিলো সব চাইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। তার চারদিকে পারস্য, রোম ও মিশর দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও কৃষ্টি-সভ্যতার কিছুটা রোশনি পাওয়া যেতো বটে, কিন্তু বড়ো বড়ো বালুর সমুদ্র সেসব থেকে আরব দেশকে রেখেছিলো বিচ্ছিন্ন করে। আরব ব্যবসায়ীরা উটে চড়ে মাসের পর মাস পথ অতিক্রম করে এসব দেশে যেতো বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে এবং শুধু পণ্যদ্রব্য বিনিময় করেই স্বদেশে ফিরে আসতো। তারা জ্ঞান বিজ্ঞান ও কৃষ্টিসভ্যতার এতোটুকু আলোও নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতো না। তাদের দেশ আরবে, না কোনো স্কুল-মাদ্রাসা ছিলো, না ছিলো কোনো গ্রন্থাগার। তার অধিবাসীদের মধ্যে না ছিলো জ্ঞান শিক্ষার চর্চা, না ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতি কোনো আগ্রহ। গোটা দেশে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি কিছুটা লেখাপড়া জানতো বটে, কিন্তু তাও সেকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিতি লাভের উপযোগী ছিলো না। তাদের কাছে অবশ্য এ উচ্চাঙ্গের সমৃদ্ধ ভাষা বর্তমান ছিলো, তাতে উন্নত মানের ভাবধারা প্রকাশের মতো অসাধারণ ক্ষমতাও ছিলো এবং তার মধ্যে উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্যিক রুচিও বর্তমান ছিলো। কিন্তু তাদের সাহিত্যের যে অবশিষ্টাংশ আমরা লাভ করেছি, তা দেখে মনে হয়, তাদের জানাশোনা ও জ্ঞানের পরিধি ছিলো খুবই সীমিত। তাহযিব ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা ছিলো খুব নিম্নস্তরের। তারা অন্ধ কুসংস্কারে ছিলো আচ্ছন্ন। তাদের চিন্তাধারা ও সভাব-প্রকৃতি ছিলো অজ্ঞতা ও বর্বরতাপূর্ণ। তাদের নৈতিক ধারণা ছিলো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ।

সেদেশে কোনো সুসংবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ছিলো না। কোনো নিয়ম-শৃংখলা এবং আইন-কানুনেরও অস্তিত্ব ছিলো না। প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীই ছিলো

www.bjilibrary.com

স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত। কেবল 'জংলী আইন'ই সেখানে প্রচলিত ছিলো। কাবুতে পেলে একজন অন্যজনকে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলতো এবং তার ধনমাল দখল করে বসতো। আপন গোত্র বহির্ভূত লোককে কেন মেরে ফেলবে না এবং তার ধনমাল ছিনিয়ে নেবে না—একজন আরব বেদুইনের কাছে এটা ছিলো বুদ্ধির অগম্য।

নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের প্রচলিত ধারণা ছিলো অত্যন্ত তুচ্ছ ও অমার্জিত। পাক–নাপাক, জায়েজ–নাজায়েজ এবং ভদ্রতা–অভদ্রতার পার্থক্যের সঙ্গে তারা প্রায় অপরিচিত ছিলো। তাদের জীবন ছিলো নোংরা ও কদর্য, তাদের রীতিনীতি ছিলো বর্বরতাপূর্ণ। জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত ইত্যাদি ছিলো তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। তারা একে অপরের সামনে নিসঙ্কোচে উলঙ্গ হতে পারতো। তাদের মেয়েরা পর্যন্ত নগ্নদেহে কাবাঘর তাওয়াফ করতো। মেয়ে থাকলে কেউ জামাই হবে—এই মূর্খতাপূর্ণ ধারণার ভিত্তিতে কন্যা সন্তানকে তারা নিজ হাতেই জীবন্ত দাফন করতো। পিতার মৃত্যুর পর তারা সৎমাকে পর্যন্ত বিয়ে করতো। পানাহার, পোশাক–পরিচ্ছদ ও পাক–পবিত্রতার সাধারণ নিয়ম–কানুন পর্যন্ত তারা জানতো না।

ধর্মের ব্যাপারে তখনকার দুনিয়া যেসব অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোমরাহীতে লিপ্ত ছিলো, আরবরা ছিলো তার সবকিছুরই অংশীদার। মূর্তিপূজা, আত্মার পূজা, নক্ষত্র প .।—ফলকথা এক আল্লাহ্‌র উপাসনা ছাড়া তখনকার দুনিয়ায় যেসব পূজা–অর্চনার প্রচলন ছিলো, তা সবই ছিলো এদের মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন কালের নবীগণ এবং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কোনো নির্ভুল জ্ঞান তাদের কাছে বর্তমান ছিলো না। তারা অবশ্য জানতো যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) তাদের পূর্বপুরুষ ; কিন্তু এই পূর্বপুরুষদের ধর্মমত কি ছিলো, তাঁরা কার এবাদাত করতেন—এসব কিছুই তাদের জানা ছিলো না। আ'দ ও সামুদ জাতির কাহিনীও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো ; কিন্তু আরব ঐতিহাসিকরা তাদের যেসব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তাতে সালেহ্ ও হুদ (আ)–এর শিক্ষাদীক্ষার চিহ্নমাত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের নবীদের কাহিনীও জানতে পেরেছিলো কিন্তু সে জানাশোনাটা কি ধরনের ছিলো, তা ইসলামের ভাষ্যকারগণ কর্তৃক উল্লেখিত ইসরাইলী জনশ্রুতির ওপর দৃষ্টিপাত করলে

www.bjilibrary.com

সহজেই অনুমান করা যায়। বনী ইসরাঈল ও আরবদের জানাশোনা এ সমস্ত নবী কি ধরনের মানুষ ছিলেন এবং নবুয়াত সম্পর্কে তাঁদের ধরণা কিরূপ নিকৃষ্ট মানের ছিলো—এসব জনশ্রুতি থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এরূপ অন্ধকার যুগে, এমনি দেশেই একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলেন। বাল্যকালেই তিনি পিতামাতা ও পিতামহের স্নেহ-ছায়া থেকে বঞ্চিত হলেন। এ কারণে সেই অনুন্নত অবস্থায়ও একটি আরব বালকের পক্ষে যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিলো, তাও তিনি পেলেন না। কিছুটা বুদ্ধিজ্ঞান লাভের পর তিনি বেদুঈন ছেলেদের সঙ্গে ছাগল ও দুম্বা চরাতে শুরু করলেন। যৌবনকালে তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ওঠাবসা, মেলামেশা সবকিছুই তাঁর উপরোক্ত আরবদের মধ্যে সম্পাদিত হতে লাগলো। শিক্ষাদীক্ষার নাম পর্যন্ত তাঁকে স্পর্শ করলো না, এমনকি মামুলি লেখাপড়া পর্যন্ত তিনি করতে পারলেন না। কোনো শিক্ষিত লোকের সাহচর্য লাভেরও তিনি সুযোগ পাননি, কারণ তখনকার আরবে শিক্ষিত লোকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কয়েকবার তাঁর আরবের বাইরে যাবার সুযোগ ঘটেছিলো বটে; কিন্তু এ সফরও ছিলো সিরিয়া পর্যন্ত সীমিত। সেকালে আরবের ব্যবসায়ী কাফেলা যেরূপ সফর করতো, তাঁর এ ব্যবসায়ী সফরও ছিলো ঠিক তেমনি। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এ সফরকালে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সভ্যতার কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কিছু শিক্ষিত লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাতেরও সুয়োগ হয়েছে, তবু এ ধরনের বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ এবং সাময়িক দেখা-সাক্ষাতে কোনো মানুষেরই চরিত্র গঠিত হতে পারে না—একথা সুস্পষ্ট। তার প্রভাবে কেউ নিজের পরিবেশ থেকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, উন্নত ও নিসম্পর্ক হবার মতো চরিত্র গড়ে তুলতে পারে না। তা থেকে এতোখানি জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয়, যাতে করে একজন অশিক্ষিত বেদুঈন শুধু একটি দেশ ও কালের নয়, বরং সকল দেশ ও কালের নেতা হতে পারেন। তিনি বাইরের লোকদের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান লাভ করে থাকলেও, সেসব জ্ঞানতথ্য তখনকার দুনিয়ায় কারো কাছেই ছিলো না। ধর্ম, নৈতিকতা, কৃষ্টি ও সভ্যতার যেসব মূলনীতি দুনিয়ার কোথাও বর্তমান ছিলো না, মানবীয় চরিত্রের যে নমুনা কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিলো না, সেসব অর্জন করার কোনো উপায় কিছুতেই হতে পারতো না।

এবার শুধু আরবের নয়, গোটা দুনিয়ার পরিবেশ সামনে রেখে চিন্তা করুন। আলোচ্য ব্যক্তি যাদের মধ্যে জন্মলাভ করলেন, যাদের মধ্যে বাল্যকাল

www.bjilibrary.com

কাটালেন, যাদের সঙ্গে মিলিতভাবে যৌবন লাভ করলেন, যাদের সঙ্গে মেলামেশা ও চলাফিরা করতেন, যাদের সাথে দিনরাত কাজ-কারবার চালাতেন—জীবনের শুরু থেকেই তিনি অভ্যাস ও চরিত্রে তাদের থেকে পৃথক রইলেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি—তাঁর জাতিই তার সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেছে। তাঁর কোনো পরম দুশমনও তাঁর ওপর মিথ্যা বলার কোনো অপবাদ চাপাতে পারেনি। তিনি কারো প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহার করেননি। কেউ তাঁর মুখ থেকে গালাগাল কিংবা অশ্লীল কথা শুনতে পায়নি। তিনি লোকদের সাথে সকল প্রকার কাজ-কারবার করতেন কিন্তু কখনো কারো সঙ্গে কটু ভাষা ব্যবহার কিংবা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হননি। তার মুখে কর্কশ ভাষার পরিবর্তে হামেশা মধুর ভাষা উচ্চারিত হতো। এর ফলে তাঁর সাহচর্যে যে আসতো, অমনি মুগ্ধ হয়ে যেতো। তিনি কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। কারো অধিকার হরণ করেননি। বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা বাণিজ্য করা সত্ত্বেও কারো একটি পয়সাও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি। যাদের সঙ্গে তাঁর কাজকারবার ছিলো তারা সবাই তাঁর ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর আস্থা রাখতো। গোটা জাতি তাঁকে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে অভিহিত করতো। পরম শত্রু পর্যন্ত তাঁর কাছে নিজের মূল্যবান সম্পদ আমানত রাখতো এবং তিনি তার হেফাজত করতেন। নির্লজ্জ জনসমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন এমন লজ্জাশীল যে, জ্ঞান লাভ কারার পর থেকে কেউ তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখেনি। চরিত্রহীন পরিবেশের মধ্যে তিনি ছিলেন এমন পূতচরিত্র যে, কখনো কোনো অনৈতিক কাজে তিনি লিপ্ত হননি। কোনো দিন মদ ও জুয়া স্পর্শ করেননি। অসভ্য লোকসমাজে তিনি ছিলেন এমন সুসভ্য যে, নোংরামী ও অশিষ্টতাকে তিনি ঘৃণা করে চলতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজেই পবিত্রতা, শালীনতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠতো। নির্মম ও হৃদয়হীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে, প্রত্যেকের দুঃখ-দরদেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এতীম, বিধবা ও পথিকের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন। কাউকে তিনি কষ্ট দিতেন না, বরং অন্য লোকের জন্যে তিনি কষ্ট সইতেন। অজান্ত, পশু-প্রকৃতির লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক। আপন জাতির মধ্যে জগড়া-ফাসাদ ও রক্তপাতের প্রাবল্য দেখে তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত হতেন। বিভিন্ন গোত্রের যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে সরে থাকতেন এবং সন্ধি স্থাপনের জন্যে হামেশা চেষ্টা চালাতেন। মূর্তিপূজারী জাতির মধ্যে তিনি এমন সুস্থপ্রকৃতি ও নির্ভুল বুদ্ধির লোক ছিলেন যে, আসমান ও জমিনের

www.bjilibrary.com

মধ্যে কোনো জিনিসকেই তিনি পূজনীয় বলে মনে করতেন না। কোনো সৃষ্টির সামনেই তাঁর মাথা নত হয়নি। মূর্তির সামনে পেশকৃত উপাচারও তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। তাঁর অন্তর স্বতস্ফূর্তভাবে শির্‌ক ও সৃষ্টি পূজাকে ঘৃণা করতো।

এহেন পরিবেশে এই ব্যক্তি এমন বিশিষ্টতা অর্জন করলেন, যেনো ঘনঘোর অন্ধকারে একটি উজ্জল প্রদীপ কিংবা পাথরের স্তূপের মধ্যে একটি হীরক খণ্ড চকমক করছে।

প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত এমনি পাক–সাফ ও ভদ্র জীবনযাপনের পর হঠাৎ তাঁর জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা হলো। চারদিকে আচ্ছন্ন নিকশ অন্ধকার দেখে তিনি ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। তাঁর চারদিকে পরিবেষ্টিত মূর্খতা, অনৈতিকতা, অশালীনতা, বিশৃংখলা, শির্‌ক ও মূর্তিপূজার এই ভয়াবহ সমুদ্র থেকে তিনি উদ্ধার পেতে চাইলেন। এ পরিবেশের কোনো একটি জিনিসও তাঁর স্বভাব–প্রকৃতির অনুকূল মনে হলো না । তিনি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিসম্পর্ক হয়ে, লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে কাটাতে লাগলেন। এরূপ একাকী ও নির্জন অবস্থায় তাঁর দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতে লাগলো। ক্রমাগত রোজা পালন করে নিজের আত্মা ও মন–মগজকে তিনি আরো পরিচ্ছন্ন করতে লাগলেন। চারদিকে সমাচ্ছন্ন এ অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্যে তিনি একটি উজ্জল আলোকের সন্ধান করতে লাগলেন। এই বিকৃত ও বিপর্যস্ত দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে নতুন করে একে গড়ে তোলার জন্যে তিনি এক প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে চাইলেন।

হঠাৎ তাঁর অবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো । সহসা তাঁর অন্তরে এক অভিনব আলোকরশ্মির সঞ্চার হলো। অকস্মাৎ নিজের ভেতরে এক বিপুল শক্তি তিনি অনুভব করলেন। তিনি পর্বতগুহার নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আপন জাতির কাছে ফিরে এলেন। তাকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ তোমরা যেসব মূর্তির সামনে মাথা নত করো, সেসবের কোনোই সারবত্তা নেই—সেগুলোকে তোমরা পরিত্যাগ করো। কোনো মানুষ, কোনো বৃক্ষ, কোনো পাথর, কোনো আত্মা, কোনো নক্ষত্রের সামনেই তোমরা মাথা নত করতে পারো না—এসব তোমাদের পূজা–অর্চনা বা উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। এদের দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুবর্তনও তোমরা করতে পারো না। এ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র আর এ আসমান ও জমিনের সব জিনিস এক

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তিনিই তোমাদের এবং সবের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রিজ্‌কদাতা, মৃত্যুদাতা ও জীবনদাতা, সুতরাং তাঁরই বন্দেগী ও দাসত্ব করো। তাঁরই উপদেশ পালন করো, তাঁর সামনেই মাথা নত করো। তোমাদের এই চৌর্যবৃত্তি, লুঠ-তরাজ, হত্যাকাণ্ড, যুলুম, ব্যভিচার এসবই গোনাহ্‌র কাজ এগুলো তোমরা পরিত্যাগ করো ; আল্লাহ এসব কাজ পসন্দ করেন না। সত্যকথা বলো, সুবিচার করো। কাউকে হত্যা করো না। কারো মাল কেড়ে নিও না। যা কিছু গ্রহণ করো, সততার সাথে করো আর যা কিছু দান করো তাও সততার সাথে করো। তোমরা সবাই মানুষ, আর মানুষ হিসেবে সবাই সমান। কেউ নীচতার কলঙ্ক নিয়ে জন্মলাভ করেনি আর কেউ সম্মানের পদক নিয়েও দুনিয়ায় আসেনি। সম্মান ও সম্ভ্রম কোনো বংশীয় বা গোত্রীয় পরিচিতির মধ্যে সীমিত নয়, এ শুধু আল্লাহ্‌পরস্তি, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার মধ্যেই নিহিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সৎকাজ করে এবং পবিত্র জীবন যাপন করে, সে-ই হচ্ছে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত মানুষ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে না, তার কোনোই মর্যাদা নেই । মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে। তোমরা কোনো জিনিসই তার থেকে লুকাতে পারবে না। তোমাদের জীবনের কীর্তিগাথা তাঁর সামনে অবিকলরূপে পেশ করা হবে। সেই কীর্তিগাথা অনুসারে তিনি তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এই মহান বিচারকের সামনে কারো কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, কোনো ঘুষ দেয়ার সুযোগ থাকবে না, কারো কোনো বংশ-পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করা হবে না। সেখানে শুধু ঈমান ও সৎকাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যার কাছে এসব সামান থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার কাছে এর কিছুই থাকবে না, সে ব্যর্থকাম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এই পয়গাম নিয়েই তিনি পর্বত-গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন।

এ পয়গাম শুনে মূর্খজাতি তাঁর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তাঁকে গালাগাল করলো, পাথর ছুড়ে মারলো। একদিন-দুদিন নয়, দীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত তাঁর ওপর কঠোর যুলুম ও নির্যাতন চালালো। এমন কি, তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে দিলো। শুধু বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হলো না, তিনি যেখানে আশ্রয় নিলেন, সেখানে গিয়েও নানারূপ উৎপীড়ন চালাতে লাগলো।

www.bjilibrary.com

সমগ্র আরবকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা হলো, দীর্ঘ আট বছর তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযান চালানো হলো। তিনি এসব দুঃখ ক্লেশ ও বিপদ-মুসীবত অকাতরে সয়ে গেলেন ; কিন্তু নিজের পয়গাম থেকে একবিন্দুও বিচ্যুত হলেন না।

এ জাতি কেন তাঁর দুশমন হয়ে দাঁড়ালো? তার সঙ্গে কি তাদের ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমির বিবাদ ছিলো? তিনি কি কোনো রক্তের দাবী করেছিলেন? না, তা নয়। বরং সমস্ত দুশমনীর একমাত্র কারণ ছিলো ঃ তিনি কেনো এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্ব এবং পরহেজগারী ও সৎকর্মশীলতার শিক্ষা দেন? মূর্তিপূজা, শিরক ও দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে কেনো প্রচার করেন? পূজারী, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় নেতৃত্বের ওপর কেনো আঘাত হানেন? মোড়ল ও সর্দারদের কর্তৃত্বের ইন্দ্রজাল কেনো ছিন্ন করেন? মানুষে মানুষে উঁচু-নীচুর প্রভেদ কেনো মিটাতে চান? বংশীয় ও গোত্রীয় বিদ্বেষকে কেনো জাহেলিয়াত আখ্যা দান করেন। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে কেনো ভেঙে দিতে চান। তাই তার জাতির লোকেরা বললো ঃ তোমার এসব কথাবার্তা খান্দানী ঐতিহ্য ও জাতীয় রীতিনীতির বিরোধী, এগুলো তুমি পরিত্যাগ করো, নচেৎ তোমার জীবনই আমরা অতিষ্ট করে তুলবে।

তা হলে তিনিইবা কেনো এসব দুঃখ-কষ্ট সইলেন? জাতি তাঁকে বাদশাহী দান করতেও প্রস্তুত ছিলো। তাঁর পায়ের তলে সম্পদের স্তূপ গড়ে তুলতে তৈরী ছিলো। এ জন্যে তারা শুধু এটুকুই শর্ত আরোপ করেছিলো যে, তিনি তাঁর আদর্শ-প্রচার থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু তাদের সমস্ত প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং আদর্শ প্রচারের খাতিরে প্রস্তরাঘাত ও যুলুম-পীড়ন সইতে প্রস্তুত হলেন। কেনো তিনি এরূপ করলেন? তাদের আল্লাহ্‌পরস্ত ও সৎকর্মশীল হবার ভেতরে তাঁর কি কোনো ব্যক্তি-স্বার্থ নিহিত ছিলো? আর সে স্বর্থের খাতিরে কি রাষ্ট্রক্ষমতা, ধন-দৌলত ও আরাম-আয়েসের সমস্ত প্রলোভনই পরিত্যাজ্য ছিলো? সে স্বার্থের জন্যে কি এক ব্যক্তি কঠোরতর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন বরণ করতে এবং দীর্ঘ ২১ বছর যাবত তা অকাতরে সয়ে যেতে পারে? এটা বাস্তবিকই ভেবে দেখার বিষয়। এক ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের নয়, বরং অন্যের মঙ্গলের খাতিরেই শুধু কষ্ট ভোগ করছেন, যাদের মঙ্গলের জন্যে চেষ্টা করছেন, তারাই তার প্রতি পাথর ছুড়ে মারছে, গালাগালি করছে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, এমন কি বিদেশে

www.bjilibrary.com

গিয়েও তাঁর পেছনে ধাওয়া করছে। আর এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের মঙ্গল প্রচেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছেন—এর চাইতে উন্নত মানের আত্মত্যাগ, পরোপকার ও মানব হিতৈষণা কি কল্পনা করা চলে?

পরন্তু এটাও বিবেচ্য যে, একজন মিথ্যাবাদী কি কোনো ভিত্তিহীন কথার জন্যে এমনি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত বরদাশত করতে পারে? কোনো হাতড়ে চলা অন্ধ ব্যক্তি কি শুধু আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যে কোনো কথা বলে তার ওপর অবিচলভাবে দাঁড়াতে পারে? অথচ আলোচ্য ব্যক্তির ওপর পাহাড় সমান বিপদ-মুসীবত ভেঙ্গে পড়েছিলো, নিপীড়নের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেয়া হয়েছিলো, গোটা দেশ তার বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে উঠেছিলো, বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ; কিন্তু নিজের আদর্শ প্রচার থেকে তিনি এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। এ ধৈর্য, সংকল্প ও দৃঢ়তা থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, নিজের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় প্রত্যয় বর্তমান ছিলো। তাঁর হৃদয়ে যদি সন্দেহ ও সংশয়ের অনু-পরিমাণও চিহ্ন থাকতো, তাহলে ক্রমাগত ২১ বছর পর্যন্ত বিপদ-মুসীবতের এ উপর্যুপরি ঝড়-তুফানের মুকাবিলায় তিনি কখনো অবিচল থাকতে পারতেন না।

আলোচ্য ব্যক্তির অবস্থা পর্যালোচনার এ তো একটি দিক মাত্র। অপর দিকটি এর চাইতেও বিস্ময়কর।

চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন আরবের একজন সাধারণ অধিবাসী। এ সময়ের মধ্যে কেউ এ ব্যবসায়ী লোকটিকে একজন প্রখ্যাত বক্তা, অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে জানতো না। কেউ তাঁকে জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলতে শোনেনি। কেউ তাঁকে ধর্মতত্ত্ব, নীতি-দর্শন, আইনশাস্ত্র, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কেও আলোচনা করতে দেখেনি। কেউ তাঁর কাছ থেকে আল্লাহ্, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থ, পূর্বতন নবী-রসূল, প্রাচীনকালের জাতিসমূহ, কিয়ামত, পরকালীন জীবন, দোযখ ও বেহেশ্‌ত সম্পর্কে একটি শব্দও শুনতে পায়নি। তিনি সৎস্বভাব, মার্জিত রুচি ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন নিসন্দেহে ; কিন্তু চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনো অসাধারণ জিনিস পাওয়া যায়নি, যদ্বারা তিনি একটা কিছু হতে যাচ্ছেন, এমন আশা করা যেতো। তখন পর্যন্ত লোকেরা তাকে শুধুমাত্র একজন নির্বিকার, শান্তিপ্রিয় ও নিতান্ত ভদ্রলোক বলেই জানতো। কিন্তু চল্লিশ

www.bjilibrary.com

বছর পর যখন তিনি পর্বত গুহা থেকে এক নতুন পয়গাম নিয়ে বেরুলেন, তখন তাকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বলে মনে হলো।

এরপর তিনি এক বিস্ময়কর বাণী শোনাতে লাগলেন। সে বাণী শুনে সমগ্র আরববাসী অভিভূত হয়ে গেলো। তার প্রভাব এতোখানি তীব্রতর ছিলো যে, তাঁর ঘোর দুশমনও তা শুনতে ভয় পেতো। কারণ তা শুনলে তাদের অন্তরস্পর্শ করবে, এটাই তাদের ভয়ের হেতু ছিলো। তার ভাষাগত সৌন্দর্য, লালিত্য ও ওজস্বিতা ছিলো অনুপম, অদ্বিতীয়। সমগ্র আরব জাতি, বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মীদেরকে তা সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো এবং বারবার ঘোষণা করতে লাগলো যে, সাধ্য থাকে তো তোমরা সবাই মিলে এর মতো মাত্র একটি সূরাই তৈরী করে নিয়ে এসো। কিন্তু কেউ তার মুকাবিলা করার সাহস পেলো না। এরূপ অতুলনীয় বাঙ্ময় কখনো আরববাসী শুনতে পায়নি।

এ সময় তিনি সহসাই এক অতুলনীয় দার্শনিক, অদ্বিতীয় নৈতিক ও সমাজ সংস্কারক, বিস্ময়কর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শক্তিশালী আইনজ্ঞ, উচ্চমানের বিচারক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিফাহ্সালাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এ নিরক্ষর মরুবাসী এমন সব জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতে লাগলেন, যা এর আগেও কেউ বলেনি, পরেও কেউ বলতে পারেনি। এ উম্মী ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের জটিল সমস্যাবলী সম্পর্কে সমাধানমূলক বক্তৃতা করতে লাগলেন। মানব জাতির ইতিহাস থেকে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের দর্শন সম্পর্কে ভাষণ দিতে লাগলেন। প্রাচীনকালের সংস্কারকদের কীর্তিকলাপ পর্যালোচনা, জগতের প্রচলিত ধর্মগুলোর সমালোচনা এবং জাতিসমূহের বিরোধ বিসম্বাদের মীমাংসা করতে লাগলেন। মানুষকে নৈতিক আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তিনি সমাজিকতা, অর্থনীতি, পারস্পরিক লেনদেন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আইন তৈরী করতে লাগলেন। তিনি এমন আইন তৈরী করলেন যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও আইনজ্ঞরাও প্রচুর চিন্তা-গবেষণা ও জীবনভর অভিজ্ঞতার পরই কেবল তার যৌক্তিতা উপলব্ধি করতে পারে। আর দুনিয়ার অভিজ্ঞতা যতো বাড়ছে এর যৌক্তিকতা ততোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তিনি ছিলেন একজন নির্বিকার, শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী। সারা জীবনে কখনো তিনি তরবারী কিংবা অন্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র চালাননি। কখনো কোনো সামরিক

www.bjilibrary.com

শিক্ষা তিনি লাভ করেননি। এমন কি, সমগ্র জীবনে একবার একটি যুদ্ধে শুধুমাত্র একজন দর্শক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এহেন ব্যক্তিই দেখতে না দেখতে এক মস্তোবড়ো বীর সেনানীতে পরিণত হলেন। অতপর কোনো কঠিনতর যুদ্ধেও তিনি নিজের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্যুত হননি, শুধু তাই নয়, অচিরেই তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলে পরিণত হলেন। মাত্র ৯ বছরের মধ্যে তিনি গোটা আরব উপদ্বীপকে জয় করে নিলেন। তিনি এমন বিস্ময়কর সমর নায়কে পরিণত হলেন যে, তাঁর সংগঠিত সামরিক ভাবধারার প্রভাবে নিসম্বল আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দুনিয়ার দুটি বিরাট সামরিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিলো।

তিনি ছিলেন নির্জনবাসী, শান্তিপ্রিয় লোক। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কেউ রাজনৈতিক চেতনার কোনো সামান্য লক্ষণও দেখতে পায়নি। তিনিই সহসা এক মস্তবড়ো সমাজসংস্কারক (Refarmer) ও রাষ্ট্রনায়করূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মাত্র ২৩ বছর সময়ের মধ্যে ১২ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী মরুভূমির বিক্ষিপ্ত, যুদ্ধপ্রিয়, অশিক্ষিত, উদ্ধত, অসভ্য এবং হামেশা আত্মকলহপ্রিয় গোত্রগুলোকে তিনি এক ধর্ম, এক কৃষ্টি, এক সভ্যতা, এক আইন ও এক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন করে দিলেন। এ অপূর্ব বিপ্লব সাধনে তিনি আধুনিক কালের রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন, রেডিও-টেলিভিশন কিংবা প্রেস-পত্রিকার এতোটুকু সাহায্য পাননি।

এভাবে তিনি তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা বদলে দিলেন। তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনলেন। তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত করলেন। তাদের অভদ্রতাকে উচ্চমানের ভদ্রতায়, তাদের অসভ্যতাকে উৎকৃষ্ট ধরনের সভ্যতায়, তাদের অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতাকে কল্যাণকারিতা, তাকওয়া ও মহৎ চরিত্রে রূপান্তিরিত করে দিলেন। তাদের ঔদ্ধত্য, বিচ্ছৃংখলা ও অরাজক মনোবৃত্তিকে উচ্চমানের আইনানুবর্তিতা ও নেতৃত্বে আনুগত্যে পরিবর্তিত করলেন। আরবরা ছিলো বহুকাল থেকে বন্ধ্যা জাতি। কয়েক শতক ধরে এ জাতির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পুরুষের আবির্ভাব হয়নি। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তি এ জাতিকে এমন বীরপ্রসূ করে তুললেন যে, এরপরে এ জাতির মধ্যে হাজার হাজার মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটলো এবং তারা দুনিয়াবাসীকে ধর্ম, নৈতিকতা, কৃষ্টি ও সভ্যতার পাঠ দেবার জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

www.bjilibrary.com

পরন্তু এতোবড়ো কাজ তিনি কোনো যুলুম-পীড়ন, জবরশাসন ও প্রতারণার সাহায্যে সম্পাদন করেননি। বরং চিত্তজয়ী নৈতিক চরিত্র, হৃদয়স্পর্শী শিষ্টাচার এবং মস্তিষ্কবিজয়ী শিক্ষা ও আদর্শের বলে তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি আপন চরিত্রবলে শত্রুকে বন্ধু বানিয়েছিলেন। দয়া ও স্নেহের বলে লোকদের পাষাণ হৃদয়কে মোমের ন্যায় বিগলিত করেছিলেন। সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। সত্য ও সততা থেকে তিনি জীবনে কখনো এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। এমন কি, যুদ্ধকালেও তিনি কারো সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করেননি—কাউকে ভাওতা বা ধোঁকা দেননি। যারা তাঁর রক্তপিপাসু ছিলো, তাঁর প্রতি পাথর ছুড়েছিলো, তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, তাঁর বিরুদ্ধে গোটা আরব দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো, এমন কি শত্রুতার প্রতিহিংসায় তাঁর চাচার কলিজা পর্যন্ত চিবিয়েছিলো—তাদের ওপর বিজয় লাভ করেও তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্যে তিনি কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

এসব কিছু ছাড়াও তাঁর আত্মসংযম তথা নিস্বার্থপরতা ছিলো অভূতপূর্ব। তিনি যখন গোটা দেশের বাদশাহ্, তখনো তিনি পূর্বের মতোই ফকীর ছিলেন। তিনি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন। চটের ওপর নিদ্রা যেতেন। মোটা সোটা কাপড় পরতেন। গরীব লোকদের মতো খাবার খেতেন। কখনো কখনো অনশন, উপবাসে কাটাতেন। রাতের পর রাত জেগে আল্লাহর এবাদাত করতেন। গরীব ও বিপদগ্রস্তদের সেবায় এগিয়ে যেতেন। একজন কুলি মজুরের মতো কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর ভেতর রাজকীয় শানশওকত, আমীরানা মর্যাদাবোধ ও বড়লোকী অহঙ্কারের বিন্দুমাত্র গন্ধও সৃষ্টি হয়নি। তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাদের দুঃখ-দরদে শরীক হতেন। তিনি যখন জনসাধারণের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি যে জাতির নেতা বা দেশের বাদশাহ, একজন নতুন লোকের পক্ষে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়তো। এতো বড়ো লোক হওয়া সত্ত্বেও নগণ্য লোকদেরকেও তিনি নিজের সমান মনে করে ব্যবহার করতেন। সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়াস ও প্রচেষ্টার পর তিনি নিজের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। নিজের সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনি জাতির জন্যে ওয়াকফ করে গিয়েছেন। নিজের অনুবর্তীদের ওপর তাঁর নিজের কিংবা আপন বংশধরদের কোনো অধিকার তিনি কায়েম করেননি। এমন কি, আপন বংশধরগণকে

www.bjilibrary.com

তিনি যাকাত গ্রহণের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে গিয়েছেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁর অনুবর্তী বা তাঁর বংশধরগণকেই সমগ্র জাকাত দিয়ে বসতে পারে, তাঁর মনে এ ভয়টা জাগরুক ছিল।

এ বিরাট পুরুষের কৃতিত্বের তালিকা এখানেই শেষ নয়। তাঁর সঠিক মর্যাদা নিরূপণ করতে হলে সামগ্রিকভাবে দুনিয়ার ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার। তাহলে দেখা যাবে যে, আরব উপদ্বীপের এ নিরক্ষর মরুচারী চৌদ্দ শো বছর পূর্বেকার অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমগ্র দুনিয়ার নেতা। তাঁকে যারা নেতা মেনে নিয়েছে, তিনি কেবল তাদেরই নেতা নন, তাঁকে যারা মানে না, তাদেরও তিনি নেতা। অবশ্য তাঁর বিরোধীদের এ অনুভূতি পর্যন্ত নেই যে, যাঁর বিরুদ্ধে তারা মুখ খোলার দুসাহস করে, তাঁর নেতৃত্ব কিভাবে তাদের চিন্তাধারা, জীবনপদ্ধতি, কর্মপ্রণালী ও আধুনিক কালের ভাবধারায় মিশে গিয়েছে।

তিনিই দুনিয়ার ধ্যান-ধারণার গতিকে কুসংস্কার, অলৌকিতাপূজা ও বৈরাগ্যবাদের দিক থেকে ফিরিয়ে—যুক্তিবাদ, সত্যপ্রিয়তা ও তাকওয়াসুলভ বৈষয়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তিনিই অন্যনুভূত মুজেযা প্রার্থী দুনিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তিক মুজেযা অনুধাবন এবং তাকেই সত্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করার অভিরুচি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সন্ধানকারীদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে (Natural Phenomena) আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। যারা কল্পনার ঘোড়া ছুটাতে অভ্যস্ত, তাদেরকে তিনিই আন্দাজ-অনুমানের (Speculation) পথ থেকে ফিরিয়ে বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পথে চালিত করেছেন। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি ও বিবেকশক্তির পার্থক্য-সীমা মানুষকে বাতলে দিয়েছেন। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ধর্মের (দীন) সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে ধর্মের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। ধর্মীয় শক্তির সাহায্যে দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক ভাবধারা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা থেকে প্রকৃত ধার্মিকতার সৃষ্টি করেছেন। শিরক ও সৃষ্টিপূজার তামাম ভিত্তিকে তিনিই নির্মূল করে দিয়েছেন এবং জ্ঞানের শক্তিবলে তাওহীদ বিশ্বাসকে এমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের ধর্মও একত্ববাদের

www.bjilibrary.com

ভাবধারা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদের বুনিয়াদী ধ্যান-ধারণাকে তিনিই বদলে দিয়েছেন। যারা সংসার ত্যাগ ও আত্মপীড়নকেই প্রকৃত নৈতিকতা মনে করতো, আত্মা ও দেহের অধিকার আদায় করা এবং বৈষয়িক জীবনের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরস্পরের মুক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতো, তাদেরকে তিনিই সভ্যতা, সামাজিকতা, বৈষয়িক কাজকর্মে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ও মুক্তিলাভের পথ-নির্দেশ করেছেন। পরন্তু তিনিই মানুষকে তার প্রকৃত মূল্যমানের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। যারা ভগবান, অবতার ও খোদার পুত্র ছাড়া আর কাউকে হেদায়াতকারী বা পথ-প্রদর্শক মানতে প্রস্তুত ছিলো না, তাদেরকে তিনিই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের মতো মানুষই আসমানী বাদশাহীর প্রতিনিধি এবং বিশ্বপ্রভুর খলীফা হতে পারে। যারা প্রত্যেক শক্তিমান মানুষকেই নিজেদের খোদা বানিয়ে নিতো, তাদেরকে তিনিই বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ আসলে মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। কোনো ব্যক্তিই পবিত্রতা, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের জন্মগত অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় আসেনি। অথবা কাউকে অপবিত্রতা, ছুঁৎমার্গ, পরাধীনতা ও গোলামীর জন্মগত কালিমাও লাগিয়ে দেয়া হয়নি। বস্তুত তার এ শিক্ষার ফলেই দুনিয়ায় মানব-ঐক্য, সমানাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে।

তাছাড়া কল্পনার জগত থেকে এগিয়ে বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, দুনিয়ায় আইন-কানুন, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর এ উম্মী নবীর নেতৃত্বের অসংখ্য বাস্তব প্রভাব পড়েছে। তার শিক্ষা থেকে উদ্ভূত নৈতিক চরিত্র, কৃষ্টি-সভ্যতা, ভদ্রতা-শালীনতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অসংখ্য নিয়ম-নীতি দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। সমাজ জীবন সম্পর্কে তিনি যেসব আইন তৈরী করেছিলেন, দুনিয়ার মানুষ তার অনেক কিছু গ্রহণ করেছে এবং এখনো করছে। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রচারিত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে দুনিয়ায় বহু আন্দোলন দানাবেঁধে উঠেছে এবং এখনো উঠছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গৃহীত আদর্শের প্রভাবে দুনিয়ার রাজনৈতিক মতবাদগুলোতে অনেক বিপ্লব সাধিক হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বিচার ও আইন সম্পর্কে তাঁর পেশকৃত মূলনীতি দুনিয়ার বিচারব্যবস্থা ও আইন-দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং তার নীরব প্রভাব এখনো অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত আরবের এ উম্মী নবীই দুনিয়ায় যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক কার্যকরী সভ্যতা গড়ে তুলেছেন। নচেৎ

www.bjilibrary.com

যুদ্ধেরও কোনো সভ্যতা হতে পারে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার সাধারণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে কোনো কাজকর্ম হওয়া সম্ভবপর, তাঁর পূর্বে এ সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানতো না।

মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ বিস্ময়কর লোকটির উচ্চতম ব্যক্তিত্ব এমনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট মনে হয় যে, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে দুনিয়ার মানুষ হিরো (Heroes) হিসেবে গণ্য করে এসেছে, তাঁর মুকাবিলায় তাদেরকে একেবারেই ম্লান ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কৃতিত্ব সাধারণত মানব-জীবনের দু'একটি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমিত কয়েছে, এর বাইরে কোনো কৃতিত্ব তারা স্থাপন করতে পারেননি। এদের কেউ মতবাদ ও মতাদর্শের বাদশাহ, কিন্তু বাস্তব কর্মশক্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত। কেউ বাস্তব কর্মের প্রতি প্রতিমূর্তি, কিন্তু চিন্তা-দর্শনে নেহায়েত দুর্বল। কারো কৃতিত্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সীমিত। কেউ শুধু সামরিক প্রতিভার অধিকারী। কারো দৃষ্টি সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ দিকের ওপর এমনি গভীরভাবে নিবদ্ধ যে, অন্যান্য দিকগুলো সেখানে অনুপস্থিত। কেউ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ভুলে গিয়েছেন। আবার কেউ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন। ফলকথা, ইতিহাসের সর্বত্র শুধু একমুখী, একদেশদর্শী পুরুষই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই একমাত্র পুরুষ, যার মধ্যে সকল পূর্ণতা ও কৃতিত্বের সমন্বয় ঘটেছে, তিনি নিজেই দার্শনিক ও বিজ্ঞানী, আবার নিজেই নিজের দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াসী। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, সমরনায়ক, আইনপ্রণেতা, নীতি ও চরিত্রের শিক্ষাদাতা। আবার তিনিই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের নেতা। তাঁর দৃষ্টি মানুষের গোটা জীবনের ওপর প্রসারিত। ছোটোখাটো ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। পানাহারের নিয়ম-কানুন ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতার রীতিনীতি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে তিনি স্পষ্ট বিধান ও পথনির্দেশ দান করেছেন। তিনি নিজস্ব আদর্শ ও মতবাদ অনুসারে একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র সভ্যতার (Civilization) পত্তন করে দেখিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী দিকগুলোর মধ্যে তিনি এমন নির্ভুল ভারসাম্য (Equilibriun) স্থাপন করেছেন যে, কোথাও অসাম্য বা বাড়াবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। এরূপ ব্যাপকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো পুরুষ কি আর কোথাও দেখা যাবে?

www.bjilibrary.com

দুনিয়ার বড়ো-বড়ো সমস্ত ঐতিহাসিক পুরুষই কমবেশী তাদের পরিবেশের সৃষ্টি। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এখানেও সবার থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে পরিবেশের কোনো প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া তখনকার আরবের পরিবেশে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এরূপ একটি ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো—একথাও প্রমাণ করা যায় না। খুব টেনে-হিচড়ে বললে বড়োজোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক কার্যকারণ তখন আরব দেশে এমন একজন নেতার আবির্ভাব দাবী করছিলো, যিনি গোত্রীয় অনৈক্য নিশ্চিহ্ন করে আরবদেরকে একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে গড়ে তুলবেন এবং বিভিন্ন দেশ জয় করে তাদের আর্থিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ তিনি হবেন সমকালীন যাবতীয় আরবী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা প্রভৃতি যে কোনো সম্ভাব্য পন্থায় তিনি নিজ জাতিকে সচ্ছল করে তুলবেন এবং একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে তা রেখে যাবেন।

এছাড়া তৎকালীন আরবী ইতিহাসের অন্য কোনো দাবীই প্রমাণ করা যেতে পারে না। হেগেলের ইতিহাস-দর্শন ও মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিতেও বড়োজোর এটুক বলা চলে যে, তখনকার পরিবেশে একজাতি ও একরাষ্ট্র গঠনকারী একজন নেতারই আবির্ভাব হওয়া উচিত ছিলো কিংবা আবির্ভাব হতে পারতো। কিন্তু তবু তখনকার পরিবেশে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো, যিনি উত্তম নৈতিক শিক্ষাদাতা, মানবতার পুনর্গঠনকারী, মানব চিত্ত পরিশুদ্ধকারী এবং জাহেলী কুসংস্কার ও হিংসা-দ্বেষ চূর্ণকারী। যাঁর দৃষ্টি জাতি, বংশ ও দেশের সীমা চূর্ণ করে গোটা মানবতা পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। যিনি নিজ জাতির জন্যে নয়-বিশ্বমানবের জন্যে এক নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করেছেন। যিনি অর্থনৈতিক কাজকর্ম, পৌর রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধকে কল্পনার জগতে নয়- বাস্তবজগতে নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার এমনি ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় করে গিয়েছেন, যা সেদিনের মতো আজো তাঁর অতুলনীয় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। বস্তুত হেগেলীয় বা মার্কসীয় দর্শন কি সেসব ঘটনাবলীর কার্যকরণ ব্যাখ্যা করতে পারে? কিংবা এরূপ ব্যক্তিকে কি আরবের জাহেলী পরিবেশের সৃষ্টি বলা যেতে পারে?

www.bjilibrary.com

আলোচ্য ব্যক্তি যে কেবল পরিবেশের সৃষ্টি ছিলেন না তাই নয়, বরং তাঁর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করলে স্বতই মনে হয় যে, তিনি স্থান ও কালের সীমারেখা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি সময় ও অবস্থার বন্ধন ছিন্ন করে, শতক ও সহস্রের (Millenniums) আবরণ দীর্ণ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। তিনি প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক পরিবেশের মানুষকেই দেখতে পেয়েছেন এবং তিনি জীবনের জন্যে এমন নৈতিক ও বাস্তব পথনির্দেশ দান করেছেন, যা সকল অবস্থায় পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সাথে অনুসরণ করা যেতে পারে। যেসব ব্যক্তিকে ইতিহাস পুরাতন করে দিয়েছে এবং যাদেরকে আমরা আপন যুগের ভালো নেতা বলে প্রশংসা করি, তিনি তাদের মধ্যে নন। তিনি ছিলেন সবার থেকে পৃথক—সবচাইতে শ্রেষ্ঠ, মানবতার এক আদর্শ নেতা। তিনি ইতিহাসের গতির সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর (March) হন। তাঁকে প্রত্যেক যুগেই পূর্ববর্তী যুগের মতো আধুনিক (Modern) বলে মনে হয়।

বস্তুত লোকেরা যাদেরকে উদারতার সাথে 'ইতিহাসের স্রষ্টা' (Makers of History) বলে আখ্যা দেয়, আসলে তারা হচ্ছেন ইতিহাসের সৃষ্টি (Creatures of History)। প্রকৃতপক্ষে গোটা মানব–ইতিহাসে স্রষ্টা হচ্ছেন মাত্র এই একব্যক্তি। দুনিয়ার ইতিহাসে যে কয়জন নেতা বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন, তাদের অবস্থার ওপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই বিপ্লবের উপাদান তৈরী হচ্ছিলো এবং সে উপাদান নিজেই বিপ্লবের গতিপথ নির্ধারণ করছিলো। বিপ্লবী নেতা কেবল এটুকু কাজ করেছেন যে, একজন অভিনেতার মতো অবস্থার চাহিদাকে শক্তি দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করে দিয়েছেন। মূলত তার ক্ষেত্র ও কাজ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু ইতিহাস–স্রষ্টা ও বিপ্লব সৃষ্টিকারীদের গোটা দলে আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি একমাত্র ব্যক্তি, যার বিপ্লবের উপায়–উপাদান পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিলো না বলে তিনি নিজেই তা সৃষ্টি করেছেন। লোকদের মধ্যে বিপ্লবের ভাবধারা ও যোগ্যতার অভাব থাকায় তিনি নিজেই প্রয়োজন মতো লোক তৈরী করে নিয়েছেন। নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বকে তিনি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিজের পসন্দানুযায়ী গড়ে তুলেছেন। তাঁর শক্তি–সামর্থ ও ইচ্ছা–ক্ষমতা দ্বারা নিজেই বিপ্লবের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, নিজেই তার স্বরূপ ও ধরন নির্ণয় করেছেন এবং নিজেই নিজের ইচ্ছাক্ষমতার বলে অবস্থার গতিকে ঘুরিয়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ পথে

www.bjilibrary.com

চালিত করেছেন। এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস-স্রষ্টা এবং এহেন মর্যাদাবান বিপ্লব সৃষ্টিকারী কি আর কোথাও পাওয়া যাবে?

এবার আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের তলিয়ে চিন্তা করা দরকা। তা হলো এই যে, চৌদ্দশো বছর পূর্বেকার অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায়, আরবের ন্যায় অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের এক কোণে একজন রাখাল, সওদাগর ও নিরক্ষর মরুচারীর মধ্যে সহসা এতো জ্ঞান, এতো আলো, এতো বল, এতো প্রতিভা এবং এতো বিরাট ট্রেনিং প্রাপ্ত শক্তি সৃষ্টি হবার কারণটা কি ছিলো? বলা যেতে পারে যে, এ বই ছিলো তাঁর নিজস্ব মন ও মগজের সৃষ্টি-উৎপাদন। কিন্তু আমি বলবো ; এসব যদি তাঁর মন ও মগজের সৃষ্টিই হতো, তবে তাঁর খোদায়ীই দাবী করা উচিত ছিলো। আর তিনি যদি এরূপ দাবী করতেন, তবে যে দুনিয়া রামকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণকে ভগবান আখ্যা দিয়েছে, বুদ্ধকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, ঈসাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্‌র পুত্র মেনে নিয়েছে এবং যে দুনিয়া আগুন, পানি ও বাতাসের পূজা পর্যন্ত করতে পেরেছে, সে দুনিয়া এতোবড়ো শক্তি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিকে খোদা মানতে কখনোই অস্বীকার করতো না। কিন্তু তার পরিবর্তে আলোচ্য ব্যক্তি কি বলছেন, তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি দুনিয়ায় যেসব কীর্তি স্থাপন করেছেন, তার একটিরও কৃতিত্ব নিজের বলে দাবী করেননি ; বরং তিনি স্পষ্টত ঘোষণা করেছেন যে, আমি তোমাদের মতোই একজন নগণ্য মানুষ মাত্র। আমার নিজস্ব কিছু নেই, সবই আল্লাহ্‌র জিনিস এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আমি সব কিছু পেয়েছি। আমার প্রচারিত যে কালামের নজীর পেশ করতে গোটা মানব জাতি অক্ষম, তাও আমার নিজস্ব নয়। এ আমার মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত কিংবা নিজস্ব প্রতিভার ফল নয়। এর প্রতিটি শব্দই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমার কাছে এসেছে। এবং এর প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যেই নির্ধারিত। আমি যেসব কৃতিত্ব দেখিয়েছি, যেসব আইন-কানুন তেরী করেছি, যেসব রীতিনীতি তোমাদের শিখিয়েছি—এর কোনো একটি জিনিসও আমি নিজে রচনা করিনি। আমি নিজস্ব যোগ্যতার বলে কোনো জিনিস পেশ করতে সমর্থ নই। বরং প্রতিটি ব্যাপারেই আমি আল্লাহ্‌র পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছ থেকে যে ইঙ্গিত আসে, তা-ই আমি করি এবং তা-ই বলি।

লক্ষ্যণীয়, কী সত্যবাদিতার নিস্ময়কর নিদর্শন! বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত! মিথ্যাবাদী মানুষ বড়ো হবার আশায় অন্যের

www.bjilibrary.com

কাজের কৃতিত্ব নিজের দাবী করতেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ সে কাজের মূল উৎস খুব সহজেই সন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তি এমন কীর্তিকেও নিজের বলে দাবী করেননি, যাকে নিজের কীর্তি বললে কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারতো না। কারণ তার মূল উৎসের সন্ধান করার উপায় অন্য কারো জানা নেই। সততা ও সত্যবাদিতার এর চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে? যে ব্যক্তি অতি গোপন সূত্রে এক অতুলনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিসঙ্কোচে তার মূল সূত্রটির কথা লোকদের জানিয়ে দেয়, তাঁর চাইতে বড়ো সত্যবাদী আর কে হতে পারে। এহেন ব্যক্তিকে সত্য নবী বলে স্বীকার না করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

(প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ১৯৩৭)

www.bjilibrary.com

রসূলের আনুগত্য ও অনুবর্তন

[এই নিবন্ধটি মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ আসলাম জয়রাজপুরীর 'তালিমাতে কুরআন' (কুরআনের শিক্ষা) নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিলো।]

নবুয়াত ও তার বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'তালিমাতে কুরআনের' লেখক মহোদয় যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, আমার দৃষ্টিতে তা' নবুয়াত সম্পর্কে কুরআনের পেশকৃত ধারণার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিজ্ঞ লেখক তাঁর গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'মৌলিক আইন হচ্ছে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব।'

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط

"তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করো এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ কোরো না।"-আল্-আ'রাফ ঃ ৩

সমুদয় বিধি-ব্যবস্থা এরই আলোকে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তৈরী করা হবে।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص-(الشورى : ٣٨)

"তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে।"-আশ্ শূরা ঃ ৩৮

গ্রন্থকার এখানে মাঝখান থেকে নবীর জীবনাদর্শকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব হলো ঃ কুরআনে করীম থেকে মূলনীতি নিয়ে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়ন করবে। কিন্তু দুই দু'টি পর্যায়ের মধ্যে শিকলের কড়ার মতো আল্লাহ্ তায়ালার আরো একটি পর্যায় দিয়েছেন। সে পর্যায়টি হলোঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ - (ال عمران :٣١)

"হে মুহাম্মাদ! বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাও তো আমার অনুসরণ কোরো, (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন।"

www.bjilibrary.com

একথা নিঃসন্দেহ যে, কুরআনই হচ্ছে মৌলিক আইন। কিন্তু এ আইন আমাদের কাছে সরাসরি পাঠানো হয়নি—পাঠানো হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাধ্যমে। রসূল এই মৌলিক আইনকে নিজের এবং নিজ উম্মতের বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্র দেয়া বিচক্ষণতার সাহায্যে এই মৌলিক আইনকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণে প্রতিফলিত করার উপযোগী একটি পদ্ধতিও তিনি নিরূপণ করে দেবেন—এ জন্যেই তাঁকে মাধ্যম করা হয়েছে কাজেই কুরআনের প্রেক্ষিতে সঠিক বিধি-ব্যবস্থা হলো ঃ প্রথমে আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান, তারপর আল্লাহ্র রসূলের প্রদর্শিত পন্থা এবং সর্বশেষে এ দুয়ের আলোকে আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ইজতিহাদ।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ – (النساء : ٥٩)

"আনুগত্য করো আল্লাহ্র, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় তো আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।"

এখানে فرد وه الى الله والرسول এ বাক্যাংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শরয়ী প্রশ্নে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হলে আল্লাহ্র ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যদি, লক্ষ্যবস্তু শুধু কুরআন মজীদই হতো তো আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো (فرودہ الى الله) বলাই যথেষ্ট হতো কিন্তু তার সঙ্গে রসূলের কথাও বলা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টত এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের পর রসূলের অনুসৃত কর্মনীতিই হচ্ছে তোমাদের লক্ষ্যস্থল।

এরপর লেখক মহোদয় ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখছেনঃ

"নবীদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র বাণী পৌছিয়ে দেয়া, এর বেশী কিছু নয়।"

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ط– (المائده : ٩٩)

"নবীদের ওপর (আল্লাহ্র বাণী) পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই।"

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ *– (يس : ١٧)

www.bjilibrary.com

"আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র বাণীর স্পষ্ট প্রচার ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।" আরো সামনে এগিয়ে তিনি ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখছেনঃ

"নবুয়াতের মর্যাদা হিসেবে রসূলের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা, এর বেশী কিছু নয়।"

"اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلٰغُ ط-(الشورى : ٤٨)

"তোমার ওপর দায়িত্ব শুধু (আল্লাহ্‌র বাণী) প্রচার করা।"-আশ্ শুরা ঃ ৪৮

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - (التغابن : ١٢)

"তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তো আমাদের নবীদের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টরূপে প্রচার করা, বেশী নয়।"-আত্ তাগাবুন ঃ ১২

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ * - (الرعد : ٤٠)

"তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া আর আমার কাছ হিসেব গ্রহণ করা।"

গ্রন্থকার এখানে আয়াতের প্রসঙ্গ ও পটভূমিকে উপেক্ষা করে নবীর মর্যাদাকে এম্নিভাবে বিবৃত করেছেন, যেনো তিনি একজন পত্রবাহক কিংবা (নায়ুজুবিল্লাহ) ডাকপিওন মাত্র। কিন্তু এ বাক্যাংশগুলোকে মূল আয়াতের পটভূমির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তিনি সত্যিই বুঝতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই গোটা বক্তব্যটি নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে নয়, বরং তার প্রতি অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পৃক্ত। যারা রসূলের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলো না বরং বারবার তাঁকে অস্বীকার করছিলো, তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে যে, রসূলের কাজ হচ্ছে তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া তিনি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এখন আর তোমরা একথা বলতে পারো না যে, আমাদের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক পাঠানো হয়নি مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ এরপর আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের আর কোনো অভিযোগও রইলো না

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط-(النساء : ١٦٥)

এবার তোমরা যদি না মানো তো নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করবে-

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ * - (المائده : ١٢)

এ প্রসঙ্গে রসূলে করীমের উদ্দেশ্যেও বলা হয়েছে যে, তুমি ঐ কাফেরদের অস্বীকৃতিতে কেন নিরুৎসাহ হচ্ছো? তোমাকে তো ওদের ওপর দারোগা

www.bjilibrary.com

বানানো হয়নি। তোমার ওপর শুধু ওদেরকে সরলপথ প্রদর্শনের দায়িত্বই ন্যস্ত করা হয়েছিলো ; তা তুমি প্রদর্শন করেছো। এরপর সে পথ তারা অনুসরণ করে কিনা, এ সম্পর্কে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই তাদেরকে এপথে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসা তোমার কাজ নয়। তারা তোমার শিক্ষা ও আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুটিল পথে চলতে থাকল সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।–

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلٰغُ

(الشورى : ٤٨)–

فَذَكِّرْ ﷺ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۞ –(الغاشيه : ٢١–٢٢)

এসব কথা হচ্ছে কাফেরদের সম্পর্কে। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের জন্যে রসূলের মর্যাদা শুধু বাণী বাহকের নয় বরং রসূল তাদের জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবক। তিনি ইসলামী জীবনধারার আদর্শ নমুনা এবং মুসলমানদের বিধানকর্তা—প্রত্যেক যুগেই তাঁর শর্তহীন আনুগত্য করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক হিসেবে রসূলের কাজ হলো, আল্লাহ্‌র শিক্ষাধারা ও তাঁর বিধি–ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ) অভিভাবক হিসেবে তাঁর কাজ হলো কুরআনী শিক্ষাধারা ও বিধি–ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানদের ট্রেনিংদান করা এবং তাদের জীবনধারাকে সেই ছাঁচে ঢালাই করা (وَيُزَكِّيْهِمْ) আর আদর্শ নমুনা হিসেবে তাঁর কাজ হলো নিজেকে কুরআনী শিক্ষাদীক্ষার বাস্তব প্রতিমূর্তি করে দেখানো, এতে করে কিতাবুল্লাহ্‌র লক্ষ্য অনুসারে একজন মুসলমানের জীবন যেরূপ হওয়া উচিত, তাঁর জীবন হবে ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি। আর আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষানুসারে একজন মুসলমানের কিরূপ কথা বলা উচিত, কিভাবে তার শক্তি সামর্থ প্রয়োগ করা উচিত, কি প্রকারে তার দুনিয়ায় আচরণ করা উচিত—তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ দেখেই তা বোঝা যাবে। পরন্তু এ সত্যও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যেন যা কিছু তাঁর কথা ও কাজের বিরোধী তা আল্লাহ্‌র কিতাবের উদ্দেশ্য–বিরোধী। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –(الاحزاب : ٢١) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۞ (النجم : ٣–٤)– এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নবী হিসেবে মুসলমানদের বিধানকর্তাও। তিনি এমন বিধানকর্তা নন, যাঁর সঙ্গে মতানৈক্য করা যেতে

www.bjilibrary.com

পারে ; বরং এমনি বিধানকর্তা, যাঁর আদেশ কুরআনী আয়াতের মতোই বিনা শর্তে মেনে নেয়া অপরিহার্য فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ-(النساء : ٨٠) তিনি শুধু নিজের জীবনকালেই বিধানকর্তা নন বরং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্যে কর্তা তাঁর বিধি-বিধান সকল যুগে, সকল অবস্থায়ই মুসলমানদের জন্যে লক্ষ্যবস্তু। এ কারণে যে, ওপরে উদ্ধৃত কুরআনের কোনো আয়াতই স্থান-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

গ্রন্থকার নবুয়াতের এই পর্যায়গুলো উপলব্ধি করার ব্যাপারে তিনটি বড় রকমের ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেনঃ

(১) প্রথম ভ্রান্তি এই যে, তিনি কতিপয় আয়াতের ভ্রান্ত মর্ম নিয়ে রসূলের কাজকে শুধু প্রচার বা বাণীবাহনের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন অথচ রসূলের প্রচারকসুলভ মর্যাদা কেবল ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ না লোকেরা ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং এ মর্যাদা শুধু তাদের জন্যে, যারা রসূলের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের জন্যে রসূলের মর্যাদা শুধু প্রচারকের নয় ; বরং তিনি তাদের নেতা, শাসনকর্তা, আইনপ্রণেতা, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অনুকরণীয় আদর্শ।

(২) গ্রন্থকারের দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি প্রথম ভ্রান্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তিনি যখন রসূলকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যেই শুধু প্রচারক আখ্যা দিলেন, তখন কুরআন তাঁকে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষক, অভিভাবক ও আদর্শ বলে ঘোষণা করায় তার মর্ম নির্ধারণ করাও তার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়লো। অবশেষে রসূলের এসব মর্যাদাকে তিনি একেবারে প্রচারের মধ্যেই শামিল করে দিলেন। তারপর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রচারকের মর্যাদা ছাড়া নবী-জীবনের আর সমস্ত দিকই হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত (private) মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। তাই তিনি লিখছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

এই আয়াতের 'রসূলুল্লাহ্ যা কিছু বলতেন, তা সবই অহী ছিলো'—এ অর্থ করা যথার্থ নয়। কারণ দাবীটা ছিলো কুরআনের অহী হবার, যাকে কাফেররা অস্বীকার করতো। তাই এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তিনি যা কিছু বলেন,

www.bjilibrary.com

তা হচ্ছে অহী। কিন্তু বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও লোকদের সাথে তিনি যা কিছু বলতেন, সে সম্পর্কে অহী হবারও দাবী ছিলো না আর কাফেরদেরও তাতে কোনো আপত্তি ছিলো না।

এ ব্যাখ্যাটিকে গ্রন্থকারের অন্যান্য উক্তির সাথে মিলিয়ে পড়লেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বিশেষত, 'রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা, এর বেশী কিছু নয়', 'রসূলের আনুগত্যের মর্ম হচ্ছে, তাঁর আনীত আল্লাহর বাণীকে কার্যত পালন করা', 'আমাদের রসূল শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব অর্থাৎ কুরআনের প্রচারক ছিলেন' ইত্যাকার উক্তির সাথে মিশিয়ে পড়লে বোঝা যায়, গ্রন্থকার রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্ এবং মানুষ হিসেবে মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য করতে চান। রসূল হিসেবে হযরত কুরআনের যে শিক্ষা পেশ করেছেন এবং কুরআনের আলোকে যে বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন, গ্রন্থকারের মতে তা অবশ্য পালনযোগ্য কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর কথা ও কাজ একজন সাধারণ মানুষের মতোই। এসবও যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়েছে এবং ভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত রয়েছে, এটা গ্রন্থকারের মতে সর্বসম্মত নয়। আর এসবের মধ্যে তিনি মুসলিম জাতির জন্যে কোনো অনুকরণীয় আদর্শও খুঁজে পাননি।

কিন্তু মানুষ মুহাম্মাদ বিন্ আবদুলাহ আর প্রচারক মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে তাঁর এ পার্থক্য সৃষ্টি মোটেই কুরআন থেকে সাব্যস্ত হয় না। কুরআনে হযরতের একটি মাত্র মর্যাদাই বিবৃত হয়েছে আর তা হলো রসূল ও নবীর মর্যাদা[১] আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁকে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তখন থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজই ছিলো রসূলুল্লাহ হিসেবে। এ হিসেবেই তিনি শিক্ষক ও প্রচারক ছিলেন, অভিভাবক ও সংশোধনকারী ছিলেন, শাসক ও বিচারক ছিলেন, ইমাম ও আমীর (বিধানকর্তা) ছিলেন। এমনকি, তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও নাগরিক জীবনের সমস্ত বিষয়াদিই এ মর্যাদার আওতায় এসেছিলো। আর এ সকল দিক থেকেই তাঁর জীবন ছিলো একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের, অনুগত মুসলিম ও সাচ্চা মুমিনের জীবনাদর্শ। আর

---

১. কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, এর আগে 'আজাদীর ইসলামী সংগ্রা প্রবন্ধে আমি যা বলে এসেছি, একথা তার বিপরীত। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের ১০১ থেকে ১০৪ নং পৃষ্ঠা অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এ সন্দেহ আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এ পরকালের সাফল্য লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এ জীবনকেই আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম ও অনুকরণীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ (الاحزاب : ٢١) কুরআন মজীদের কোথাও এমনি কোনো সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, যদ্বারা হযরতের নবুয়াতের মর্যাদা, মানবিক মর্যাদা ও প্রশাসনিক মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়েছে। তাছাড়া এ পার্থক্যই বা কিভাবেই করা যায়? তিনি যখন আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন, তখন তাঁর গোটা জীবনও আল্লাহ্‌র শরীয়াতের বাস্তব প্রতিমূর্তি ও প্রতিনিধি হওয়া এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষের বিপরীত কোনো কাজ সম্পাদিত না হওয়া একান্তই অপরিহার্য ছিলো।

সূরায়ে 'নাজমের' প্রাথমিক আয়াতগুলোতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى 'তোমাদের সাথী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) পথভ্রষ্টও হননি, কুপথগামীও হননি'। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى –'তিনি যা কিছু বলেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় বলেন না।' اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى –'তাঁর কথা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ অহী ছাড়া আর কিছু নয়।' عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى –'তাঁকে প্রবল পরাক্রান্ত এক শিক্ষক শিক্ষাদান করেছেন।' গ্রন্থকার বলেছেন যে, এই আয়াতগুলোতে শুধু কুরআনের অহী হবার দাবী করা হয়েছে, যেটা কাফেররা অস্বীকার করতো। কিন্তু এ আয়াতগুলোর কোথাও আমি কুরআনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না। اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى আয়াতে هُوَ সর্বনামটি রসূলের ভাষায় প্রতিই ইঙ্গত করেছে আর وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى আয়াতে এরই উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে এমন কোনো জিনিস নেই, যার ভিত্তিতে রসূলের কথাকে শুধু কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা চলে ; বরং আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলের ভাষা বলে আখ্যায়িত করা যায়, এমন প্রতিটি কথাই অহীর মধ্যে শামিল এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হবে। কুরআনে এ কথাটি সুস্পষ্ট করে বলার উদ্দেশ্য এই যে, রসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তারা যেনো ভ্রষ্টতা, বিপথগামিতা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রসূলের নিরাপদ থাকার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে এবং রসূলের প্রতিটি কথাই যে আল্লাহ্‌র তরফ

www.bjilibrary.com

থেকে আগত, এটাও যেনো তারা জানতে পারে। নচেত রসূলের কোনো একটি কথাও প্রবৃত্তির তাড়নার ওপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত নয়—বলে যদি সন্দেহ জাগে, তা হলে তাঁর নবুয়াতের ওপর থেকেই লোকদের আস্থা চলে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

বস্তুত কাফেররা এ জিনিসটিই অস্বীকার করতো। তারা মনে করতো ঃ (নায়ুজুবিল্লাহ্‌) রসূলকে জ্বিনে পেয়েছে অথবা কেউ তাঁকে পড়িয়ে দিয়ে যায় কিংবা তিনি মনগড়া কথা বলেন। উল্লেখিত আয়াতগুলো নাযিল করে আল্লাহ্‌ তায়ালা এ ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিবাদ করেছেন এবং স্পষ্টত বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের সাথী বিপথগামীও নন, পথভ্রষ্টও নন। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না। তাঁর মুখ থেকে যা কিছু নিসৃত হয়, তা নিসন্দেহে সত্য এবং আমার তরফ থেকেই প্রেরিত। তাঁকে কোনো মানুষ, জ্বিন বা শয়তান পড়িয়ে দেয় না, তাঁকে পাঠ–দান করেন এক প্রবল পরাক্রান্ত শিক্ষক খোদ রসূলে করীমও নিজের পবিত্র জবানের প্রতি ইঙ্গিত করে একথাই বলেছেনঃ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ حَقًّا 'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! এ থেকে যা কিছু বেরোয়, সত্য কথাই বেরোয়।'

দুঃখের বিষয়, 'তালিমাতে কুরআনের' লেখক মহোদয় এই নিগূঢ় সত্যটি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'হযরত তাঁর বাড়ীর ভেতর পরিবার পরিজনের সঙ্গে কিংবা বাইরের লোকদের সাথে যে কথাবার্তা বলতেন, সে সম্পর্কে অহী হবার দাবী ছিলো না আর কাফেরদেরও এতে কোনো আপত্তি ছিলো না।' কিন্তু আমি বলবো ঃ হযরত যখন, যে অবস্থায় যা কিছু করতেন, নবী হিসেবেই করতেন। তাঁর সবকিছু ভ্রষ্টতা, বিপথগামিতাও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত ছিলো। আল্লাহ্‌ যে সুস্থ প্রকৃতি তাঁকে দান করেছিলেন, তাকওয়া পবিত্রতার যে সীমারেখা তাঁকে বাতলে দিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ সেই প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো। সে সবের মধ্যে গোটা মানবজাতির জন্যে এক পরম অনুকরণীয় আদর্শ ছিলো। সে সব কথা ও কাজের দ্বারাই আমরা কোন্‌টা জায়েজ আর নাজায়েজ, কোন্‌টা হারাম আর হালাল, কোন্‌ বিষয়ে আমরা মতপ্রকাশ ও ইজতিহাদ করার অধিকারী আর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অধিকারী নই ইত্যাকার কথা জানতে পারি। তাছাড়া কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র বিধান পালন করবো, কিভাবে পরামর্শের মাধ্যমে সামগ্রিক, সামাজিক কাজ সম্পাদন করবো এবং আমাদের

www.bjilibrary.com

ধর্মানুযায়ী গণতন্ত্রের কি অর্থ–ইত্যাদি বিষয়েও আমরা পথ–নির্দেশ পেতে পারি।

(৩) গ্রন্থকারের তৃতীয় ও সবচাইতে বড়ো ভ্রান্তি হলো তিনি রসূলের ইমারত বা কর্তৃত্বের মর্যাদাকে নবীর মর্যাদা থেকে পৃথক করে ফেলেছেন, যার স্বপক্ষে কুরআনে কোনোই প্রমাণ নেই। তিনি লিখেছেন ঃ

"রসূল হিসেবে আনুগত্য এবং আমীর বা শাসনকর্তা হিসেবে আনুগত্যের মধ্যে দু'টো পার্থক্য রয়েছে।"

(১) নবী হিসেবে রসূলের প্রতি কারো কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ ছিলো না। বরং আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই তাঁর ওপর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছিলো।

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآاُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط– (المائده : ٦٧)

কিন্তু শাসনকর্তা হিসেবে তাঁকে লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ – (ال عمران : ١٥٩)

(২) রসূল হিসেবে তাঁর আনুগত্য কিয়ামত পর্যন্ত ফরয। কারণ কুরআন হচ্ছে চিরকালের জন্যে। কিন্তু শাসনকর্তা হিসেবে তার আনুগত্য ছিলো সাময়িক।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ – (انفال : ٢٠)

তা ছাড়া কর্তৃত্বের দায়িত্বটা হামেশাই অস্থায়ী; কারণ যুগের সাথে সাথে সমাজ ও পরিবেশ পরিবর্তিত হতে থাকে, আর একথা সুস্পষ্ট যে, আজ যিনি শাসক বা আমীর হবেন, তিনি ওহোদ ও বদর যুদ্ধের অনুকরণে শুধু বর্শা ও তরবারি দ্বারাই জিহাদ করবেন না, বরং বর্তমান যুগের যুদ্ধাস্ত্রই ব্যবহার করবেন। সর্বোপরি আমীরের মুকাবিলায় সর্বদাই বিরোধও মতানৈক্যের অধিকার রয়েছে।'

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ – (النساء : ٥٩)

বস্তুত এসব কিছুই হচ্ছে কুরআনের উদ্দেশ্য না বোঝার ফল। গ্রন্থকার এটা বুঝতে পারেননি যে, রসূলে করীম লোকদের মনোনীত বা স্ব-নির্বাচিত আমীর ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নিযুক্ত আমীর, তাঁর ইমারত বা কর্তৃত্ব তাঁর নবুয়াত থেকে পৃথম ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি রসূলুল্লাহ্ হিসেবেই আমীর ছিলেন। বরং সত্য কথা এই যে, তিনি স্বাধীন আমীর নন—আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি। গ্রন্থকার এই নিগূঢ় সত্যটি বুঝতে পারেননি বলেই আমীর হিসেবে হযরতের মর্যাদাকে সাধারণ আমীরদের মর্যাদা মনে করেছেন।

তাঁর এ ধারণার স্বপক্ষে তিনি কুরআনের যেসব আয়াত দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন, সেগুলোকেও তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। একথা নিসন্দেহ যে, রসূলে করীমকে লোকদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, আপন উম্মতের জন্যে তিনি পরামর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এবং নিজের আচরণ দ্বারা সঠিক গণতন্ত্রের (Democracy) দিকে লোকদের পথনির্দেশ করবেন। এর দ্বারা তাঁর মর্যাদাকে অন্যান্য আমীরদের সমতুল্য মনে করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। কারণ অন্যান্য আমীরদের জন্যে তো এটা বিধিবদ্ধই করে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরামর্শক্রমে কাজ করবেন। وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الشورى) যদি পরামর্শের ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তা হলে তারা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন।–فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ কিন্তু রসূলে করীমকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলেও সেই সঙ্গে তাঁকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তিনি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করেই পদক্ষেপ করবেন।

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আদৌ পরামর্শ গ্রহণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না; বরং তাঁকে পরামর্শের এই নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো—তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে একটি নির্ভুল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির হুকুমতের ভিত্তি স্থাপন করা।

www.bjilibrary.com

এরপর আমীর হিসেবে হযরতের আনুগত্য শুধু তার নিজের যুগ পর্যন্তই সীমিত ছিলো—একথাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর স্বপক্ষে যে আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, তা থেকে মোটেই এ অর্থ গ্রহণ করা চলে না। গ্রন্থকার وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ থেকে মনে করেছেন, রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ যারা নিজ কানে শুনেছিলো, কেবল তাদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সূরায়ে আন্‌ফালের শুরু থেকে পড়লেই বুঝতে পারতেন যে, ওখানে উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভিন্ন। শুরুতে বলা হয়েছে ঃ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'তোমরা যদি ঈমান রাখো তো আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করো।' অতপর যারা রসূলের জিহাদী আহ্বানে মনের ভেতর ইতস্তত পোষণ করতো, তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছেঃ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে তর্ক করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর শাস্তিদানকারী।' এরপরই এরশাদ করা হয়েছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা যখন রসূলের আদেশ শোনো, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।' এ আয়াতে এবং পেছনের আয়াতগুলোতে বারবার রসূলের সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে রসূলের আনুগত্য হচ্ছে ঠিক আল্লাহ্‌রই আনুগত্য। তা ছাড়া সর্বত্র 'রসূল' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, কোথাও আমীর শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কোথাও এমন কোনো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্তমান নেই, যদ্বারা এখানে রসূল বলতে তাঁর নুবয়াত থেকে ভিন্ন কোনো আমীর বা শাসকের মর্যাদাকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে হতে পারে। পরন্তু রসূলের আদেশ থেকে মুখ ফিরাতে বারণ করা হয়েছে এবং এর জন্যে কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। এর পরে وانتم تسمعون বলার স্পষ্ট তাৎপর্য হলোঃ তোমরা আমাদের এইসব কঠোর বিধি-বিধান শুনে রসূলের আনুগত্য থেকে কখনো বিরত হয়ো না। انتم এবং تسمعون এর লক্ষ্য শুধু তখনকার উপস্থিত লোকেরাই নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারাই ঈমানের সঙ্গে কুরআন শুনবে, তাদের কাছে মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশ পৌছামাত্র তার সামনে মাথা নত করে দেয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য।

গ্রন্থকার বলেছেনঃ রসূলে করীমের ইমারতের দায়িত্ব অন্যান্য আমীরদের মতোই অস্থায়ী ব্যাপার ছিলো। কারণ আজকের দিনে আমরা বদর ও ওহোদের

www.bjilibrary.com

মতো বর্শা ও তরবারি দিয়ে লড়তে পারি না, এটাও অত্যন্ত নিস্ময়কর কথা। রসূলে করীম সে যুগে যেসব অস্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন, তা অবশ্যই একটি বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো। কিন্তু হযরত তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহে যেসব নৈতিক বিধান পালন করেছেন এবং যে বিধানগুলো পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা কোনো বিশেষ যুগের জন্যে নির্দিষ্ট নয় বরং তিনি মুসলমানদের জন্যে একটি চিরস্থায়ী যুদ্ধনীতি তৈরী করে দিয়েছেন। বস্তুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহার করা হবে কি কামান-বন্দুক—শরয়ী দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের কোনোই গুরুত্ব নেই। বরং যুদ্ধাস্ত্রটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং তদ্বারা কিভাবে রক্তপাত করা হবে—আসল গুরুত্ব হচ্ছে এই প্রশ্নের। এ ব্যাপারে হযরত তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তা চিরকালের ইসলামী জিহাদের জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম বাহিনীরই প্রধান সিপাহ্সালার।

গ্রন্থকার ইমারত ও নবুয়াতের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য উল্লেখ করেছেনঃ তা হলো এই যে, আমীর বা শাসকদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ ও মতানৈক্য করার অধিকার রয়েছে। আমি গ্রন্থকারকে জিজ্ঞেস করতে চাইঃ রসূলে করীমের ইমারতের মর্যাদা যদি অন্যান্য আমীরদের মতোই হয়, তা' হলো হযরতের সঙ্গে কোনো মুসলামানের কি মতানৈক্য করার অধিকার ছিলো? যে আমীরের সামনে চড়া আওয়াজে কথা বলার পর্যন্ত অনুমতি ছিলো না, যার সামনে শুধু উঁচু আওয়াজে কথা বলার কারণেই সারা জীবনের আমল বরবাদ হয়ে যাবার হুমকি দেয়া হয়েছিলো (হুজরাত ঃ ১) এবং যার সঙ্গে বিতর্ককারীকে দোযখে নিক্ষেপ করার ভয় দেখানো হয়েছিলো (আন্ নিসা ঃ ১৭)—সেই আমীরের সঙ্গে কি কোনো মুসলমানের বিরোধ ও মতানৈক্য করার অধিকার থাকতে পারে? যদি না থাকে তো এহেন আমীরের ইমারতের সঙ্গে সেসব আমীরের ইমারত কিভাবে তুলনীয় হতে পারে, যাদের সঙ্গে মতানৈক্য করার অধিকার মুসলমানদের দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থকার রসূলে করীমের ইমারতের মর্যাদা ও সাধারণ আমীরদের ইমারতের মর্যাদার মধ্যে আর কোনো পার্থক্য রাখেননি। এমন কি, রসূলের আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলোকেও তিনি আমীরের আনুগত্য সংক্রান্ত বিধান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি লিখছেনঃ

www.bjilibrary.com

"কুরআনের যেসব জায়গায়, আল্লাহ ও রসূল শব্দ দুটো একত্রে উল্লেখিত হয়েছে, তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইমারতকে বুঝানো হয়েছে। এই ইমারতের আইন–বিধান হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং এর প্রবর্তনকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারী। যেমন বলা হয়েছেঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج– (الانفال :١)

আর 'মালে গনীমাতের' বিধান শুধু নবুয়াতের যুগ পর্যন্তই সীমিত ছিলো না, বরং ভবিষ্যতের জন্যেও এ বিধান প্রযোজ্য এবং এর প্রতিপালন হচ্ছে খেলাফতের দায়িত্ব।"

অতপর فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ –(النساء) সম্পর্কে ১৫৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখছেনঃ

"চূড়ান্ত ক্ষমতা–ইখ্‌তিয়ার হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূল অর্থাৎ ইমারত। এই কারণে আমীর হিসেবে রসূলের যা মর্যাদা তাঁর খলিফাদের মর্যাদাও হবে তাই।"

এটা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, রসূলের আনুগত্য ও শাসনকর্তার (اولى الامر) আনুগত্যের তিনটি পর্যায় বিবৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য বলতে কুরআনের পেশকৃত বিধানের আনুগত্য, রসূলের আনুগত্য বলতে মহানবীর কথা ও কাজের অনুবর্তন এবং শাসনকর্তার (اولى الامر) আনুগত্য বলতে মুসলমানদের নির্বাচিত ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম দুটো পর্যায় সম্পর্কে কুরআনের এক জায়গায় নয়, বহুতরো স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধান সম্পর্কে কোনো টু–শব্দেরও অবকাশ নেই। মুসলমানদের কাজ শুধু আদেশ শোনা ও তার আনুগত্য করা। আল্লাহ্‌ ও রসূলের সিদ্ধান্তের পর নিজের ব্যাপারে কোনো স্বতন্ত্র ফায়সালা করার ইখতিয়ার কেনো মুসলমানকেই দেয়া হয়নি। আর তৃতীয় পর্যায়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শাসনকর্তার আনুগত্য হচ্ছে হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের অধীন; তার সঙ্গে কখনো মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এরূপ প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিধান বর্তমান থাকতে আল্লাহ্‌ ও রসূল অর্থে ইমরাতকে গ্রহণ করা এবং রসূলে করীমের ইমারতকে মুসলমানদের সাধারণ আমীরদের পর্যায়ভুক্ত করার আদৌ কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে

www.bjilibrary.com

قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ– আয়াতাংশ দ্বারা যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, তা সঙ্গত নয়। কারণ মালে গণিমাত আল্লাহ ও রসূলের জন্যে–এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে আল্লাহ ও রসূল ইসলামী সমাজের যে ব্যাবস্থাপনা কায়েম করেছেন, তার কল্যাণ সাধনেই এই মাল–সম্পদ ব্যয় করা হবে। এর দ্বারা আল্লাহ্ ও রসূল বুঝানো হয়েছে–এরূপ অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা চলে?

হাদীস সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতবাদ

হাদীস সম্পর্কে গ্রন্থকার প্রায় হাদীস–অবিশ্বাসীদের মতবাদই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখছেনঃ

"কিতাবের শিক্ষার একটি বিশেষ দিক ছিলো রসূল কর্তৃক তার বিধি–বিধান পালন করে দেখানো, যাতে করে তাঁর উম্মাত সেই আদর্শ অনুসারে আমল করতে পারে।"

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ– (الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্যে রসূলের ভেতর উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।" তাই আমাদের রসূল সমুদয় কুরআনী বিধি–বিধান অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয় আমল করে দেখিয়েছেন এবং মুসলমানরা সেই আদর্শ অনুসারেই আমল করে চলছে। জাতির কাছে এই উত্তম আদর্শ ধারাবাহিক আমলরূপে বর্তমান রয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই রসূলের পর থেকে বংশানুক্রমে সে আমল করে আসছে। এ কারণেই এটি স্থায়ী নিশ্চিত এবং দ্বীনী আমল। এর বিরোধিতা খোদ কুরআনের বিরোধিতার নামান্তর।

অন্যত্র তিনি বলছেনঃ

'দীন ইসলামে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত জিনিসের কিছুমাত্র স্থান নেই।'

গ্রন্থকারের এসব মন্তব্য এবং তাঁর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণগুলো থেকে হাদীস সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। তাঁর মোদ্দাকথা হলোঃ

(১) রসূলে করীমের মামলা–মকদ্দমা সংক্রান্ত ফায়সালাগুলো এবং জাতির আমীর ও শাসনকর্তা হিসেবে রাজনৈতিক, সামরিক, তামাদ্দুনিক ও সামাজিক ব্যাপারে প্রবর্তিত আইন–কানুনগুলো কুরআনের পেশকৃত 'রসূলের আদর্শ' থেকে বহির্ভূত। সুতরাং এক্ষণে সেগুলোর কোনোই প্রয়োজন নেই।

www.bjilibrary.com

কারণ ইমারতের দায়িত্ব হচ্ছে সাময়িক এবং যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

(২) যেসব বিষয় এবাদাত অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলোকে হযরত নিজের আমল দ্বারা কুরআনী বিধি–বিধান কার্যকরী করার পন্থা বাত্‌লে দিয়েছেন, কেবল সেসব ব্যাপারে রসূলে করীমের আমল (কথা নয়) অনুকরণীয়।

(৩) গ্রন্থকারের মতে যেসব ধারাবাহিক আমল রসূলে করীমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জারি রয়েছে এবং যা প্রত্যেক পুরুষ তার আগেকার পুরুষকে দেখে অনুসরণ করে আসছে, তা–ই হচ্ছে স্থায়ী ও নিশ্চিত। এ ছাড়া হযরতের কথাও কাজ সম্পর্কে হাদীসে আর যেসব কাহিনী ও বর্ণনা রয়েছে, তা স্থায়ী ও নিশ্চিত নয় এবং দ্বীন–ইসলামেও তার কিছুমাত্র স্থান নেই।

এর মধ্যে প্রথম দুটো বিষয় সম্পর্কে আমি চূড়ান্তভাবে বলতে পারি যে, এ দুটো কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত। রসূলে করীমের ধর্মীয় কার্যকলাপই শুধু চিরস্থায়ী ও অনুকরণীয় আর তাঁর সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয় সংক্রান্ত ফায়সালা। ও তাঁর প্রবর্তিত আইন–কানুনগুলো নিছক তাঁর যুগের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিলো। এরূপ সিদ্ধান্ত করার মতো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও কুরআনে পাওয়া যায় না। এ দুই শ্রেণীর আমলকে পৃথক করা এবং উভয়ের বিধি–বিধানকে ভিন্ন আখ্যা দেয়ার উপযোগী কোনো আয়াত যদি কুরআনে থাকে তাহলে তা পেশ করা গ্রন্থকারের কর্তব্য, আমি তো কুরআনে শুধু এই স্পষ্ট ঘোষণাই দেখতে পাচ্ছিঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا * – (الاحزاب : ٣٦)

"কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহ্ তাঁর রসূল কোনো ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র ফায়সালা করার ইখতিয়ারই থাকে না। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করবে সে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।"–আল্–আহযাব ঃ ৩৬

www.bjilibrary.com

এ আয়াতে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষত্ব নেই। মুমিন পুরুষ ও নারী বলতে নুবয়াত যুগের মুমিন নরনারী অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে না। আয়াতের امرا শব্দটি অত্যন্ত সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল প্রকার বিষয়ের ওপরই এটি পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ্ ও রসূল বলতে আল্লাহ্ ও রসূলই বুঝানো হয়েছে, 'ইমারত' মোটেই নয়। কারণ আমীর বা শাসনকর্তা মুমিনই হবে–এটাই স্বাভাবিক। পরন্তু এখানে আল্লাহ্ ও রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে ভিন্ন ফায়সালা করার ইখতিয়ার মুমিন পুরুষ ও নারীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করবে, সে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।' এর দ্বারা এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর নির্দেশক্রমে রসূলে করীম তাঁর নিজস্ব আইন–কানুন ও বিধি–বিধানের সাহায্যে ইসলামী সমাজের যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা সেই আইন–কানুন ও বিধি–বিধানের যথাযথ অনুবর্তনের ওপরই নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ্ ও রসূলের বাচনিক ও বাস্তব পথনির্দেশ পরিহার করে লোকেরা নিজস্ব ইখ্তিয়ার ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে, তবে এ ব্যবস্থাপনার কোনোই অস্তিত্ব থাকবে না, বরং এই ব্যবস্থাপনা চূর্ণ হতেই তারা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বহু দূরে সরে যাবে। বিস্ময়ের ব্যাপারে যে, যে কুরআনে এরূপ সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি নির্দেশ বর্তমান রয়েছে, সেই কুরআনেরই শিক্ষা–ধারার ব্যাখ্যাতা উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমি আমার অভিমত 'হাদীস ও কুরআন' শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তারে প্রকাশ করেছি। এ কারণে এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অবশ্য গ্রন্থকারকে আমি শুধু এ প্রশ্ন করবোঃ আজকে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে প্রচলিত নানারূপ বেদয়াত, কুসংস্কার ও অনৈসলামী রীতিনীতিকে যদি কেউ রসূলে করীমের যুগ থেকে বংশানুক্রমে আগত 'স্থায়ী, নিশ্চিত ও ধারাবাহিক আমল' বলে আখ্যায়িত করে এবং এ হিসেবে সেগুলোকে দ্বীন–ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে জ্ঞান করে, তাহলে এগুলো যে রসূলে করীমের আমল নয়, বরং পরবর্তী লোকদেরই আবিষ্কার–এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি নিশ্চিত উপায় আপনার কাছে রয়েছে? আপনি হয়তো বলবেন ঃ সেমতাবস্থায় আমরা কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো এবং তার আয়াতের দ্বারা এসব বেদয়াত ও কুসংস্কার খণ্ডন করবো। কিন্তু আমি বলবোঃ

www.bjilibrary.com

প্রথমত রসূলে করীমের কথা ও কাজ দ্বারা কুরআনী আয়াতের যে অর্থ নির্ণীত হয়, তা বর্জন করার পর আয়াতের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের ব্যাপারে একজন বেদয়াতপন্থী মানুষ এতোটা অবকাশ বের করতে পারে যে, তার বহুতরো বেদয়াত খণ্ডন করাই মুশকিল হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, আপনি কুরআনের দ্বারা তার বেদয়াত খণ্ডন করে দিলেও সেটা রসূলে করীমের জমানা থেকে 'বংশানুক্রমে আগত স্থায়ী ও ধারাবাহিক আমল' তার এ দাবীর কোনো প্রতিবাদ হবে না। আপনি আপনার মতবাদ অনুসারে এ ধারাবাহিক আমলকে অস্থায়ী বা অনিশ্চিতও বলতে পারেন না এবং এ বেদয়াত যে রসূলের জমানায় ছিলো না, বরং অমুক যুগে প্রচলিত হয়েছে, ইতিহাস দ্বারাও (যা কাহিনী বর্ণনার মতোই অনিশ্চিত হবে) আপনি এ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন না। এরপর কেবল একটি উপায়ই বাকী থাকে। তাহলো এই যে, ওগুলোকে আপনি স্থায়ই ও নিশ্চিত বিষয় বলে মেনে নেবেন, তারপর হয় ওগুলোর অনুসরণ করবেন কিংবা রসূলের আমল কুরআনী শিক্ষার বিপরীত ছিলো বলে ঘোষণা (নায়ুজুবিল্লাহ) দেবেন। জানি না, গ্রন্থকার এবং তাঁর সমমতাবলম্বী ভদ্রলোকদের কাছে এ জটিল প্রশ্নের কী মীমাংসা রয়েছে।

(প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ১৯৩৪)

www.bjilibrary.com

রসূলের ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তা

এই গ্রন্থের 'আজাদীর ইসলামী সংজ্ঞা' এবং 'রসূলের আনুগত্য ও অনুবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টোর আরবী তরজমা দামেশকের 'আল-মুসলেমুন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এরপর সিরিয়ার সুধীমণ্ডলী এ মর্মে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্রবন্ধ দু'টোতে কিছুটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়, যার নিরসন করা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু দামেশকের জনৈক ভদ্রলোক প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেনঃ

"মুহাম্মাদ (স) কি আমাদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতো মর্যাদাবান? তাঁর মধ্যেও কি লোকদের ওপর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মতো মানবিক আকাংখায় সন্ধান পাওয়া যায়? তাই যদি হয় তো নবী হিসেবে তাঁর নিষ্পাপ হওয়া এবং মানুষ হিসেবে নির্দোষ থাকার কী অর্থ হতে পারে? তিনি যখন শুধু মাত্র মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হননি, তখনকার জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায় কী ফায়দা নিহিত রয়েছে? তাঁর এ দু'টো মর্যাদা—মানবিক মর্যাদা ও নববী মর্যাদা—কি রসূল হবার পর একাকার হয়ে গিয়েছে কিংবা পৃথক পৃথক রয়েছে? এ দু'টো মর্যাদাকে কি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে? রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য করা আর মানুষ মুহাম্মাদের বিরোধিতা করার জন্যে কোনো মূলনীতি বা মাপকাঠি পাওয়া কি সম্ভব? কোনো মাপকাঠি দ্বারা কি আমরা তাঁর মানবিক কালাম—যার সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য করার অধিকার রয়েছে—ও নববী কালাম—যা আমাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানতে পারি?

নবীর ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মতানৈক্য করার ব্যাপার কোনো জিনিস কি প্রতিবন্ধক নয়? মানুষ হিসেবে মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য বাধত্যামূলক নয় বলে কি তিনি মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছিলেন? তাঁর ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে অনৈক্য প্রকাশ করার জন্যে কি তিনি লোকদের উৎসাহ প্রদান করতেন? আর এ যুক্তির ভিত্তিতেই হযরত উমর (রা) তাঁর সঙ্গে মানুষ

www.bjilibrary.com

হিসেবে মতানৈক্য করেছিলেন—এটা কি ঠিক?' নিম্নের প্রবন্ধটি এসব প্রশ্নের জবাবেই লেখা হয়েছে।

'আল-মুসলেমুন' পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আজাদীর ইসলামী সংজ্ঞা' এবং 'রসূলের আনুগত্য ও অনুবর্তন' দু'টো সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, প্রবন্ধ দু'টোতে কিছুটা বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়, যার নিরসন করা একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, নবীর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নববী মর্যাদা দু'টো পৃথক জিনিস আর ইসলাম শুধু নববী মর্যাদার আনুগত্যের দিকেই আহ্বান জানায়—ব্যক্তিগত মর্যাদার দিকে নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে নবীর এ দু'টো মর্যাদার বিভিন্নতাকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, নবীর শুধু একটি মাত্র মর্যাদাই ছিলো আর তা হলো নববী মর্যাদা। এ দু'টো বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় কি? এতদ্ভিন্ন 'আজাদীর ইসলামী সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পর্কে দামেশকের জনৈক ভদ্রলোকের কর্তিপয় প্রশ্ন 'আল-মুসলেমুনে'র ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ উভয় প্রশ্নের মধ্যেই অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক বর্তমান। তাই সংক্ষেপে একই প্রবন্ধে আমি উভয় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টির দু'টো দিক রয়েছে। একটি হলো আদর্শিক, অর্থাৎ নবীর প্রকৃত ও যথার্থ মর্যাদা কি? আর দ্বিতীয় হলো বাস্তব, অর্থাৎ নবীর কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণের ব্যাপারে আমরা কি তাঁকে পুরোপুরি এবং শুধুমাত্র নবী হিসেবে মানবো অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বকে দু' অংশে ভাগ করে শুধু তাঁর নবী অংশের আনুগত্য ও অনুবর্তন করবো আর মানবিক অংশ বর্জন করবো?

এ প্রসঙ্গে প্রথম আদর্শিক দিকটিই নেয়া যাক। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবীদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নববী মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাবার জন্যে নয়, বরং আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ বানাবার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন।

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ – (ال عمرن : ٧٩)

–"আল্লাহ কাউকে কিতাব, বিচার-শক্তি ও নবুয়াত দান করবেন আর সে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজের বান্দাহ হতে বলবে—এটা কোনো

www.bjilibrary.com

মানুষের কাজ নয়। সে তো লোকদের খাঁটি রব্বানী হতে বলবে" (আলে-ইমরানঃ ৭৯)। নবীদের ওপর একসঙ্গে দুটো দায়িত্ব আরোপিত হতো। প্রথমত, লোকদেরকে তামাম গায়রুল্লাহ্‌র গোলামী থেকে মুক্তি করা এর মধ্যে অন্য সব মানুষের সঙ্গে তাঁরা নিজেরাও সামিল ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাদেরকে শুধু এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্বের অধীন করা।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج

"আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়েছি (এ পয়গাম সহ) যে, আল্লাহ্‌র এবাদাত করো এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তি (তাগুত) থেকে দূরে থাকো।"-আন্ নাহল ঃ ৩৬

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط- (ال عمران : ٦٤)

"হে নবী, বলে দাওঃ হে কিতাবধারী! এমন একটি বাণীর দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না, তাঁর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের নিজেদের মধ্যেও কেউ কাউকে প্রভু গ্রহণ করবো না।"-আলে-ইমরান ঃ ৬৪

অবশ্য দ্বীনী ব্যাপারে নবীদের শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকার বা মর্যাদার ভিত্তিতে নয় বরং রসূলের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কাছে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থা প্রেরণ করেন বলেই এ নির্দেশ। এ কারণেই রসূলের আনুগত্যকে ঠিক আল্লাহ্‌র আনুগত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط- (النساء : ٦٤)

"আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য করার জন্যেই পাঠিয়েছি।"-আন্ নিসা ঃ ৬৪

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ - (النساء : ٨٠)

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, মূলত সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।"

সেই সঙ্গে এ বিষয়টিও কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রসূলে করীম যে কথাটি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নয়, বরং নিজের ইচ্ছানুযায়ী বলেছেন, আল্লাহ্‌র আদেশের মতো তার শর্তহীন আনুগত্যের দাবী তিনি কখনো করেননি। 'আজাদীর ইসলামী সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে এর বহুতরো দৃষ্টান্ত আমি পেশ করেছি। বিশেষত, রসূলের বারণ সত্ত্বেও হযরত জায়েদ কর্তৃক সাইয়েদা জয়নাব (রা)-কে তালাক দান এবং আল্লাহ্ ও রসূল কর্তৃক তাঁর সমালোচনা না করার ব্যাপারটি এর উজ্জ্বল প্রমাণ। উপরিউক্ত প্রবন্ধে আমি এ ঘটনার যে কারণ বিশ্লেষণ করেছি তা ছাড়া এর আর কোনো কারণই বিশ্লেষণ করা যায় না। আর খেজুর উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো খোদ্ নবী করীমই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِّنْ رَأْيِى فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ-اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُوْنِىْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهٖ فَاِنِّى لَمْ اَكْذِبْ عَلَى اللّٰهِ-اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ - (صحيح مسلم ، كتَابُ الْفَضَائِلِ، بَابُ وُجُوْبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَاذَكَرَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّعَايِشِ الدُّنْيَا عَلٰى سَبِيْلِ الرَّأْىِ)

"আমিও একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন তোমাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে কোনো আদেশ দেই, তা পালন করো আর যখন নিজের ইচ্ছা থেকে কিছু বলি, তখন আমিও একজন মানুষ বৈ কিছু নই।—আমি আন্দাজে একটি কথা বলেছিলাম; তোমরা আমার ধারণা-অনুমান ভিত্তিক কথা গ্রহণ কোরোনা। অবশ্য আমি যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিছু বলি, তা' গ্রহণ করো; কারণ আমি যখন আল্লাহ্‌র প্রতি কখনো মিথ্যা আরোপ করিনা। নেহাত দুনিয়াবী ব্যাপারে তোমাদেরই জ্ঞান বেশি।"

এ হলো আদর্শিক ও নীতিগত পার্থক্য। এবার এর বাস্তব দিকটা নেয়া যাক। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিনিধি বানিয়ে

www.bjilibrary.com

মানুষের মধ্যে প্রেরণ করাই ছিলো একটি নাজুক ও জটিল ব্যাপার। তদুপরি তাঁর ওপর দু'টো পরস্পর বিরোধী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো ঃ একদিকে নিজের ব্যক্তিত্ব সহ গোটা সৃষ্টির বন্দেগী ও গোলামী থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে এই মুক্তি ও আজাদীর ট্রেনিং দান করা, অপরদিকে তাদেরই কাছ থেকে এক আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ ও শর্তহীন আনুগত্য গ্রহণ করা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে নবী হিসেবে নিজেকেই এ আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। এ দু'টো বিপরীতধর্মী কাজ যুগপৎ একই ব্যক্তিকে করতে হয়েছিলো। আর এদের সীমারেখা পরস্পরে এমনি সম্পৃক্ত ছিলো যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কারো পক্ষেই এদের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা সম্ভবপর ছিলো না।

পরন্তু তিনটি বিষয় সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে এ জিনিসটির নাজুকতা ও জটিলতা আরো বেড়ে যায়।

প্রথমত, নবী করীম যখন আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে নিজের আনুগত্য গ্রহণ করতেন, তখন স্পষ্টত তিনি নবুয়াতের কাজই আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর নিতান্ত অনুগত অনুসারীদেরকেও নিজের মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত করে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে ট্রেনিং দান করতেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিমতের মুকাবিলায় তাদেরকে ভিন্ন মত প্রকাশে উৎসাহ দিয়ে গোটা মানব জাতির সামনে স্বাধীন চিন্তার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন, নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নববী মর্যাদার মধ্যে নিজেই এক পার্থক্য রেখা টেনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লোকেরা স্বাধীন আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য ভিন্ন গত্যন্তর নেই তা বাত্‌লে দিতেন, মূলত তখনো তিনি নবুয়াতের কাজই সম্পাদন করতেন। এখানে এসেই তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নবী মর্যাদার পার্থক্য উপলব্ধি করা এবং কার্যত এই দুটো মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে এ দুটো মর্যাদাকে পরস্পর এমনি সম্পৃক্ত মনে হয় যে, এদের মধ্যে শুধু আদর্শিক পার্থক্যটাই থেকে যায়, নচেত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করার সময়ও তাঁকে নবুয়াতের কাজই করতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, যে কাজগুলো দশ্যত নেহায়েতই ব্যক্তিগত কাজ, যেমন পানাহার করা, কাপড় পরিধান করা, বিবাহ করা, স্ত্রী পরিজনসহ বসবাস করা, সাংসারিক কাজ করা, অযু-গোসল ও পায়খানা পেশাব করা ইত্যাদি—

www.bjilibrary.com

নবী করীমের বেলায় সেগুলো শুধু ব্যক্তিগত কাজই নয়, বরং এসবের মধ্যে শরয়ী সীমারেখা, রীতিনীতি, শিষ্টাচার ও ধ্যান-ধারণ শামিল রয়েছে। কাজেই এর কোথায় এসে নববী মর্যাদা শেষ হয়ে যায় এবং মানবিক মর্যাদা শুরু হয়, তার ফায়সালা করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

তৃতীয়ত কুরআন মজীদ আমাদের বলছে যে, নবীর ব্যক্তি সত্তা সামগ্রিকভাবেই একটি উত্তম আদর্শ এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগই হচ্ছে হেদায়াতের আলোক-বর্তিকা। আর এ জন্যেই তাঁর কোনো কথা বা কাজে বিন্দু-পরিমাণ ভ্রষ্টতা, স্বার্থপরতা বা প্রবৃত্তির তাড়নার প্রভাব নেই।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- (الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا *- (الاحزاب : ٤٥-٤٦)

"হে নবী! আমরা তোমায় (লোকদের জন্যে) সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী একটি উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি।"-আল্-আহযাব ঃ ৪৫-৪৬

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى * اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى *- (النجم : ٢ - ٤)

"তোমাদের সাথী [অর্থাৎ মুহাম্মদ (স)] বিপথগামী এবং পথভ্রষ্টও নয়। তিনি যা কিছু বলেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় বলেন না। তাঁর কথা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ অহী ছাড়া আর কিছু নয়।"-আন্ নাহল ঃ ২-৪

এসব কারণেই আমাদের নিজেদের পক্ষে নবীর ব্যক্তি সত্তা ও নবী সত্তার মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজে-নিজেই তার সীমা রেখা নির্ধারণ করা কার্যত সম্ভবও নয়, আর শরয়ী দিক থেকে আমরা এর অধিকারীও নই। অনুরূপভাবে তাঁর অমুক অমুক কাজ ছিলো নববী কাজ, এগুলোতে আমরা তাঁর আনুগত্য করবো আর বাকীগুলো ছিলো ব্যক্তিগত কাজ, সেগুলোতে তাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তনে আমরা স্বাধীন—এ ধরনের সিদ্ধান্ত করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর

www.bjilibrary.com

নয়। এ পার্থক্যটা কেবল রসূলে করীমের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা কিংবা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা থেকে গৃহীত শরয়ী মূলনীতির আলোকেই জানা যেতে পারে।

নবী করীমের সময় সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশের পূর্বে মহা নবীর কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশ–ভিত্তিক, না তাঁর ব্যক্তিগত মত–নির্ভর, এটা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন। যখন জানা যেতো যে, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত–নির্ভর, তখনই তারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেন। তাই বদর যুদ্ধকালে হযরত হাব্‌বাব ইবনুল মানজার নিজের মত প্রকাশের আগে রসূলের কাছে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এই স্থানটি কি অহীর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে যে, এর থেকে সামনে এগোনো কিংবা পিছু হটা আমাদের জন্যে জায়েজ নয় কিংবা নিছক একটি যুদ্ধকৌশল হিসেবেই এটি মনোনীত করা হয়েছে?' অনুরূপভাবে খন্দক যুদ্ধকালে হযরত সায়াদ বিন্ মায়াজ গাত্‌ফান গোত্রের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ সিদ্ধান্ত কি অহীর ভিত্তিতে করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলার অধিকার নেই কিংবা আপনি শুধু নিজের ইচ্ছা থেকে এরূপ করতে চান?' এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কখনো কখনো খোদ নবী করীমই প্রকাশ করতেন যে, অমুক কথা তিনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো দ্বীনী আদেশ হিসেবে বলছেন না, বরং নিজের ব্যক্তিগত মতই ব্যক্ত করছেন মাত্র। পূর্বোক্ত খেজুর উৎপাদন সংক্রান্ত হাদীসটি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আবার কখনো কখনো বিষয়টির ধরন থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, হযরত নবী হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেই কথা বলছেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরত জায়েদ (রা)–কে তিনি বলেনঃ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ 'নিজের স্ত্রীকে তালাক দিও না আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো।' এ আদেশ সম্পর্কে এটা সুস্পষ্ট ছিলো যে, এটি একজন মুমিনের প্রতি নবীর কোনো শরয়ী আদেশ নয়, বরং একটি পরিবারের সদস্যের প্রতি পরিবার–প্রধানের উপদেশ মাত্র। এ কারণেই হযরত জায়েদ মহানবীর কথা সত্ত্বেও হযরত জয়নাবকে তালাক দান করেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত জায়েদ (রাঃ) রসূলের আদেশের ধরনটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

www.bjilibrary.com

এসব ঘটনা তো হযরতের জীবনকালেই ঘটেছিলো। এ ছাড়া আরো বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে এখনো শরয়ী মূলনীতির আলোকে এ পার্থক্যটা বোঝা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হযরতের পোশাক ও খাদ্যের প্রসঙ্গটি নেয়া যাক। এর একটা দিক ছিলো এই যে, তখনকার আরবদের প্রচলন অনুসারে তিনি এক বিশেষ ধরন ও গড়নের পোশাক পরতেন এবং এর নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগত রুচিরও প্রভাব ছিলো। অনুরূপভাবে তখনকার আরবে যে খাদ্য প্রচলিত ছিলো তাই তিনি গ্রহণ করতেন এবং এর নির্বাচনেও তাঁর ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব অবশ্যই ছিলো। দ্বিতীয় দিক ছিলো এই যে, সেই খাদ্য ও পোশাকের মাধ্যমেই তিনি নিজের কথা ও কাজ দ্বারা শরীয়াতের সীমারেখা এবং ইসলামী রীতিনীতি ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিতেন। এখন খোদ হযরতেরই শেখানো শরয়ী মূলনীতি থেকে এটা জানা যায় যে, এর প্রথম জিনিসটি তাঁর ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো আর দ্বিতীয় জিনিসিটি ছিলো। নববী সত্তার সঙ্গে। এ কারণেই মানুষ কী ধরন-গড়ন ও কাটিং-এর পোশাক তৈরী করবে এবং কিভাবে তার খাদ্যবস্তু রান্না করবে, জীবনের এ আটপৌরে দিকটাকে শরীয়াত—যার শিক্ষা দেবার জন্যে হযরত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন—তার চৌহদ্দীর মধ্যে গ্রহণ করেননি। অবশ্য খাদ্য ও পোশাকের ব্যাপারে হারাম-হালাল ও জয়েজ-নাজায়েজের সীমা নির্ণয় করা এবং লোকদের মুমিন সুলভ চরিত্র ও সভ্যতার উপযোগী রীতিনীতি ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়াকে শরীয়াত আপন কর্মসীমার মধ্যে গ্রহণ করেছে।

এ পার্থক্যটা আমরা হযরতের ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারি কিংবা তাঁর শেখানো শরয়ী মূলনীতি থেকে—নবীর দেয়া শিক্ষাই হচ্ছে এর জ্ঞানসূত্র। কাজেই তাঁর ব্যক্তিগত কাজগুলো নির্ণয় করার জন্যেও আমাদেরকে তাঁর নববী সত্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাঁর নববী সত্তাকে পরিহার করে নিছক ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ জিনিসটি সম্পর্কেই আমি 'রসূলের আনুগত্য ও অনুবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুন্নাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি। তাদের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে, তাঁরা রসূল মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ আর মানুষ মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে নিজেরাই পার্থক্য করে এ দুই মর্যাদার কাজের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্য রেখা টেনে দিয়েছে। এবং তাঁর জীবনের যে অংশটিকে তারা তাঁর নববী সত্তা থেকে পৃথক মনে করে বসেছে, তার আনুগত্য ও অনুবর্তন থেকে নিজেরাই স্বাধীনতা গ্রহণ করেছে। অথচ হযরতের ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তার মধ্যে

www.bjilibrary.com

প্রকৃত সত্যের দৃষ্টিতে যে পার্থক্য রয়েছে, তা আল্লাহ্ ও রসূলের কাজেই রয়েছে। আমরা যাতে আকীদার ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্কেই আনুগত্যের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু মনে করে না বসি, আমাদেরকে শুধু এ জন্যেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু উম্মাতের জন্যে তাঁর একটি মাত্রই মর্যাদা আর তা হলো রসূল হওয়ার মর্যাদা। এমন কি, মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্র মুকাবিলায় আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্র দানের ফলেই পেয়েছি আর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহই তাঁর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন পরন্তু সে স্বাধীনতা প্রয়োগ করার শিক্ষাও আমাদের মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ই দিয়েছেন।

এ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর আমার উভয় প্রবন্ধ মিলিয়ে পড়লে আর কোনো ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকতে পারে না।

(প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৫৯)

www.bjilibrary.com

নবুয়াত ও তার বিধিবিধান

আমার লিখিত 'রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখে বন্ধুবর গোলাম আহমদ পারভেজ এক সুদীর্ঘ পত্রে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ

".....কিন্তু وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। আপনি লিখেছেনঃ 'যখন থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নুবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, তখন থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সকল সময় ও সকল অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র রসূল ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজই ছিলো রসূলুল্লাহ্র কথা ও কাজ।'

আবার অন্যত্র লিখেছেনঃ

'হযরত যখন যে অবস্থায় যা কিছু করতেন রসূল হিসেবেই করতেন।' একথা সত্য যে, হযরতের প্রতিটি কথা ও কাজই হতো আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর রসূল হিসেবে তা সম্পন্ন হবার ফলে মুসলিম জাতির পক্ষে তাঁর আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য।

এ সম্পর্কে আমি এখানে শুধু দু'একটি ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হবো। প্রথমত কুরআন মজীদের কথাই ধরা যাক। এর ভেতর এমন অনেক বিষয়ই আপনি পাবেন, যাতে হযরতকে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে সংশোধন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক ধরনের মধু খাওয়া সম্পর্কে তিনি শপথ গ্রহণ করলে এরশাদ করা হয়ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج– (تحريم : ١)

হে নবী! আল্লাহ্ যে জিনিসকে তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তাকে তুমি কেন হারাম করো?'

একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত কর্তৃক মধু পানকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়া যদি আল্লাহ্র তরফ থেকেই হতো, তাহলে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে কেন আপত্তি তুলবেন?'

অন্যত্রঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ – (توبه : ٤٣)

www.bjilibrary.com

'হে নবী! আল্লাহ্‌র তোমায় মাফ করুন। তুমি কেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলে?'

এখানে হযরতের অনুমতি দান যদি অহী মুতাবেক হতো এবং এ কাজটি আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবেই করা হতো, তাহলে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

অনুরূপভাবে عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى – (عبس) আয়াতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি হযরতের কপাল-কুঞ্চনটা রসূল হিসেবেই হতো, তাহলে কুরআনে করীমে এ সম্পর্কে কেন সতর্কবাণী এসেছে?

এসব ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরতের একথা ও কাজগুলো রসূল হিসেবে ছিলো না, ছিলো ব্যক্তিগত। এর অর্থ এই নয় যে, (নায়ুজুবিল্লাহ্) এ কাজগুলোর পেছনে ভ্রষ্টতা, স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তির তাড়না ক্রিয়াশীল ছিলো। বরং দুনিয়াবী বিষয়ে মানুষ হিসেবে তাঁর ভিতরেও মানবিক প্রকৃতি বর্তমান ছিলো, তাতে এ ধরনের মামুলি ভুলের কোনো অর্থই হয় না। এর ভেতরেই হযরতের মহত্তম চরিত্র এবং কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী, এ সম্পর্কে ইসলাম-বিরোধীদের জন্যে জীবন্ত সাক্ষ্য রয়েছে। এভাবে হাদীস থেকেও একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায় লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেনঃ হযরতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং হাদীস-গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত বিষয়গুলো দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হলো নবুয়াতের শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় আর দ্বিতীয়টি হলো নবুয়াতের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়। এটি সম্পর্কে খোদ হযরত বলেছেনঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَّأْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ –

'আমি একজন মানুষ মাত্র। তোমাদেরকে যখন দীনী বিষয়ে আদেশ দেই তা গ্রহণ করো, আর যখন নিজের ইচ্ছা থেকে বলি, তখন আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নই।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে খেজুর গাছের কেশর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘটনার পর হযরত বলেছেনঃ

www.bjilibrary.com

اِنِّىْ ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا تُؤَاخِذُوْنِىْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ مِنَ اللّٰهِ بِشَىْءٍ فَخُذُوْا بِهٖ فَاِنِّىْ لَمْ اَكْذِبْ عَلَى اللّٰهِ–

'আমি শুধু এরকম অনুমান করেছিলাম। কোনো আনুমানিক বিষয় আমার কাছে জিজ্ঞেস কোরো না। কিন্তু আমি যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিছু বলি, তা গ্রহণ করো ; কারণ আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলি না।'

তাই শাহ সাহেব বলেছেন যে, যে কাজগুলো হযরত অভ্যাসবশত করতেন কিংবা ঘটনাক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলতেন, কেবল সেগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি সেসব প্রসঙ্গ ও বিষয়ের দৃষ্টান্তও পেশ করেছেন। এর মধ্যে তিনি এমন সব বিষয়ও উল্লেখ করেছেন, হযরতের জমানায় যেগুলোর একটা সাময়িক যৌক্তিকতা ছিলো বটে, কিন্তু সমগ্র উম্মাতের জন্যে অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় ছিলো না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দীন সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলতেন—তা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ হোক কি তাঁর ইজতিহাদ, তা–ই ছিলো রসূলের কথা, আর তা–ই উম্মাতের জন্যে অবশ্য পালনীয়। এ ছাড়া মানুষ হিসেবে আর যা কিছু বলতেন, তার মধ্যে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না। এ কারণেই কোনো কোনো পরামর্শমূলক বিষয়ে দেখা যায় যে, সাহাবাগণ যেমন অবাধে মতপ্রকাশ করেছেন, তেমনি তা গ্রহণও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হযরতের এমনিতরো মতের বিপরীত কাজও হয়েছে। তাই কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি হযরত জায়েদকে বলেনঃ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (জায়েদ) হযরত জয়নাবকে তালাক দিয়ে দিলেন। আপনি কি একথা ধারণা করতে পারেন যে, রসূল হিসেবে তিনি আদেশ দিলে হযরত জায়েদ তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন? হাদীস–গ্রন্থাবলীতে কতিপয় ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, হযরত কোনো কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেছেনঃ এটা কি আপনি রসূল হিসেবে বলছেন, না ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে? উদাহরণত, বদর যুদ্ধের কালে তিনি এক জায়গায় শিবির স্থাপন করতে চাইছিলেন। এমনি সময়ে একজন সাহাবী এসে অনুরূপ প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, হযরত নিজের ইচ্ছা থেকে কথাটি বলছেন। তখন তিনি সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে, হযরত! এখান থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে শিবির স্থাপন করলে সেটাই বেশী যুক্তিযুক্ত হবে। অবশেষে তা–ই করা হলো।

www.bjilibrary.com

এসব ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সব সময় ও সর্বাবস্থায় রসূল ছিলেন না এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজই রসূলের কথা ও কাজ ছিলো না। অবশ্য যে আল্লাহ্‌র বান্দাহ নিজেকে প্রিয়তমের রঙে রাঙাতে চায়, তার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এরূপ স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। শাহ সাহেব অবশ্য হযরতের এমন সব ফায়সালাও এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা নবুয়াতের মর্যাদা সম্পন্ন ছিলো না (সম্ভবত তিনি সাময়িক ফায়সালাগুলোই বুঝাতে চেয়েছেন)। 'তালিমাতের' লেখকও সম্ভবত এ হিসেবে ইমারতকে নবুয়াত থেকে পৃথক করেছেন। কিন্তু আমি তো হযরতের দীন সংক্রান্ত ফায়সালাগুলোকে ঠিক নবুয়াত প্রচারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশ্য পালনীয় বলেই মনে করি। অবশ্য ইমারত ও নবুয়াত সংক্রান্ত আলোচনায় আর একটি জিনিস আমার সামনে এসেছে। 'তালিমাতে'র লেখক যদিও তার ওপর স্পষ্টত আলোকপাত করেননি। কিন্তু আনুষঙ্গিক অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়—আমার মনে যে বিষয়টি এসেছে তাঁর উদ্দেশ্যও হয়তো তাই। তাহলো এই যে, দীনী ব্যাপারে হযরতের আনুগত্য কি রসূল হিসেবে, আর কি আমীর হিসেবে—কিয়ামত পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে তখনো যেমন মতানৈক্য করার অধিকার ছিলো না, আজো থাকতে পারে না। কিন্তু কথা হলোঃ হযরতের পরও তো কুরআনে করীম আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্যে এমন কোনো প্রাধিকার (Authority) থাকা প্রয়োজন, যা বিরোধীয় ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রসূলের ফায়সালা নির্দেশ করতে পারে কিংবা সাময়িক ব্যাপারে এরূপ ফায়সালা নিজেই ঘোষণা করতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, খলীফা যদি সত্যাশ্রয়ী হন এবং সেই সঙ্গে তার উপদেষ্টা বা 'মজলিসে শূরা' (সঠিক পন্থায় নির্বাচিত) কাজ করতে থাকে, তবে এ মজলিস অর্থাৎ খলীফা ইন্‌কাউন্সিলই (Caliph-in Council) হবে চূড়ান্ত প্রাধিকার (Authority) যা মুসলিম জাতির জন্যে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিনিধিত্ব করবে। অর্থাৎ এ মজলিসের ফায়সালাই চূড়ান্ত ফায়সালা হবে এবং এর সঙ্গে কারো মতানৈক্য করার অধিকার থাকবে না। নচেত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যদি فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এর দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। পরন্তু এ মজলিসই হবে সর্বোচ্চ পরিষদ (Supreme Council) যার ফায়সালার বিরুদ্ধে আর কোথাও আপীল চলবে না। আর এ পরিষদই ফিকাহ্ ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

www.bjilibrary.com

অবশ্য এ পরিষদের কোনো সদস্য কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত ফায়সালা ঘোষণা করলে জনসাধারণ তাকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকে নির্বাচিত করতে পারবে। কারণ জাতিকে আল্লাহ্ ও রসূলের পথে চালিত করে না, এমন শাসনকর্তার اولى الامر সঙ্গে মতানৈক্য করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ তার ফায়সালাকে কিতাব ও সুন্নাহ্ বিরোধী মনে করলেই তাঁর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করতে পারবে না। সর্বোপরি এই ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ সাময়িক বিষয়াদিতে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে কোনো পূর্বতন সাময়িক ফায়সালার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধেও ফায়সালা গ্রহণ করতে পারবে। হাদীস ও জীবনী গ্রন্থাবলী থেকেও এর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। রসূলে করীম (স) নাজরানের খৃষ্টান ও খায়বরের ইয়াহুদীদেরকে নিজ নিজ জায়গায় থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাঁর খেলাফতকালে সাময়িক যুক্তিসঙ্গত কারণে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করেন। অনেকেই বলে থাকেন যে, কখনো কখনো সমকালীন খলীফা পর্যন্ত (যেমন হযরত উমর, হযরত আলী প্রমুখ) প্রতিবাদী হিসেবে আদালতের কক্ষে গিয়ে দাঁড়াতেন ; এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খলীফার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করার প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এ ধরনের কথা যারা বলেন, তারা খলীফা এবং তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার (Personal Capacity) মধ্যে পার্থক্য করেন না। আদালতে উমর বিন্ খাত্তাব ও আলী বিন্ আবু তালিবই উপস্থিত হতেন আর অভিযোগও ছিলো তাঁদের ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে, খলীফা-ইন্-কাউন্সিলের বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে আইনের চৌহদ্দী থেকে আইন প্রবর্তকদেরকেও রেহাই দেয়নি, উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা তার এ অনুপম বৈশিষ্ট্যই প্রমাণিত হয়।

পরন্তু এও মনে রাখা দরকার যে, খলীফা-ইন্-কাউন্সিলের মর্যাদা আইন প্রণেতার মর্যাদা নয় ; কারণ আইনের মূলনীতি চিরদিনের তরে কিতাব ও সুন্নাতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এখন সেই মূলনীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে বিধি-বিধান তৈরী করাই হচ্ছে এই পরিষদের দায়িত্ব। আমার ধারণা, 'কুরআনে করীমের যেসব জায়গায় আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের হুকুম এসেছে, তদ্বারা ইমারতকেই বুঝানো হয়েছে—একথা লেখার সময় 'তালিমাতের' লেখকের সামনে উল্লেখিত ধরনেরই একটি খসড়া ছিলো। এটা যদি ঠিক হয় তো এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদের আনুগত্যকে রসূলের আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতাকে আল্লাহ্ ও

www.bjilibrary.com

রসূলের অবাধ্যতা বলার মধ্যে আপত্তির কোনো কারণ নেই। খোদ নবী করীম (স) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে তার অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা করলো।'

আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেলো। কিন্তু এতে অনেক কাজের কথাও বেরিয়ে আসবে বলে আমি আশা করি। পরিশেষে একটি নিবেদন করা জরুরী বোধ করছি। আমি যেহেতু আপনাকেই সম্বোধন করে লিখছি, এ কারণে আপনার জবাবের পর যেসব বিষয়ে অধিকতর পরিতুষ্টির প্রয়োজন বোধ হয়েছে কেবল সেগুলোই এখানে পেশ করেছি। আর যেসব বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে কিংবা 'তালিমাত' লেখকের সঙ্গে মতানৈক্য রয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি শুধু মানসিক প্রশান্তির জন্যেই করা হয়েছে।"

রসূলের আনুগত্যের প্রশ্নে এটা সর্বসম্মত কথা কে, কোনো রসূলই নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদায় আনুগত্য লাভের উপযুক্ত হতে পারেন না। মূসা (আ) ইমরান-পুত্র বলেই তাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তন করা হয়নি। ঈসা (আ) মরিয়ম-পুত্র বলেই আনুগত্য লাভ করেননি। আর মুহাম্মাদ (স) আবদুল্লাহ্ তনয় বলেই তাঁর আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। এঁদের আনুগত্য ও অনুবর্তনের একমাত্র কারণই হলো এই যে, এঁরা আল্লাহ্ তায়ালার রসূল। আল্লাহ্ তাঁদেরকে যে সত্য জ্ঞান দান করেছেন, সাধারণ মানুষকে তা দান করেননি। তাঁদেরকে যে হেদায়াত ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, সাধারণ মানুষকে তা দেননি। তাঁদেরকে দুনিয়ার বুকে আপন সন্তুষ্টি মুতাবেক জীবন যাপন করার যে নির্ভুল পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ তা নিজস্ব বিচার বুদ্ধি কিংবা নবী ছাড়া অন্য মানুষের পথনির্দেশ থেকে জানতে পারে না। এখন এই রসূলের আনুগত্য কোন্ বিষয়ে এবং কতটুকু বাধ্যতামূলক এখানেই হলো মতানৈক্যের ভিত্তি।

একদল বলেন যে, আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর রসূল যে কিতাব নিয়ে আসেন, আনুগত্য ও অনুবর্তন কেবল তার বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ, সে কিতাব প্রচার করার পরই রসূলের নববী মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনিও অন্য মানুষের মতোই একজন মানুষ মাত্র। অন্য মানুষ জাতির নেতা বা শাসক হলে শুধু আইন শৃংখলার (Discipline) খাতিরেই তার আনুগত্য করতে হয় ; কিন্তু তা ধর্মীয় দায়িত্ব নয়। অন্য মানুষ আলেম, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী,

www.bjilibrary.com

দার্শনিক ও আইনজ্ঞ হলে তাদের গুণপনার (Merits) কারণেই তাদের অনুসরণ করতে হয়, আর এই অনুসরণ হচ্ছে ব্যবস্থামূলক, বাধ্যতামূলক নয়। রসূলুল্লাহ্‌র ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। একমাত্র কিতাবের প্রচার ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারেই রসূলের মর্যাদা হচ্ছে ব্যক্তিগত। একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি আমীর বা শাসক হলে তাঁর আনুগত্যও হবে সাময়িক—চিরস্থায়ী নয়। তিনি কাযী বা বিচারক হলে তাঁর ফায়সালাও শুধু তাঁর বিচার-সীমা (Jurisdiction) পর্যন্তই কার্যকরী হবে—তার বাইরে নয়। তার বাইরে বড়োজোর নজীরের প্রয়োজনে একজন প্রাজ্ঞ বিচারক হিসেবেই তাঁর ফায়সালা গ্রহণ করা হবে—একজন আইনবেত্তা ও আইনপ্রণেতা হিসেবে নয়। তিনি একজন দার্শনিক হলে তাঁর মুখ থেকে দর্শন ও নৈতিকতা সম্পর্কে যেসব কথা বেরোবে, তা নিজস্ব মূল্যমানের দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা হবে—অন্যান্য পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের এ জাতীয় কথা যেভাবে গ্রহণ করা হয়। যেসব কথা নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে বেরিয়েছে, কেবল এ যুক্তিটিই সেগুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাবে না। অনুরূপভাবে তিনি একজন চরিত্রবান মানুষ হলে এবং রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের দিক থেকে তাঁর জীবন একটি উত্তম জীবন হলে আমরা স্বেচ্ছায় তাঁকে একটি আদর্শ (Model) রূপে বরণ করে নেবো—একজন অ-নবীর উত্তম জীবনাদর্শকে গ্রহণ করতে যেমন আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু তাঁর কোনো কথা ও কাজ আমাদের নৈতিক-চরিত্র, সামাজিকতা, অর্থনীতি ও সামগ্রিক কাজ-কারবারে অবশ্য পালনীয় আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। এ হলো 'আহলে-কুরআন' বলে পরিচিত দলটির ধর্মমত।

দ্বিতীয় দলটি এই মতবাদ কিছুটা সংশোধন করে নিয়েছিল। তারা বলছেন যে, রসূলের দায়িত্ব শুধু কিতাব পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্তই নয়, বরং তাঁর উম্মাত কোন্ আদর্শকে সামনে রেখে কিতাবের বিধি-ব্যবস্থা পালন করবে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা দেখিয়ে দেয়াও তাঁর দায়িত্ব ছিলো। কাজেই এবাদাত, আনুগত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কিতাবী বিধি-ব্যবস্থার যে বাস্তব ও বিস্তৃত রূপ তিনি প্রদর্শন করেছেন, তার অনুবর্তনও কিতাবের অনুবর্তনের শামিল এবং ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কিতাবী বিধি-ব্যবস্থা ছাড়া আর যেসব কাজ রসূল তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে একজন শাসক, বিচারক, সংস্কারক, দার্শনিক, নাগরিক এবং সমাজের একজন সভ্য হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন আইনের মর্যাদা সম্পন্ন এবং চিরকাল দীনী কর্তব্য হিসেবে অনুসরণযোগ্য কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব নেই। জনাব মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরী হচ্ছেন এ দলের প্রতিনিধি।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় দলটি রসূলের নববী মর্যাদাকে তাঁর জীবনের এক বিরাট অংশের ওপর পরিব্যাপ্ত বলে মনে করেন। নৈতিক-চরিত্র, সামাজিকতা, পারস্পরিক লেন-দেন, আইন-কানুন, বিচার-ফায়সালা এবং অন্যান্য বহুতরো বিষয়ে তাঁর কথা ও কাজকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সম্পাদিত বলে স্বীকার করেন এবং এ সকল কাজকে উন্নাতের জন্যে উত্তম ও অনুকরণীয় আদর্শ বলেও বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর নববী সত্তা ও ব্যক্তি সত্তার মধ্যেও এরা একটা পার্থক্য-রেখা টানতে চান। এরা মনে করেন যে, রসূলের জীবনে অবশ্যই নববী সত্তার বহির্ভূত কিছু বিষয়াদি রয়েছে, যা অনুকরণযোগ্য আদর্শ নয়। এরা অবশ্য নববী সত্তা ও ব্যক্তি সত্তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারেন না, যেখানে পৌছার পর রসূলের মর্যাদা নিছক একজন মানুষের বেশী আর কিছু থাকে না। আমি মনে করি, বন্ধুবর পারভেজ সাহেব এ দলেরই অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য আমি গোড়াতেই এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, তাঁর মতবাদটি প্রথমোক্ত দুই দলের তুলনায় সত্যের অনেক বেশী নিকটবর্তী। যদিও তাঁর মধ্যেও কিছুটা ভ্রান্তি রয়েছে ; কিন্তু তা গোমরাহীর সীমা অবধি পৌছেনি।[১]

চতুর্থ দল বলেন যে, রসূলের ব্যক্তি সত্তা ও নববী সত্তা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক সত্তা বটে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দু'টো একই জিনিস এবং এ দুয়ের মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। কারণ নবুয়াতের পদমর্যাদাটা দুনিয়াবী পদমর্যাদার মতো ব্যাপার নয় যে, পদাধিকারী যতোক্ষণ সরকারী চেয়ারে বসা থাকে, ততোক্ষণ সে পদাধিকারী আর তা থেকে অবতরণ করলেই একজন সাধারণ মানুষ। বরং রসূল যে মুহূর্তে নবুয়াতের পদমর্যাদায় অতিষিক্ত হন, তখন থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস অবধি প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কর্তব্যরত (On Duty) থাকেন। তিনি যে সালতানাতের প্রতিনিধি, তার নীতি ও আদর্শের বিরোধী কোনো কাজ তিনি করতে পারেন না। তাঁর জীবনের সমুদয় ক্রিয়াকাণ্ড—তা তিনি ইমাম, শাসক, বিচারক, শিক্ষক, নাগরিক কিংবা পিতা, পুত্র, ভাই, আত্মীয় ও বন্ধু হিসেবেই সম্পাদন করুন না কেন—নির্বিশেষে সকল কাজের ওপরই তাঁরা নববী সত্তা পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং কোনো অবস্থায় এক মুহূর্তের তরেও তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এমন কি মসজিদে নামায পড়বার কালে তিনি যেমন আল্লাহ্‌র রসূল থাকেন, অন্দরে নিজ স্ত্রীর কাছে থাকা কালেও তেমনি রসূলই থাকেন।

১. গোলাম আহমদ পারভেজ সম্পর্কে লেখকের এই ধারণা আজ থেকে ৩৩ বছর পূর্বের ১৯৩৫ সালের। কিন্তু তারপর পারভেজ এ মতে থাকতে পারেননি, বরং শেষ পর্যন্ত গোমরাহীর সীমা পর্যন্তই পৌছেছেন। -সম্পাদক

www.bjilibrary.com

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যা কিছু করেন, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমেই করে থাকেন। তাঁর ওপর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত থাকে এবং এর ফলেই তিনি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলতে বাধ্য থাকেন। এভাবে যেসব নিয়ম-নীতি ও আদর্শের ওপর মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যেসব সীমারেখার মধ্যে মানুষের কর্ম স্বাধীনতাকে সীমিত রাখার কথা, নিজের কথাবার্তা, কাজকর্ম ও জীবন-দৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলোকে তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেন। এ দায়িত্ব তিনি সরকারী মর্যাদায় থাকা কালে যেরূপ পালন করেন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও তেমনি করে থাকেন এবং কোনো ব্যাপারে তাঁর পদক্ষেপে এতোটুকু বিচ্যুতি দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সংশোধন করে দেয়া হয়। কারণ, তাঁর বিচ্যুতি শুধু তাঁর নিজের বিচ্যুতিই নয়, বরং তা গোটা উম্মাতেরই বিচ্যুতি। এ কারণে যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করে তাদের সামনে একটি 'মুসলিম' জীবনের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করাই হচ্ছে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। আর শুধু ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে পথনির্দেশ দান করে তাদেরকে পৃথক পৃথক মুসলমান বানানোই নয় বরং সেই সঙ্গে ইসলামের সামাজিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে সত্যিকারভাবে একটি মুসলিম সমাজ গঠন করাও তাঁর উদ্দেশ্য। কাজেই যাতে করে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ ও অনুবর্তন করা যেতে পারে এবং তাঁর কথা ও কাজকে সম্পূর্ণত ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের মাপকাঠি রূপে নিদ্বিধায় গ্রহণ করা যেতে পারে, এ জন্যেই তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকা একান্ত অপরিহার্য। একথা নিসন্দেহ যে, নবীর কথা ও কাজের অনুবর্তন-অনুসরণে অবশ্যই পর্যায়গত পার্থক্য রয়েছে। তার কোনো কোনোটি ফরয ও ওয়াজিব, কোনোটি মুস্তাহাব আবার কোনো কোনোটি উভয় পর্যায়ের। কিন্তু সমগ্রভাবে নবীর গোটা জীবনই হচ্ছে একটি পূর্নাঙ্গ আদর্শ (Model); এ আদর্শ মুতাবেক বনী আদম নিজেকে গঠন করার প্রয়াস পাবে—এ জন্যেই তাকে পেশ করা হয়েছে। এ আদর্শ অনুসারে যে ব্যক্তি যতোটা আত্মগঠন করবে, সে ততোটাই পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং মুসলমান হবে, আর যে তার অনুসরণে অপরিহার্য ন্যূনতম পর্যায় থেকেও নীচে অবতরণ করবে, সে নিজের অক্ষমতা অনুসারে ফাসেক, ফাজের, গোমরাহ ও অভিশপ্ত বলে গণ্য হবে।

আমার মতে, এই সর্বশেষ দলটি হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী। আর আমি কুরআন ও বিচার-বুদ্ধির আলোকে যতোই তলিয়ে চিন্তা করি, এ মতবাদের সত্যতা

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে আমার প্রত্যয় ততোই বেড়ে যায়। কুরআন মজিদে নবীদের যে জীবন কথা বিবৃত হয়েছে, তা দেখার পর নবুয়াতের এ স্বরূপই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা হঠাৎ কোনো পথচারীকে ধরে এনে লোকদের কাছে কিতাব প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করেননি। অথবা নিজের অন্যান্য কাজের সঙ্গে কিছুটা পয়গাম্বরীর কাজও করে দেবে—একজন পার্ট-টাইম ওয়ার্কার (Part-time Worker) যেমন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট কাজ করে দেয় এবং কাজটি শেষ হবার পর সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়—এ হিসেবেও কাউকে তিনি পয়গাম্বর নিযুক্ত করেননি ; বরং এর বিপরীত আমি দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোনো জাতির মধ্যে নবী পাঠাতে চেয়েছেন তখন নব্রয়ততের কাজ ভম্পাদনের জন্যে বিশেষভাবে একটি লোক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে এ গরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের উপযোগী শ্রেষ্ঠতম মানবিক চরিত্র এবং উচ্চতম মানসিক ও আধাত্মিক শক্তির সঞ্চার করেছেন। জন্ম-মুহূর্ত থেকে এক বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। নবুয়াত দান করার পূর্বেই তাঁকে নৈতিক বিচ্যুতি, গোমরাহী ও দুষ্কৃতির কবল থেকে মুক্ত রেখেছেন। সব রকম বিপদাপদ ও দুর্যোগের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। এমন পরিবেশে তাঁর প্রতিপালন করেছেন, যাতে তাঁর নবুয়াতের যোগ্যতা ক্রমশ উন্নতি লাভ করে ক্রিয়াশীলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এভাবে যখন তিনি পূর্ণত্বের সীমায় উপনীত হয়েছেন তখন সম্পূর্ণ নিজের তরফ থেকে জ্ঞান, বিচার-শক্তি (Judgement) ও হেদয়োতের আলো দিয়ে তাঁকে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অতপর তাঁর কাছ থেকে এমনভাবে এ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে যে, নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার পর থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাঁর গোটা জীবনই এ কাজের জন্যে উৎসর্গীকৃত রয়েছে। তাঁর জন্যে দুনিয়ায় আল্লাহ্র আয়াতের তেলাওয়াত, কিতাব ও হিকমতের শিক্ষাদান এবং লোকদের চরিত্র সংশোধন ছাড়া আর কোনো পেশাই ছিলো না। বরং দুনিয়ার ভ্রষ্ট লোকদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা আর সৎপথে আগতদেরকে উন্নতির উচ্চমার্গে পৌছাবার মতো যোগ্য করে তোলাই ছিলো তাঁর রাতদিনের ওঠাবসা ও চলাফেরার একমাত্র ধ্যান-চিন্তা। তিনি হামেশাই একজন সার্বক্ষণিক কর্মচারী (Whole-time Servant) ছিলেন। তিনি কখনো কোনো ছুটিভোগ করেননি, তাঁর জন্যে কোনো কার্যকালও (Working hours) নির্দিষ্ট ছিলো না। তিনি যাতে ভুল করে না বসেন, সে জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপিত ছিলো। তাঁকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে কঠোরভাবে রক্ষা করা হয়েছে। বিষয়টিকে শুধু তাঁর মানবিক বিচার-বুদ্ধি ও

www.bjilibrary.com

নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপরই ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং যেখানেই তাঁর আকাংখা অথবা সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সরল পথ তেকে চুল পরিমাণও অতিক্রম করে গিয়েছে, সেখানেই তাঁকে বাধা দিয়ে সোজাপথে চালিত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে 'সীরাতে মুস্তাকীম' তথা সহজ–সরল পথে চালিত করাই হচ্ছে তাঁর পয়দায়েশ ও আবির্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি যদি এ পথ থেকে একচুল পরিমাণও বিচ্যুত হতেন, তবে সাধারণ মানুষ তা থেকে কয়েক মাইল দূরে সরে যেতো।

এই কথাগুলোর একটিও আমার মনগড়া নয়,বরং এর প্রতিটি শব্দই কুরআন থেকে সমর্থিত।

১। নবীগণ যে পয়দায়েশের আগেই নবুয়াতের জন্যে মনোনীত হতেন এবং তাঁদেরকে এ কাজের জন্যেই বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হতো, বিভিন্ন নবীর জীবনকথা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ হযরত ইসহাকের জন্মের পূর্বেই হযরত ইবরাহীমকে তাঁর পয়দায়েশ ও নবুয়াত সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়–

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ ط
– (الصفت: ١١٢–١١٣)

হযরত ইউসূফের বাল্যকালেই হযরত ইয়াকুব জানতে পারেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সম্মানিত এবং ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)–এর মতোই অনুগৃহীত করতে যাচ্ছেন। হযরত জাকারিয়া পুত্রের জন্যে প্রার্থনা করলে তাঁকে হযরত ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষায় সুসংবাদ দেয়া হয়—

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا
وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ *– (ال عمران : ٣٩)

হযরত মরিয়ামকে একটি নিষ্পাপ পুত্র সন্তানের (غلام زكى) সুসংবাদ দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে বিশেষভাবে ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। যখন তাঁর সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হয়, তখন খোদ আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে তাঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয় (সূরায়ে মরিয়ামঃ দ্বিতীয় রুকূ)। তারপর যে, ইসরাইল রাখালকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় ডেকে কথা বলা হয়েছিলো তাঁর অবস্থাটাও লক্ষ্যণীয়। তিনিও আর পাঁচজন সাধারণ রাখালের মতোই ছিলেন না। তাঁকে মিশরের ফেরাউনিয়াতকে ধ্বংস করা এবং বনী ইসরাইলকে

www.bjilibrary.com

গোলামীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে হত্যার কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং যে ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার ঘরেই তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। ফেরাউন পরিবারের লোকদের হৃদয় মুগ্ধ করার জন্যে তাঁকে প্রিয়দর্শী রূপ-সৌন্দর্য দান করা হয়। وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى তাঁর মুখকে সমস্ত নারীর দুধ থেকে বিরত রাখা হয়, এমন কি পুনরায় তাঁকে নিজ মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনা হয় এবং খোদ আল্লাহ্ তায়ালার তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয় وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ এ কয়টি দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নবীদেরকে বিশেষভাবে নবুয়াতের জন্যেই সৃষ্টি করা হতো।

২। তারপর এ-ও লক্ষণীয় যে, এভাবে যে লোকগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁরা কেউই সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। তাঁরা অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতেন। তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতি অতীব নির্মল ও পবিত্র ছিলো। তাঁদের মানসিক গড়নই এমনি ছিলো যে, তা থেকে শুধু সহজ, সরল ও স্পষ্ট কথাই বেরুতো। তাঁদের মধ্যে ভ্রান্ত ও কুটিল সৃষ্টির কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। স্বভাবত তাঁরা এমনিভাবে তৈরী হতেন যে, কোনোরূপ ইচ্ছা-ইরাদা ও চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই নিছক অনুভূতি ও দূর-দৃষ্টির (Intuition) সাহায্যে এমন নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন—যেখানে অন্যান্য মানুষ প্রচুর চিন্তা-গবেষণা করেও পৌঁছাতে পারতো না। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ছিলো স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও ভুল-নির্ভুলের পার্থক্যবোধটা ঠিক তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছিল। তাঁরা স্বভাবতই নির্ভুল ভাবতেন, নির্ভুল বলতেন এবং নির্ভুল কাজ করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কথা লক্ষণীয়। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনেই তাঁর মনে আশঙ্কা জাগলো যে, এ শিশুর ভাইয়েরা একে বাঁচতে দেবেনা। ভাইয়েরা তাঁকে খেলতে নিয়ে যেতে চাইলে হযরত ইয়াকুব শুধু তাদের অসদুদ্দেশ্যই আঁচ করতে পারলেন না বরং তাদের ভবিষ্যত বাহানাটাও বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন-

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ - (يوسف : ١٣)

www.bjilibrary.com

অতপর তাঁর ভাইয়েরা রক্তমাখা জামা এনে পেশ করলে তা দেখে হযরত ইয়াকুব বললেন- بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا- (يوسف) অনুরূপভাবে ইউসূফের ভাইয়েরা মিশর থেকে ফিরে এসে বললো যে, আপনার পুত্র চুরি করেছে। তারা এক কথায় বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে এতোদূর পর্যন্ত বললো যে, আমরা যে জনপদ থেকে এসেছি, সেখানকার লোকদের কাছেই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে দেখুন। তখন হযরত ইয়াকুব আবার সেই একই জবাব দিলেনঃ এ তোমাদের প্রবৃত্তির ধোঁকামাত্র । তিনি পুত্রদেরকে আবার মিশর পাঠিয়ে বললেনঃ اِذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ - (يوسف : ٨٧) এরপর তাঁর পুত্ররা যখন হযরত ইউসূফের জামা নিয়ে মিশর থেকে যাত্রা করলো, তখন দূর থেকেই তিনি ইউসূফের খোশবু পেতে লাগলেন। বস্তুত আম্বিয়ায়ে কেরামের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিলো, এ সকল ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এটা শুধু হযরত ইয়াকুবের একক বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং সমস্ত নবীর অবস্থাই অনুরূপ। হযরত ইয়াহইয়া সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً - (مريم :١٢-١٣)

"আমরা শিশুকাল থেকেই তাঁকে বিচারশক্তি, দয়াশীলতা ও সৎস্বভাব দান করেছি।"-মারইয়াম ঃ ১৩

হযরত ঈসার জবানীতে দোলনার মধ্যেই বলানো হয়েছেঃ

وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا * وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا * - (مريم :٣١-٣٢)

"আমি যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহ্ আমায় পবিত্র ও বরকতপূর্ণ বানিয়েছেন। তিনি আমায় বেঁচে থাকা পর্যন্ত নামায পড়ার ও যাকাত দান করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং আমাকে আপন মায়ের খেদমতগার বানিয়েছেন। তিনি আমায় অবাধ্য, বিদ্রোহী ও হতভাগ্য বানাননি।"-মারইয়াম ঃ ৩১-৩২

নবী করীম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ * - (القلم : ٤)

"তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করছো।" আল্-কালাম ঃ ৪

www.bjilibrary.com

বস্তুত নবীগণ যেসব প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক গুণপনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ আয়াত দু'টিতে সেগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সকল প্রাকৃতিক শক্তি–সামর্থকে উন্নত করেই আল্লাহ্ তায়ালা ক্রিয়াশীলতার দিকে নিয়ে যান। এমন কি শেষপর্যন্ত জ্ঞান, বিচারশক্তি, হেদায়েত, প্রদীপ ইত্যাকার নামে কুরআনে বর্ণিত জিনিসটিই তাঁদের দান করেন।

হযরত নূহ তাঁর জাতিকে বলেনঃ

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ *– (اعراف :٦٢)

"আমি আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন সব কথা জানি, যা তোমরা জান না।"

হযরত ইবরাহীম (আ)–কে আসমান ও জমিনের রাজত্ব পর্যবেক্ষণ করানো হয় (আনআম ঃ ৯)। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে ফিরে এসে তিনি আপন পিতাকে বলেন ঃ

يَاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَ نِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا *– (مريم : ٤٣)

"হে পিতা! আমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তা তোমার কাছে নেই। কাজেই আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো, আমি তোমায় সোজা পথ দেখিয়ে দেবো।"

হযরত ইয়াকুব সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ *– (يوسف:٦٨)

"নিশ্চয়ই তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যা আমরা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ রহস্যটা জানে না।"–ইউসুফ

হযরত ইউসুফ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا – (يوسف : ٢٢)

"তিনি যৌবনে উপনীত হলে আমরা তাঁকে বিচারশক্তি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলাম।"–ইউসুফ ঃ ২২

হযরত মূসা সম্পর্কেও একথাই বলা হয়েছে, (কাসাস ঃ ২)। এই বিচক্ষণতা ও বিচার–শক্তিই হযরত লূতকে দান করা হয়েছিলো। আর এ অসাধারণ জ্ঞান সম্পদেই নবী করীম (স) সমৃদ্ধ হয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء : ١١٣)

"আল্লাহ্ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, আর তোমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি পূর্বে জানতে না।"

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ – (الانعام : ٥٧)

"বলো, আমি আপন রবের তরফ থেকে এক উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট পথে রয়েছি।"

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط –

(يوسف : ١٠٨)

"বলো, এ হচ্ছে আমার পথ; আমি (লোকদেরকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকি। আমি যেমন দূরদৃষ্টির ওপর আছি, তেমনি আমার অনুবর্তীগণও।'

এ বিচার-শক্তি ও বিচক্ষণতার দিক থেকে পয়গাম্বর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এতোখানি বিরাট পার্থক্য সূচিত হয় যে, একজন চক্ষুষ্মান ও দৃষ্টিহীন ব্যক্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য হয়ে থাকে।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ط–

(الانعام : ٥٠)

"আমি কেবল সেই জিনিসেরই অনুসরণ করি, যা আমার ওপর নাযিল করা হয়। বলো' (হে মুহাম্মাদ)! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়ে কি সমান হতে পারে?"

এ আয়াতগুলোতে শুধু কিতাবের কথাই বলা হয়নি, বরং নবীদের ভেতরে সঞ্চারিত এক প্রকার আলোর কথারও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্যেই তা কিতাব থেকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে নবীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে। এ আলোর সাহায্যেই তাঁরা প্রকৃত সত্যকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর দ্বারাই ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্য করেন এবং সমগ্র বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর সাহায্যেই তাঁরা যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছেন। ওলামায়ে ইসলাম এ জিনিসটিরই নাম রেখেছেন গুপ্ত অহী (وحى) । অর্থাৎ তাঁরা একটি প্রচ্ছন্ন দূরদৃষ্টি ও পথনির্দেশের অধিকারী ছিলেন এবং প্রতিটি ব্যাপারে এ জিনিসটির সাহায্যেই তাঁরা কাজ করতেন। অন্য লোকেরা প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের

www.bjilibrary.com

মর্মমূলে পৌছতে পারে না—যেসব বিষয়ে সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম নয়, সেসব ব্যাপারে নবীদের দৃষ্টি আল্লাহ্‌র দেয়া আলো ও বিচক্ষণতার সাহায্যে মুহূর্তেই একটি মাত্র গভীর মর্মমূল্যে গিয়ে পৌছত।

৩। এরপর কুরআন মজীদ আমাদের বলছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নবীদেরকে শুধু বিচক্ষণতা, বিচার শক্তি ও অসাধারণ দূরদৃষ্টিই দান করেননি বরং সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতি হামেশা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন এবং মানবীয় প্রভাব, শয়তানী কুমন্ত্রণা, প্রবৃত্তির তাড়না ইত্যাদির গোমরাহী থেকে তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এমনকি মানবীয় প্রকৃতির তাগিদে কখনো তাঁরা আপন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভুল করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা তা সংশোধন করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হযরত ইউসূফের কাহিনী লক্ষ্যণীয়। মিসরের আজীজ-পত্নী যখন তাঁকে চক্রান্ত জালে প্রায় ফাঁসিয়ে এনেছিলো, তখন আল্লাহ্ তায়ালা আপন 'নিদর্শন' (برهان) দেখিয়ে তাঁকে পাপাচার থেকে রক্ষা করলেন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۭ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۗءَ وَالْفَحْشَاۗءَ ۭ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ *- (يوسف:٢٤)

"সে (নারী)ইউসূফের প্রতি অসদিচ্ছা পোষণ করলো আর সে-ও (ইউসূফ) তার প্রতি অসদিচ্ছা পোষণ করতো, যদি না তাঁর প্রভুর নিদর্শন সে দেখতে পেতো। আমরা তাঁকে পাপাচার ও নিলর্জ্জতা থেকে বিরত রাখার জন্যেই এরূপ করেছি। কারণ সে ছিলো আমাদের মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত মূসা ও হারুন (আ)-কে যখন ফেরাউনের কাছে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন ফেরাউন হয়তো যুলুম করে বসবে বলে তাঁদের ভয় হলো। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে এ অভয় বাণী শুনালেনঃ কিছুমাত্র ভয় কোরো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি সবকিছু দেখছি এবং শুনতে পাচ্ছি (তা-হাঃ ২) জাদুকরদের তৈরি সাঁপ দেখে মূসা (আ) ভয় পেয়ে গেলে অমনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অহী নাযিল হলোঃ لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى *- (طٰهٰ : ٦٨) এ ভয় ছিলো মানব প্রকৃতিজাত। আল্লাহ্ তায়ালা এ মানবীয় দুর্বলতাকে অহীর সাহায্যে দূর করে দেন।

হযরত নূহ (আ) আপন পুত্রকে পানিতে ডুবতে দেখে চিৎকার করে উঠলেনঃ (هود : ٤٥) رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ "হে আল্লাহ্! এ যে আমার

www.bjilibrary.com

পুত্র!" এটা ছিলো তাঁর মানবীয় দুর্বলতা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তায়ালা এ সত্যকে তাঁর সামনে তুলে ধরলেন যে, সে তোমার ঔরসজাত হতে পারে, কিন্তু তোমার 'পরিবার'ভুক্ত নয়। পিতৃ-স্নেহের আবেগে মানবীয় প্রকৃতি কয়েক মুহূর্তের জন্যে নবীর দৃষ্টি থেকে এ সত্যকে গোপন করে ফেলেছিলো যে, সত্যের ব্যাপারে পিতা, পুত্র, ভাই ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা অহীর মাধ্যমে তখনি তাঁর দৃষ্টির আবরণ তুলে ফেললেন এবং হযরত নূহও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

নবী করীম (স)-এর ব্যাপারেও কয়েকবার এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক দয়া ও ক্ষমাশীলতা, কাফেরদের মুসলমান করার ব্যাকুলতা, কাফেরদের মানসিক প্রশান্তি, লোকদের ছোটোখাটো অনুগ্রহের প্রতিদান দেবার প্রয়াস, মুনাফেকদের অন্তরে ঈমানী ভাবধারার সঞ্চারের আকাংখা এবং কখনো কখনো মানবীয় প্রকৃতির কারণে কোনো ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলে অমনি অহীর মাধ্যমে তার সংশোধন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى * اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى*- (عبس : ١-٢) مَاكَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى- (انفال : ٦٧) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ - (توبه : ٤٣) اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط - (توبه :٨٠) وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا - (توبه : ٨٤) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَااَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج -

(تحريم : ١)

এই আয়াতগুলো উল্লেখিত বিষয়টিরই সাক্ষ্য বহন করছে। এক শ্রেণীর লোক এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ করতে চায় যে, নবী করীমেরও ভুল-ত্রুটি হতো এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। বিশেষ করে 'আহ্লে কুরআন' ভদ্রলোকেরা তো এই আয়াতগুলো দ্বারা হযরতের ভুল-ত্রুটি আবিষ্কার করতে খুবই উৎসাহী। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, নবীকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা এবং তাঁকে অমিশ্র সত্যের ওপর অবিচল রাখার দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এ সত্য শুধু উপরোক্ত আয়াতগুলোতেই নয়,

www.bjilibrary.com

বরং কুরআনের অনেক স্থানেই আল্লাহ্ তায়ালা নীতিগতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন বলা হয়েছেঃ

وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ط وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط- (النساء :١١٣)

"যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত না হতো, তবে তাদের মধ্যেকার একটি দল তো তোমায় সৎপথ থেকে বিচ্যুত করার সংকল্প করেই ফেলেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের বিপথগামী করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি—তোমারও কোনো ক্ষতি সাধান করতে সক্ষম হয়নি। কারণ আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি পূর্বে জানতে না।"

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ق وَاِذًا لاَّتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً * وَلَوْلاَ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً*-(بنى اسرائيل : ٧٣-٧٤)

"আমরা তোমার প্রতি যে অহী নাযিল করেছি, তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলেছিলো, যার ফলে তুমি অন্য কিছু আমার ওপর আরোপ করতে, আর তখন তারা তোমায় বন্ধু বলে গ্রহণ করতো। আল্লাহ্ যদি তোমায় অবিচল না রাখতেন তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তেই।"

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِىٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَايُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط

(الحج - ٥٢) -

"আমরা তোমার পূর্বে যে নবী বা রসূল পাঠিয়েছি, তিনি যখনই কোনো বিষয় প্রত্যাশা করেছেন, শয়তান তাঁর সেই প্রত্যাশায় কুমন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার নীতি এই যে, (নবীর অন্তরে) শয়তানের দেয়া যে কোনো কুমন্ত্রণাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং তারপর নিজের আয়াতকে সুদৃঢ় করে তোলেন।"

www.bjilibrary.com

এ সকল নীতিগত ঘোষণা এবং পূর্বোক্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নবীর জীবনকে ঠিক ঠিক ইপ্সিত পথে অবিচল রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন। এক নবীর দ্বারা ভুল-ত্রুটি হওয়া মাত্রই—সে ভুল-ত্রুটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হোক, কি সামাজিক ব্যাপারে—তার সংশোধন করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা করেছেন। একথা নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হলে এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নবীর যেসব কাজের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা আপত্তি করেননি, তা সবই ইপ্সিত মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যকথায় সেগুলো আল্লাহ্ তায়ালারই অনুমোদিত এবং তাঁর মোহরাঙ্কিত।

উপরে যা কিছু বলা হলো, তা থেকে নবুয়াতের তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। বস্তুত একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হবার পরই হঠাৎ করে অহী নাযিলের জন্যে মনোনীত হবেন এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই তাঁর অভিমত, চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড, বিধি-নিষেধ ও ফায়সালা অনবী মানুষের চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে না—তথাকথিত 'আহলে কুরআন' সম্প্রদায়ের যেমন ধারণা-এটা কিছুতেই নবুয়াতের স্বরূপ হতে পারে না। কিন্তু নবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু এটুকু পার্থক্য বর্তমান যে, কিতাব অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তার আইন-বিধানের বাস্তব ও খুঁটিনাটির বিবরণই তাকে বাতলে দেয়া হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে তিনি একজন সাধারণ আমীর, সাধারণ বিচারক ও সাধারণ নেতা বৈ কিছু নন—মাওলানা আসলাম জয়রাজপুরীর যেমন ধারণা—এটাও নবুয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য নয়। অনুরূপভাবে নবীর মানসিক সত্তায় নবুয়াত আরোপিত হবার পরও তাঁর মানব-প্রকৃতি ও পয়গাম্বরী সম্পূর্ণ পৃথক থেকে যায়, এমন কি তাঁর জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে কেবল নবুয়াত সংক্রান্ত দিকটিরই আনুগত্য ও অনুবর্তন সম্ভব—বন্ধুবর গোলাম আহমদ পারভেজের যেমন ধারণা—এটাও নবুয়াতের স্বরূপ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ তিনটি ধারণাই হচ্ছে অমূলক—ভিত্তিহীন।

পক্ষান্তরে নবুয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, নবী শুধু তাঁর পয়দায়েশ ও প্রতিপালনের পর্যায় অতিক্রমের পরই নবুয়াতের জন্যে মনোনীত হন না। বরং নবুয়াতের জন্যেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়। তিনি অবশ্য মানুষরূপেই সৃষ্ট হন এবং মানব-প্রকৃতির জন্যে নির্ধারিত সীমারেখা ও চৌহদ্দির মধ্যেই সীমিত থাকেন। কিন্তু এ সীমারেখার মধ্যেই তাঁর মনুষ্যত্ব চূড়ান্ত ও অত্যুচ্চ মানের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। একজন মানুষের পক্ষে যে সকল শক্তি অর্জন করা সম্ভব, তাঁর মধ্যে তা পুরোপুরি ও সর্বাধিক পরিমাণে

www.bjilibrary.com

বর্তমান থাকে। তাঁর দৈহিক, জৈবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি চূড়ান্ত মানের সমতা ও মধ্যবর্তী অবস্থায় (Balance and Modevation) বিদ্যমান থাকে। তাঁর অনুভূতি ও বোধশক্তি এতোটা সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই নিছক দূরদৃষ্টির সহায্যে তিনি আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করতে পারেন فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا আয়াতে যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি এতোটা নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হয়ে থাকে যে বাইরের কোনোরূপ শিক্ষাদীক্ষা ছাড়াই শুধু নিজস্ব ঝোঁকপ্রবণতার বলে তিনি অন্যায় ও দুষ্কৃতির পথ ছেড়ে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌প্রীতির পথ অবলম্বন করেন। তাঁর হৃদয়-মন এতোটা স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ যে, তাঁর সামনে উত্থাপিত প্রতিটি ব্যাপারেই তিনি আল্লাহ্‌র পথনির্দেশকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন- وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ আয়াতে যেদিকে ইশারা করা হয়েছে। বস্তুত নবীর অন্তরের স্বচ্ছতা ও তাঁর প্রকৃতির সুস্থতা স্বভাবতই তাঁকে আল্লাহ্‌র সন্তোষের বিপরীত পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুকূল পথেও তিনি আপনা-আপনিই চালিত হয়ে থাকেন। বস্তুত এহেন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়েই তিনি কার্যত আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলিফা) মনোনীত হন এবং এই জিনিসটির দৃঢ়তা, পরিপক্কতা ও পূর্ণত্ব লাভের পরই তিনি সাধারণ মানুষের হেদায়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হন। আর এমনি অবস্থায়ই তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অধিকতর জ্ঞানের আলো পেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপে পরিণত হন, সাধারণ মানুষের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে শিক্ষাদীক্ষা ও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তক আখ্যা লাভ করেন এবং পারিভাষিক দিক থেকে নবুয়াত ও রিসালাতের নামে অভিহিত হন।

কাজেই নবুয়াতকে শুধু এক বিশেষ সময়ে নবীর মানব-সত্তার ওপর আরোপিত জিনিস মনে করা নিতান্তই ভুল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নবুয়াত সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার সঙ্গে যে পূর্ণাঙ্গ গুণরাজির সৃষ্টি করা হয়, কার্যকারিতার দিকে এগোতে এগোতে শেষপর্যন্ত তা-ই নবুয়াতে পরিণত হয়। বাস্তব নবুয়াতের পদমর্যাদাটি এমন মামুলি ব্যাপার নয় যে, একজন মানুষকে ধরে এনে অমনি 'ভাইস্‌রয়' বানিয়ে দেয়া হলো, এমন কি তার পরিবর্তে অন্য মানুষ হলে তাকেও এভাবে 'ভাইস্‌রয়' বানিয়ে দেয়া যেতো। মূলত নবুয়াত একটি পয়দায়েশী জিনিস এবং নবীর ব্যক্তি সত্তাই হচ্ছে তাঁর নববী সত্তা। এ ব্যাপারে কেবল এটুকুই পার্থক্য থাকতে পারে যে, অভিষেকের পূর্বে তাঁর নববী সত্তা থাকে গুণগত পর্যায়ে আর অভিষেকের পর তা প্রকাশ পায় কার্যকরীরূপে। এর দৃষ্টান্ত যেমন মিষ্ট ফল—মূলত তা মিষ্ট ফলরূপেই সৃষ্টি হয়; কিন্তু তার পূর্ণ মিষ্টি পরিপক্কতার এক বিশেষ স্তরে এসেই প্রকাশ পায়।

www.bjilibrary.com

এরপর নবুয়াত ও নববী সত্তা প্রসঙ্গে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আয়াতগুলোর তাৎপর্য অতি উত্তমরূপে অনুধাবন করা যেতে পারে। আমি বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতার জন্যে এই জাতীয় আয়াতগুলোকে এক বিশেষ ধারাবাহিকতার সঙ্গে সাজিয়ে এখানে উদ্ধৃত করছি।

(١) وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ص فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهٖ ج- (ال عمران : ١٧٩)

"তোমাদেরকে সরাসরি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান দান করা আল্লাহ্ তায়ালার নীতি নয়। বরং এ কাজের জন্যে তিনি নবীদের মধ্য থেকে কাউকে ইচ্ছামতো মনোনীত করেন। কাজেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।"

(٢) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط- (النساء:٦٤)

"আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্যের জন্যেই পাঠিয়েছি।"

(٣) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج- (النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।"

(٤) وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى * اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى*- (النجم : ١-٤)

"নক্ষত্রের শপথ, যখন তা চূর্ণ হয়। তোমাদের সাথী (অর্থাৎ পয়গাম্বর) পথভ্রষ্ট কিংবা বিপথগামী হননি। তিনি প্রবৃত্তির তাগিদে কিছু বলেন না। বরং তাঁর ওপর যে অহী অবতীর্ণ হয়, তিনি শুধু তা-ই বলেন।" – আন্ নাজম ঃ ১-৪

(٥) اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ط- (انعام : ٥٠)

"আমার ওপর যে অহী অবতরণ করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি।"-আন্ আমঃ ৫০

(٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ – (الاحزاب : ٢١)

"রসূলুল্লাহ্র জীবনে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

www.bjilibrary.com

(৭) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-(ال عمران :٣١)

"হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাও তবে আমার আনুগত্য করো; তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন।"

(৮) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ * (النور : ٥١) وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط- (النور: ٥٤)

"ঈমানদার লোকদের কাজ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে – যাতে করে (রসূল) তাঁদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন– তখন তারা বলবে যে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। বস্তুত এমন লোকেরাই হচ্ছে কল্যাণপ্রাপ্ত। ..... আর তোমরা যদি তার (রসূলের) আনুগত্য করো, তবেই সৎপথের সন্ধান পাবে।"–আন্ নূরঃ৫১

(৯) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *-(النساء:٦٥)

"অতএব তোমার প্রভুর শপথ! তারা আদৌ মুমিন নয়, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক ব্যাপারে তোমাকেই বিচারকরূপে গ্রহণ করবে। অতপর তুমি যে ফায়সালা করে দিবে, সে সম্পর্কে তাদের মনে এতটুকু অসন্তোষ স্থান দিতে পারবে না বরং তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে।" আন্ নিসাঃ ৬৫

(١٠) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا *- (الاحزاب : ٣٦)

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন নিজেদের ব্যাপারে কোনো ভিন্ন ফায়সালা করার অধিকার কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করলো, সে স্পষ্টতর গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।"–আল–আহযাব ৩৬

www.bjilibrary.com

এই আয়াতগুলো সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করলেই সকল তাৎপর্য আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

১। প্রথম আয়াতে নবী ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে এবং নবীর প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন কেন, তাও নির্দেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার নীতি এই যে, তিনি প্রতিটি মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে অদৃশ্য (বা গায়েব) বিষয়ক জ্ঞান সরবরাহ করেন না। বরং নিজের কোনো বিশিষ্ট বান্দাকে তিনি এ সম্পর্কিত জ্ঞান তথ্য সরবরাহ করেন। এ কারণেই সেই বিশিষ্ট বান্দার প্রতি ঈমান আনা সাধারণ মানুষের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।[১]

২। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলের প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যে কেবল তাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে বিশ্বাস করাই নয়, বরং সেই সঙ্গে তার আনুগত্যও প্রয়োজন। এ আনুগত্যের হুকুম সর্বত্রই অবাধ—কোথাও সীমিত নয়। কুরআনের কোনো একটি জায়গায়ও বলা হয়নি যে, অমুক অমুক ব্যাপারে রসূলের আনুগত্য করতে হবে এবং এ ছাড়া অন্য কোথাও আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। বরং কুরআন থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাঁর রসূল হচ্ছেন এক ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক (Governor General)। তিনি যে আদেশই দেন, মুমিনদের পক্ষে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে নিজের শাসন ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমিত করা এবং তার বাইরে লোকদেরকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দেয়া খোদ রসূলেরই ইখতিয়ার। মুমিনদের পক্ষে তার শাসন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করার আদৌ কোনো অধিকার নেই। কারণ মুমিন হচ্ছে একান্তভাবেই তার আজ্ঞাবহ ও আদেশানুগত প্রজা। তিনি যদি তাদেরকে চাষাবাদ, মিস্ত্রিগিরি, কামারগিরি ইত্যাদি পেশার কোনো একটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিতেন তাহলেও বিনা শর্তে তার আনুগত্য করা মুমিনদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হতো।

৩। লোকদেরকে যখন সীমাহীন ও শর্তহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন নবীর আনুগত্য যে একজন সাধারণ মানুষের আনুগত্য নয়—মূর্খ কাফেরদের যেমন ধারণা ছিলো—বরং এ আল্লাহ্‌রই আনুগত্য, এ নিশ্চয়তা

---

১. অর্থাৎ রসূল নিজের থেকেই আনুগত্য লাভের উপযোগী নন রবং আল্লাহর অনুমতি কিংবা তাঁর নির্দেশক্রমেই আনুগত্য লাভের উপযোগী হয়ে থাকেন।

www.bjilibrary.com

প্রদান করাও একান্ত প্রয়োজন ছিলো। বস্তুত আজকের দিনের এক শ্রেণীর মানুষের মত অতীতের কাফেররাও এ কথাই বলতোঃ هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ "এ কি তোমাদের মতোই একজন মানুষ নয়?" مَاهٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ "এ তোমাদের মতোই একজন মানুষ বৈ কিছু নয়। এ তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়।" يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ط-(مومنون : ٢٤)

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ *-(مومنون : ٣٤)

-"তোমরা যদি নিজেদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতির মধ্যে থাকবে। কারণ নবী যা কিছু বলেন, আল্লাহর তরফ থেকেই বলেন আর যা কিছু করেন, আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই করে থাকেন। তিনি আপন প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছুই বলেন না"– তিনি শুধু আল্লাহ্‌র প্রেরিত অহীরই অনুবর্তন করেন। কাজেই তার অনুবর্তনে কোনোরূপ গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতার আশংকা নেই–এ সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চিত থাকা উচিত।[১]

এ বিষয়টিই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে। চর্তুথ ও পঞ্চম আয়াতে উল্লেখিত অহী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে আর কিতাব ছাড়া নবীর ওপর অন্য কোনো অহী হয় না। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। খোদ কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীদের ওপর শুধু কিতাবই নাযিল করা হতো না বরং তাদের হেদায়াত ও পথনির্দেশের জন্যে আল্লাহ্‌ তায়ালা হামেশাই অহী নাযিল করতেন। এ অহীর আলোকেই তারা সোজা ও সরল পথে চলতেন, যে কোনো বিষয়ে নির্ভুল মতামত গঠন করতেন এবং নানারূপ কলাকৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন।

---

১. গায়েব হচ্ছে এমন কতকগুলো অননুভূত মৌল সত্য, যেগুলো সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ না করলে দুনিয়ার মানব জীবনের জন্যে কোনো সঠিক কর্মপদ্ধতি তৈরি করা সম্ভবপর নয়। যেমনঃ মানুষের আদি কারণ কি? মানুষ কি স্বাধীন, না পরাধীন? পরাধীন হলে কার অধীন? আপন মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিরূপ? মনিবের সামনে কি তাকে কখনো জবাবদিহি করতে হবে? জবাব দিতে হলে কোথায়, কিভাবে, কি কি বিষয়ে দিতে হবে? এই জবাবদিহিতে সাফল্য বা ব্যর্থতার কি ফলাফল হবে। এই প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব কোনো আনুমানিক জনাব নয় বরং নিশ্চিন্ত ও জ্ঞানগর্ভ জবাব না পাওয়া পর্যন্ত মানব জীবনের জন্যে কোনো কর্মপ্রণালী তৈরি করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে এই জ্ঞানকেই আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

www.bjilibrary.com

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। হযরত নূহ (আ) প্লাবনের আলামত বুঝেই আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে এবং তার অহী অনুসারে নৌকা তৈরি করেন। (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا – (هود: ٣٧) হযরত ইবরাহীম (আ) –কে আসমান ও জমীনের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করানো হয় এবং মৃতকে জীবিত করার নিদর্শন দেখানো হয়। হযরত ইউসুফ (আ)–কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেয়া হয়। (ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ – يوسف : ٣٧) হযরত মূসা (আ)–এর সঙ্গে তূর পর্বতে কথা বার্তা বলা হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ তোমার হাতে ওটা কি জিনিস? তিনি বললেনঃ এ আমার লাঠি, এর দ্বারা আমি ছাগল চরিয়ে থাকি। আদেশ করা হলোঃ ওটি তুমি ছুড়ে মারো। অতপর লাঠি অজগরে পরিণত হলে হযরত মূসা (আ) ভয়ে ছুট দিলেন। তখন বলা হলোঃ

يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ق اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ *– (قصص : ٣١)

"হে মূসা! ভয় কোরোনা, সামনে এগিয়ে এসো; তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।" পুনরায় নির্দেশ দেয়া হলোঃ (٢٤ : طٰهٰ) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى*– "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে।" তিনি এ কাজে সাহায্যের জন্যে হারুন (আ)–কে প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। উভয় ভ্রাতা ফেরাউনের কাছে যেতে ভয় পেলে এরশাদ করা হলোঃ (٤٦ : طٰهٰ) لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى *– "ভয় কোরোনা, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি সবকিছু দেখি এবং শুনি।" ফেরাউনের দরবারে সাপ দেখে হযরত মূসা (আ) ভয় পেয়ে গেলেন। তখন অহী নাযিল হলোঃ (٦٨ : طه) لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى*– "ভয় পেওনা, তোমাদের কথাই সমুন্নত হবে।" অতপর ফেরাউনের প্রতি যুক্তি প্রমাণ পূর্ণ করা হলে তাকে আদেশ দেয়া হলোঃ اَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ "আমার বান্দাদের নিয়ে রাতারাতি যাত্রা করো, তোমাদের পেছন ধাওয়া করা হবে।" এভাবে তিনি সমুদ্র তীরে পৌছলে নির্দেশ দেয়া হলোঃ اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط– (شعرا: ٦٣) –"সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠির আঘাত করো।"

এখন প্রশ্ন হলোঃ এর কোনো একটি অহীও কিতাব আকারে জনসাধারণের হেদায়াতের জন্যে নাযিল হয়েছে? এ দৃষ্টান্তগুলো থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নবীদের প্রতি আল্লাহ্‌ তায়ালা হামেশা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং মানবিক চিন্তা ও মতের ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন প্রতিটি ব্যাপারেই তাদেরকে অহীর দ্বারা পথ নির্দেশ করতেন। কিন্তু তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের

www.bjilibrary.com

হেদায়াতের জন্যে যে অহী নাযিল হতো এবং যা আল্লাহ্‌র হেদায়াত নামা ও কর্মপ্রণালী হিসেবে সংরক্ষণের জন্যে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করা হতো– এ ছিলো তা থেকে স্বতন্ত্র অহী।

এরূপ প্রচ্ছন্ন অপঠিতব্য অহী নবী করীম (স)–এর ওপরও নাযিল হতো। এর প্রতি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা বানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কিতাবুল্লাতে কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু এ কেবলাকে বাতিল করে যখন 'বায়তুল হারামকে' (কাবা শরীফ) কেবলা বানাবার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন এরশাদ হলোঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط– (البقره : ١٤٣)

"তোমরা যে কেবলার দিকে ছিলে, তাকে শুধু রসূলের অনুবর্তনকারী ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যেই আমরা নির্ধারণ করেছিলাম।"

এ থেকে জানা গেলো যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথমে অহীর ভিত্তিতেই কেবলাহ বানানো হয়েছিলো।

ওহোদ যুদ্ধের কালে হযরত মুসলমানদেরকে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্যের জন্যে ফিরেশতা পাঠাবেন। পরে আল্লাহ্ তায়ালা হযরতের এই আশ্বাসকে কুরআনে নিম্নোক্ত ভাষায় উলেখ করেনঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ – (ال عمران : ١٢٦)

"আল্লাহ্ এ ওয়াদাকে তোমাদের জন্যে সুসংবাদ বানিয়েছেন।"

এর দ্বারা স্পষ্টত বোঝা গেলো যে, এ ওয়াদাটি ছিলো মূলত আল্লাহ্ তালায়ার।

ওহোদ যুদ্ধের পর নবী করীম (স) দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের জন্যে লোকদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ কুরআনের কোথাও উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরে এ মর্মে নির্দেশটি অনুমোদন করেন যে, এটিও ছিলো তাঁরই তরফ থেকে ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ –

www.bjilibrary.com

"যারা যুদ্ধে আহত হবার পর পুনরায় আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে।"–আলে ইমরান ঃ ১৭২

বদর যুদ্ধকালে মদীনা থেকে হযরতের যাত্রা করার কথা নিম্নরূপ ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ – (انفال : ٥)

"যেভাবে তোমার রব তোমায় নিজের গৃহ থেকে বের করেছেন।"

রসূলের গৃহত্যাগের আদেশ কুরআনে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু পরে আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে স্বীকৃতি দান করেন যে, এ গৃহত্যাগও ছিলো তাঁরই আদেশক্রমে—রসূলের ইচ্ছানুসারে নয়।

অতপর ঠিক যুদ্ধের সময় আল্লাহ তায়ালা নবীকে স্বপ্ন দেখালেনঃ

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط– (انفال :٤٣)

"যখন আল্লাহ্ তাদেরকে সংখ্যালঘু বানিয়ে তোমায় স্বপ্নযোগে দেখাচ্ছিলেন।"

মুনাফিকরা রসূলে করীম (স) এর ছদকা বন্টন সম্পর্কে নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলো। তখন আল্লাহ তায়ালা এ সত্য উদঘাটন করলেন যে, এ বন্টন খোদ আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুসারেই সম্পাদন করা হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ لا– (توبه : ٥٩)

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যে অংশ দিয়েছেন, তারা যদি তাতে সন্তুষ্ট হতো।"–আত্ তাওবাঃ ৫৯

হোদায়রিয়া সন্ধির কালে সমস্ত সাহাবী সন্ধিচুক্তির বিরোধী ছিলেন। কারণ সন্ধির শর্তাবলী প্রত্যেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নবী তা গ্রহণ করেন এবং পরে আল্লাহ্ তায়ালা এ মর্মে স্বীকৃতিদান করেন যে, এ সন্ধি তাঁরই তরফ থেকে ছিলো।

اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ‎* – (فتح : ١)

"আমরা তোমায় সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"–ফাতাহঃ ১

কুরআন অনুসন্ধান করলে এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে দৃষ্টান্ত বাড়ানো উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু এটুকু প্রমাণ করাই

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্য যে, নবীদের সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালার সম্পর্ক কোনো অস্থায়ী সম্পর্ক নয়। কেবল মানুষের কাছে বাণী পৌছাবার প্রয়োজন হলেই এ সম্পর্ক কায়েম হবে এবং তার পরেই ছিন্ন হয়ে যাবে–এটি এমন কোনো সাময়িক ব্যাপার নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা যাকে পয়গাম্বরীর জন্যে মানোনীত করেছেন, তার প্রতি তিনি হামেশাই একটি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলতে পারেন এবং তার দ্বারা আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরোধী কোনো কথা বা কাজ সম্পাদিত না হয়, এ জন্য সর্বক্ষণ তাঁকে অহীর সাহায্যে হেদায়াত ও পথনির্দেশ করেছেন। সূরায়ে নাজমের প্রাথমিক আয়াত ক'টিতে মূলত এ সত্যই অভিব্যক্ত হয়েছে। তা ছাড়া এ নিবন্ধের প্রথমাংশে যেমন বলেছি ঃ কুরআন এ সত্যও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেছে যে, নবীদের প্রতি হামেশাই আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণ আরোপিত ছিলো। তাঁদেরকে ভুল–ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আর কখনো তাঁরা মানব প্রকৃতির তাগিদে কোনো ভুল করে বসলে, কিংবা প্রচ্ছন্ন অহীর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝতে ত্রুটি করে ফেললে কিংবা নিজস্ব ইজতিহাদের সাহায্যে আল্লাহ্র ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিপরীত নীতি অবলম্বন করলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে সংশোধন করা হয়েছে– ভুল পথের গতিরোধ করে তাঁদেরকে সোজা পথে চালিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে নবী করীম এবং অন্যান্য নবীদের ছোটোখাটো ভুল–ভ্রান্তি এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার যে সতর্কবাণী উল্লেখিত হয়েছে তদ্বারা লোকদের মন থেকে নবীদের প্রতি আস্থা নষ্ট করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কিংবা নবীরাও যখন সাধারণ মানুষের মতোই (নাউজুবিল্লাহ) ভ্রান্ত, তখন তাদের প্রদত্ত বিধি–নিষেধের আনুগত্য এবং নিশ্চিন্ত মনে তাদের পথনির্দেশের অনুবর্তন কি করে সম্ভব– এটা ভাববারও কোনো অবকাশ নেই। বরং আল্লাহ্ তায়ালা যে নবীদেরকে প্রবৃত্তির বাসনা অনুসরণ কিংবা নিজস্ব মতামত ও মানবিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলবার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা দান করেননি, এটা জানিয়ে দেয়াই হলো এর উদ্দেশ্য। নবীরা যেহেতু আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের পথনির্দেশের দায়িত্বে অভিষিক্ত, এ জন্যেই তার হেদায়াত অনুসারে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকা এবং জীবনের কোনো ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও তার সন্তুষ্টির বিপরীত কাজ না করা তাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সাধারণ মানবীয় ব্যাপারে আদৌ কোনো গুরুত্ব নেই, কুরআন মজীদে এমন ব্যাপারেও রসূলে করীম (স)–এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো মানুষের মধু খাওয়া বা না খাওয়া, কোনো অন্ধের প্রতি

www.bjilibrary.com

ভ্রুক্ষেপ না করা ও তার হস্তক্ষেপের কারণে ভ্রুকুঞ্চিত করা, কারো জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর কোন্‌টি এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো? কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে এমন তুচ্ছ ব্যাপারেও নিজের মতামত কিংবা অন্যের ইচ্ছানুযায়ী চলতে দেননি।

অনুরূপভাবে যুদ্ধে যোগদান থেকে কাউকে অব্যাহতি দেয়া এবং মুক্তিদানের বিনিময়ে কোনো কোনো যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দেয়া একজন আমীর বা শাসকের জীবনে নেহাতই একটি মামুলি ঘটনা। কিন্তু নবীর জীবনে এ ঘটনাও এমন গুরত্বপূর্ণ ছিলো যে, সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এরূপ কেনো করা হয়েছে? এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌র নবী সাধারণ আমীর বা শাসকদের মতো নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন নন। বরং নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার কারণে তাঁর সিদ্ধান্তও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুরূপ হওয়া একান্ত অপরিহার্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি যদি প্রচ্ছন্ন অহীর ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে চুল পরিমাণও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা লংঘন করে বসেন, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্ট অহীর সাহায্যেই তার সংশোধন করে দেয়া প্রয়োজন মনে করেন।

৪। আমাদের সামনে নবীর এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পেছনে আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্য এই যে, নবীর সদাচরণ ও সৎপথ অনুসরণের প্রতি আমরা যেনো পুরোপুরি আস্থাবান থাকি। নবীর কথা ও কাজ সর্ববিধ গোমরাহী; কুটিলতা প্রবৃত্তির অনুসরণ এক মানবীয় চিন্তা ও মতের ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত– এটা যেনো আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখি। আমরা যেনো এও বিশ্বাস করি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীর পদক্ষেপ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর অবিচল ও সুদৃঢ়। তাঁর পবিত্র জীবন চরিত ইসলামী চরিত্রেরই এক উজ্জ্বলতম নমুনা ; সে নমুনায় কোনো অসম্পূর্ণতা বা ভুল–ভ্রান্তির অবকাশ নেই। এই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ নমুনাটি আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন যে, কেউ তাঁর মনোপুত ও প্রিয়পাত্র হতে চাইলে সে যেনো নিশংক চিত্তে এর অনুবর্তন করতে পারে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি স্পষ্টরূপে বিবৃত করা হয়েছে। এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসূলের জীবনে তোমাদের জন্যে এক 'উত্তম আদর্শ (اسوة حسنه) রয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে রসূলের অনুবর্তনকেই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হবার একমাত্র উপায় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

পরন্তু এখানে কোনো প্রকার বিশেষিক্তকরণ ও সীমিতকরণও পরিলক্ষিত হয় না। স্পষ্টতই সাধারণ ও সার্বজনীন পয়গাম পেশ করা হয়েছে। রসূলে করীমের জীবনকে এখানে সামগ্রিকভাবে 'উত্তম আদর্শ' বলা হয়েছে এবং সমগ্রভাবেই যারা তাঁর অনুবর্তন করবে–তার নির্মল, নিখুঁত জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন রাঙিয়ে তুলবে, ততো বেশী তারা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্যলাভ করবে আর আল্লাহ্ তায়ালাও ততোখানিই তাদের ভালবাসবেন।

কিন্তু রসূলে করীমের জীবনকে উত্তম আদর্শ ঘোষণা করা এবং তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার তাৎপর্য এই নয় যে, জীবনের তামাম বিষয়াদিতেই তাঁর কাজ ও কর্মের ধরনকে হুবহু অনুকরণ করতে হবে এবং তাঁর পবিত্র জীবন ধারার এমনি নকল করতে হবে যে, আসল ও নকলের পার্থক্য একেবারেই মুছে যাবে। কারণ কুরআনের উদ্দেশ্য এটা নয়, আর এ হতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ একটি সাধারণ ও সার্বজনীন আদেশ ; এটি পালন করবার নির্ভুল পন্থা খোদ নবী করীম (স) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত কর্মনীতি থেকেই জানা যেতে পারে। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে সংক্ষেপে বলা চলে ঃ যে বিষয়গুলো ফরয, ওয়াজিব তথা ইসলামের ভিত্তিতুল্য, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ; পাক না পাক ইত্যাদি– সেগুলোতে হযরতের কথা ও কাজ হুবহু অনুসরণ করা প্রয়োজন। এসব ব্যাপারে তিনি যেসব আদেশ দিয়েছেন এবং যে যে ভাবে নিজে আমল করে দেখিয়েছেন, তার যথাযথ অনুবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। এ ছাড়া ইসলামী জীবনধারার বাকী বিষয়গুলো– যেমন তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং খুঁটিনাটি সামাজিক বিষয়াদি হচ্ছে সাধারণ নির্দেশের আওতাভুক্ত। এর কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে হযরত সরাসরি আদেশ দিয়েছেন কিংবা সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। কতকগুলো ব্যাপারে তিনি নৈতিকতা, বিচক্ষণতা ও ভদ্রতার শিক্ষা দিয়েছেন। আর কতকগুলো বিষয়কে সামনে রেখে আমলের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি ইসলামী ভাবধারার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ– তা অনায়াসেই আমরা জানতে পারি। কাজেই কেউ সদিচ্ছার সাথে হযরতের অনুসরণ করতে হলে এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁর সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে কোন্ কোন্ বিষয় তার হুবহু অনুকরণ করা উচিত, কোন্ কোন্ ব্যাপারে তার কথা ও কাজ থেকে মূলনীতি উদ্ভাবন

www.bjilibrary.com

করে আইন-কানুন তৈরী করা উচিত, আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তার সুন্নাহ থেকে নৈতিকতা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণমূলক সাধারণ নীতি প্রণয়ন করা উচিত—এসব কথা জানা মোটেই কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা হচ্ছে বিরোধপ্রিয়, তারা এর মধ্যে নানারূপ কূটতর্ক বের করে থাকে। তারা বলে যে, রসূলে করীম (স) আরবী ভাষায় কথা বলতেন, এখন আমরাও কি আরবী বলবো? তিনি আরব নারী বিয়ে করেছিলেন, আমরাও কি আরবদের মধ্যে বিয়ে শাদী করবো? তিনি এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতেন, আমরাও কি সেই ধরনেরই পোশাক পরবো? তিনি এক বিশেষ প্রকার খাদ্য খেতেন, আমরাও কি সেই খাদ্য খাবো? তাঁর সামাজিকতার একটি বিশেষ রীতি ছিলো, আমরাও কি হুবহু সেই সমাজরীতি গ্রহণ করবো?

কিন্তু এ লোকগুলো একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখতে পেতো যে, আসল জিনিস তার ভাষা নয় বরং যে নৈতিক সীমারেখা তিনি কথাবার্তায় হামেশা মেনে চলতেন, তাই হচ্ছে আসল। অনুরূপভাবে আরব বা অনারব নারীকে বিয়ে করাই আসল জিনিস নয় বরং যে কোনো নারীকেই বিয়ে করা হোক না কেন, তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে তার অধিকার আদায় করতে হবে, শরয়ী ইখতিয়ারকে কিভাবে তার ওপর প্রয়োগ করা যাবে, সেটাই হলো আসল জিনিস। রসূলে করীম (স) তার পুন্যবতী স্ত্রীদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করতেন, মুসলমানদের ঘরোয়া জীবনের জন্যে তার চাইতে উত্তম আদর্শ আর কী হতে পারে? তাছাড়া তিনি যে ধরনের (কাটিং) পোশাক পরতেন, তা-ই সুন্নাতী ও শরয়ী পোশাক, যে খাদ্য তিনি খেতেন, তা-ই মুসলমানদের খাওয়া উচিত—এ কথাই বা কে বললো? প্রকৃতপক্ষে খানাপিনা ও পোশাক পরিচ্ছদে তিনি তাকওয়া, পরহেজগারী ও পবিত্রতার যে সীমারেখা মেনে চলতেন, তা-ই হচ্ছে অনুসরণ ও অনুকরণ- যোগ্য। আর কুরআন আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়া পূজার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনের যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দিয়েছে, সে সম্পর্কে আমল করার পদ্ধতিও আমরা এসব সীমারেখা থেকেই জানতে পারি। হযরতের ব্যক্তিগত (Private) ও সামাজিক জীবনের অন্যান্য বিষয়াদির ব্যবস্থা অনুরূপ। বস্তুত তাঁর গোটা জীবনই ছিলো একটি সত্যিকার আল্লাহ্ভীরু মুসলিম জীবনের জন্যে উত্তম আদর্শ। হযরত আয়েশা (রা) তাই যথার্থই বলেছেন ঃ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

www.bjilibrary.com

–তোমরা যদি জানতে চাও যে, কুরআনের শিক্ষা ও ভাবধারা অনুযায়ী দুনিয়ায় একজন মুমিনের কিরূপ জীবন যাপন করা উচিত, তাহলে মুহাম্মদ (স)–এর জীবনের প্রতি তাকাও। আল্লাহ্‌র কিতাবে যে ইসলাম সংক্ষিপ্তকারে রয়েছে, আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে তাই তোমরা বিস্তারিতভাবে দেখতে পাবে।

সুখের বিষয় যে, বন্ধুবর গোলাম আহমদ পারভেজ এ শ্রেণীর লোকদের অন্তর্গত নন।[১] তবে কতিপয় হাদীস থেকে তার মনে এ সন্দেহ জেগেছে যে, 'হযরত সকল সময় ও সর্বাবস্থায় রসূল ছিলেন না এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ রসূল হিসেবে সম্পাদিত হতো না' যেসব রেওয়ায়েত থেকে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, মূলত তা আর একটি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। তাহলো এই যে, নবী করীম (স) সকল সময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র রসূলই ছিলেন আর নবী হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যই ছিলো এই যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, হামেশা তার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, তাঁর নবুয়াতের পেছনে লোকদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করা এবং তাদের বিচার–বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার কোনোই উদ্দেশ্য ছিলো না। দুনিয়াকে তিনি চাষাবাদ ও শিল্প–বাণিজ্য শেখাবার জন্যে আসেননি। লোকদের দুনিয়াবী কাজ কারবার ও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে পথনির্দেশ করার জন্যেও তিনি প্রেরিত হননি। তাঁর জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, আর তাহলো ইসলামকে প্রত্যয় হিসেবে লোকদের মনে বদ্ধমূল করা এবং আমল হিসেবে তাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রবর্তিত করা। এ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো জিনিসের প্রতি হযরত কখনো এতোটুকু ভ্রুক্ষেপ করেননি। আর কদাচিত কখনো কিছু বললে স্পষ্টত জানিয়ে দিতেন যে, তোমরা চিন্তা ও কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন, সুতরাং যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো–وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ যদিও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতিটি কথাকে রসূলের কথা ভেবে মনেপ্রাণে তাঁর আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন এবং সামগ্রিকভাবেই তাঁকে আনুগত্য ও অনুবর্তন লাভের উপযোগী মনে করতেন ; কিন্তু তবুও তাঁর নবুয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়–এমনতরো বিষয়ে তিনি কখনো সাহাবাদেরকে

---

১ . এটা ছিলো গোলাম আহমাদ পারভেজ সম্পর্কে লেখকের ৩৩ বছর পূর্বেকার ধারণা। কিন্তু আজকের পারভেজ সাহেব আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সুন্নাহ বিরোধিতায় তিনি এখন বহুদূর এগিয়ে গেছেন। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

কোনো নির্দেশ দেননি কিংবা তাদের আনুগত্যের জন্যে বাধ্য করেননি। বস্তুত সুদীর্ঘ ২৩ বছর কালে একটি মুহূর্তের তরেও তিনি নিজের মিশন (জীবন লক্ষ্য) থেকে গাফেল হননি। প্রতিটি মুহূর্তই তিনি এই মিশনের সাথে সম্পৃক্ত ও সম্পৃক্ত বিষয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পরন্তু নিজের অনুবর্তীদের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তিনি কখনো কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেননি। এ সব বিষয় এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, নবুয়াতের মর্যাদা থেকে হযরত কখনোই বিচ্যুত হতেন না।

কিন্তু তাই বলে পার্থিব বিষয়াদিতে তিনি যা কিছু বলতেন, তার কোনোটাই আল্লাহ্‌র অহী ছিলো না–এরকম ধারণা করাও ঠিক নয়। তার এ ধরনের কথাগুলো অবশ্য তার বিধি–নির্দেশ নয়। কারণ এগুলো যেমন তিনি নির্দেশের ভঙ্গিতে বলেননি, তেমনি কেউ সেগুলোকে নির্দেশও মনে করেননি। কিন্তু তবুও তার পবিত্র জবান থেকে যে কথাই বেরুতো তা পুরোপুরি অভ্রান্ত ছিলো– এবং তাতে ভ্রান্তির কোনো গন্ধ পর্যন্ত ছিলো না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তার প্রামাণ্য কথাগুলো এমন সব বিচক্ষণ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ, যা দেখে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন আরবের এক নিরক্ষর (উম্মী) ব্যক্তি। তিনি চিকিৎসক হওয়া তো দূরের কথা কোনো দিন চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা– গবেষণা পর্যন্ত করেননি। এতৎসত্ত্বেও শত শত বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই শাস্ত্রটির যেসব মূল রহস্য আজ উদঘাটিত হচ্ছে, সেগুলোর তিনি সন্ধান পেলেন কি করে তা ভাবতে অবাক লাগে। তার জ্ঞানগর্ভ কথাগুলোতে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। তার কথানুযায়ী এ বিষয়গুলো যদিও নবুয়াত প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলো না; কিন্তু আল্লাহ্‌ তার নবীদের মধ্যে যে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার করেছিলেন, তা নবুয়াতের কাজেই ব্যবহৃত হয়নি বরং তা প্রতিটি ব্যাপারে নবীর বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরেছে। কামারগিরি ও কৃষিকাজের সঙ্গে নবুয়াত প্রচারের কি সম্পর্ক? কিন্তু হযরত দাউদ এ ব্যাপারে অসাধারণ নৈপুন্য দেখিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই বলছেন যে, এই বিশেষ শিল্পকর্ম আমরাই তাকে শিখিয়েছিলাম–

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ج– (انبيا : ٨٠)

পাখীর ভাষা জানার সঙ্গে নবুয়াত প্রচারের কি সম্বন্ধ? কিন্তু হযরত সুলায়মান এ ব্যাপারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি নিজে বলছেন–

www.bjilibrary.com

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ – (النمل : ١٦)

মিস্ত্রিগিরি ও নৌকা তৈরীটা নবুয়াত প্রচারের কোন্ অংশভুক্ত? কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ (আ) –কে শুধু একটি মজবুত নৌকা তৈরী করতেই বলেননি বরং তিনি বলেছিলেন–

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا– (هود : ٣٧)

কাজেই নবীদের ওপর শুধু সরাসরি নবুয়াত প্রচার সংক্রান্ত অহীই নাযিল হতো, এরূপ ধারণা করা মোটেই ঠিক নয়। তাদের গোটা জীবনই ছিলো আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়াতের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ব্যাপারে শুধু এটুকুই পার্থক্য করা যেতে পারে যে, জীবনের এক অংশে তাদের পায়ে পায়ে চলা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য শর্ত। আর অপর অংশে তাদের অনুবর্তন প্রতিটি মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার মনোনীত প্রিয় পাত্র হতে চায়, চায় তার নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন করতে তার পক্ষে নবীর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন কি, এ ব্যাপারে যদি সে এক চুল পরিমাণও পিছু হটে যায়, তবে নৈকট্য ও ভালবাসায় সেই পরিমাণই অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। কারণ আল্লাহ্র ভালবাসায় নবীর অনুবর্তন ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই–

فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ – (ال عمران : ٣١)

৫। এ আলোচনার পর নবীর নেতৃত্ব (ইমারত) ও অন্যান্য (আমীরের) নেতৃত্বের মধ্যকার পার্থক্যটা স্বভাবতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নবীর ফায়সালা ও অন্যান্য বিচারকের ফায়সালার মধ্যে কি বিরাট তফাত রয়েছে, তাও এ থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আমি এমন তিনটি আয়াত উদ্ধৃত করেছি, যদ্বারা এ পার্থক্য চূড়ান্তরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলের আদেশের সামনে মাথা নত করা এবং তাঁর ফায়সালাকে স্বীকার করে নেয়া ঈমানের জন্যে অপরিহার্য শর্ত। যে ব্যক্তি একে অস্বীকার করবে, সে কিছুতেই মুমিন হতে পারবে না। অন্য কোনো শাসক বা বিচারক কি এহেন মর্যাদার অধিকারী? যদি তা না হয়, তাহলে কুরআনের যেসব জায়গায় আল্লাহ্ ও রসূল শব্দ দু'টি একত্রে উল্লেখিত হয়েছে, তদ্বারা শুধু নেতৃত্ব বা ইমারতকেই বুঝানো হয়েছে–এ ধরনের কথা কতোখানি ভ্রান্ত

www.bjilibrary.com

হতে পারে! বস্তুত মাওলানা জয়রাজপুরীর এ উক্তি সম্পর্কেই আমার ঘোরতর আপত্তি এবং আমি একে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে করি। এরপর পারভেজ সাহেব যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, সেটি একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন এবং এ প্রশ্নে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমিও স্বীকার করি যে, রসূলে করীম (স) –এর পর ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের(اولی الامر)আনুগত্য করা ওযাজিব। কারণ রসূলে করীম (স) তাঁর জীবদ্দশায় যেসব কর্তব্য সম্পাদন করতেন, ইসলামী রাষ্ট্রনায়কও ঠিক তা–ই করবেন। কাজেই সামগ্রিক বিষয়াদিতে তার ফায়সালাই হবে চূড়ান্ত ফায়সালা। এমন কি কেউ যদি নিজের জ্ঞান মতে তার ফায়সালাকে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম বিরুদ্ধও মনে করে তবুও এক বিশেষ সীমা পর্যন্ত নিজের মতে অবিচল থেকেও তার ফায়সালা মেনে নেয়া তার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু তার অর্থ কখনোই এটা হতে পারে না যে, কুরআনে, 'আল্লাহ্ ও রসূল' বলে উল্লেখিত চিন্তাটিই হচ্ছে ইমারত, কিংবা আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি–নিষেধই হচ্ছে হুবহু ইমারতের বিধি–নিষেধ। এটাই যদি হয় তবে আমীর বা রাষ্ট্রনায়ক নীতিচ্যুত হলে এবং তার পারিষদবর্গ কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও মুসলমানদের পক্ষে তাদের আনুগত্য করা এবং ধ্বংস ও বিনাশের পথে তাদের অনুবর্তন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমতাবস্থায় কোনো আল্লাহ্র বান্দাহ যদি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে বাধা প্রদান করে, তবে মাওলানা জয়রাজপুরীর ফতোয়া অনুসারে শাসকবর্গ তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে হত্যা করার অধিকার পর্যন্ত পাবে। এমন কি তাদের এতোখানি বলার দুঃসাহস হবে যে, 'আল্লাহ্ ও রসূল' তো আমরাই আবার আর কার দিকে তুমি আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করাতে চাও?

(প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৩৫)

www.bjilibrary.com

হাদীস ও কুরআন

১৯৩৪ সালের কথা। জনৈক ভদ্রলোক 'কেনো আমি হাদীস অবিশ্বাসী হয়েছি'—এই শিরোনামায় একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেন।[১] তাতে লেখক নিজের নাম প্রকাশ না করে 'সত্যভাষী'[২] উপাধি ধারণ করেন। এই 'সত্যভাষী' সাহেবেরই 'হাদীস অধ্যয়ন' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং তার কতিপয় অংশ আমাদেরও দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তার যুক্তিগুলো প্রায় হাদীস অবিশ্বাসীদের যুক্তিতর্কেরই অনুরূপ। তার বক্তব্যের সারমর্ম হলো ঃ আমাদের জন্যে কুরআনই যথেষ্ট। হাদীসের বর্ণনাগুলো অপ্রামাণ্য ও অনির্ভরযোগ্য। তার ওপর ধর্মের ভিত্তি রাখা ঠিক নয়। 'সত্যভাষী' সাহেব ও তার সমর্থক হাদীস অবিশ্বাসীদের মতে, হাদীস থেকে ইসলামের আদৌ কোনো ফায়দা হয় না। বরং তার বিপরীত এই বস্তুটি ইসলামের ওপর হামলা চালাবার জন্যে ইসলামের শত্রুদেরকে অস্ত্র যুগিয়ে থাকে। এ কারণেই তারা ইসলামের চৌহদ্দী থেকে হাদীসকে বহিষ্কার করার অভিলাষী এবং একে তারা ইসলামের এক বিরাট খেদমত বলে মনে করে।

'সত্যভাষী' সাহেব হাদীসের গ্রন্থাবলী থেকে বহুতরো তথ্য পেশ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শত্রুরা কিভাবে ইসলাম ও নবুয়াতের ওপর হামলা চালাবার জন্যে হাদীস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। যেমন কোনো কোনো হাদীস কুরআনের বিকৃতির পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। কোনো কোনোটি থেকে এ অভিযোগ সমর্থিত হয় যে, অহীর অবতরণ ছিলো একটি ভান মাত্র, আসলে রসূলে করীম (স) কিতাবীদের কাছ থেকে যা শুনতেন, তা-ই অহী বানিয়ে পেশ করতেন (মায়াজাল্লাহ)। কোনো কোনোটি থেকে মনে হয়, অহী রসূলে করীম (স)-এর ব্যক্তিগত কামনা ও আকাংখা অনুযায়ী নাযিল হতো। কোনো কোনোটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে করীম (স)-

---

১. পুস্তিকাটি 'উম্মাতে মুসলেমা' অফিস, অমৃতসর থেকে প্রকাশিত।

২. এই ছদ্মবেশী ভদ্রলোক হচ্ছেন সাবেক ইউপির একজন মুসলমান ডেপুটি কালেক্টর। এরই বিকৃত চিন্তাধারা সম্পর্কে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব পুস্তকের 'যুক্তিবাদের প্রতারণা' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। -অনুবাদক

www.bjilibrary.com

এর যাদুক্রিয়া প্রভাবশীল হতো। কোনো কোনোটি থেকে জানা যায় যে, রসূলে করীম (স) তার বিরুদ্ধবাদীদের গোপনে হত্যা করাতেন (কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা)। কোনো কোনোটি দ্বারা রসূলে করীম (স)–এর ওপর যুলুম ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আরোপিত হয় (উকুল ও আরিনাবাসীদের হত্যা)। কোনো কোনোটি থেকে রসূলে করীম (স)–এর বিরুদ্ধে আত্মপূজা ও স্বার্থপরতার অভিযোগ নির্গত হয়। এ প্রসঙ্গে লেখক রসূলে করীম (স)–এর ওপর 'সারদা আইন' পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন এবং যেসব হাদীস থেকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)–কে নয় বছর বয়সে বিবাহ করার ঘটনা প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে তিনি এক কথায় অপ্রামাণ্য ও অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করে দিয়েছেন। এরপর লেখক হাদীস শাস্ত্রের ওপর পাইকারীভাবে হামলা চালিয়েছেন। তার মতে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হাদীস প্রচার নিষিদ্ধ ছিলো। অতপর বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের শাসনকালে হাদীস বর্ণনার ধারাক্রম শুরু হয়। এবং রাজা বাদশাদের রাজনৈতিক স্বার্থে নানারূপ হাদীস তৈরী করা হয়। লেখকের মতে, ইমাম হাসান বছরী, ইমাম জুহরী, ইমাম মালেক, সিহাহ সিত্তার সঙ্কলকগণ এবং হাদীস গ্রন্থাবলীর অন্যান্য প্রণেতারা সবাই ছিলেন মিথ্যা হাদীস প্রস্তুতকারী। তারা খেয়ালখুশী মতো নানারূপ বর্ণনা জমায়েত করে ইসলামকে বিকৃত করে ফেলেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও হাদীসের মধ্যে ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ, মাজুসীবাদ (অগ্নিপূজা) এবং অন্যান্য ধর্মের আকীদা ও কুসংস্কার প্রবেশ লাভ করেছে। লেখকের দৃষ্টিতে, পাঁচ ওয়াকত নামায, ত্রিশ দিন রোযা, পুলছিরাত ও মিজানের কল্পনা, পশু জবাইর নিয়মাবলী, পানাহারের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপ, খতনা, কুরবানী, পবিত্রতার নিয়মাবলী , চিত্র ও মূর্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা, মিরাজের কাহিনী ইত্যাকার বহুতরো জিনিস মুহাদ্দিসরা অন্যান্য ধর্ম থেকে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে রসূলুল্লাহর প্রতি আরোপ করে ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

লেখকের দৃষ্টিতে ফিকাহ শাস্ত্রকারগণও নিন্দার যোগ্য। কারণ তারাই ইয়াহুদীদের কাছ থেকে শরীয়াতের ধারণা নিয়ে ইসলামের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। জীবনের সমগ্র ব্যাপারে ধর্মকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। ইরাকের তৎকালীন পরিবেশে এবং হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের অবস্থা অনুসারে যেসব আইন–কানুন রচিত হয়েছিলো, সেগুলোকে রসূলে করীম (স)–এর প্রতি আরোপ করে ধর্মীয় আইন বিধানে পরিণত করেছেন। এভাবে ইসলাম ধর্ম 'জাতীয় শরীয়াতে'র (জীবন বিধান) নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ার ফলে দুনিয়ায় তার

www.bjilibrary.com

প্রচার ও প্রসারে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—অন্যান্য জাতির অনুবর্তনের থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। লেখকের মতে, ধর্মকে (অর্থাৎ চিন্তাবিশ্বাস) শরীয়াত (অর্থাৎ জীবন বিধান) থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে সেন্টপল এবং তার অনুবর্তীদের ধারণাই যথার্থ। কারণ এ বস্তুটির দরুনই দুনিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করেছে। লেখকের মতে খোদ রসূলে করমী (স)–ই নাকি শরীয়াতের বেড়াজাল ছিন্ন করা এবং জীবনের তাবৎ বিষয়াদিতে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার জন্যেই দুনিয়ায় এসেছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে এ আয়াত পেশ করা হয়েছে ঃ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط– লেখকের দৃষ্টিতে, আয়াতে উল্লেখিত اغلال (বেড়াজাল) বলতে 'শরীয়াতের বেড়াজাল'কে বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন যে, ফিকাহ শাস্ত্রকার ও মুহাদ্দিসগণ রসূলে করীম (স)–এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই শরয়ী বেড়াজালকে—যা ছিন্ন করার জন্যেই নবী করীম (স)–এর আবির্ভাব হয়েছিলো—আবার মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা ইয়াহুদীদের অনুকরণে মনগড়া হাদীস বর্ণনা ও 'শরীয়াত প্রণয়ন' করেছেন। লেখকের মতে, এসব কিছু করার উদ্দেশ্য হলো, ইয়াহুদী পাদ্রীদের ন্যায় এরা মুসলমানদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তারা অবৈধভাবে রসূলে করীম (স)–এর নাম ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, লেখক তার এসব মতবাদ ঐতিহাসিক যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। অথচ হাদীসের বর্ণনা অনির্ভরযোগ্য হলে ইতিহাস তার চাইতেও বেশী অনির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসে তো আমাদের যুগ থেকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম কিংবা ইমাম—মুহাদ্দিসদের যুগ পর্যন্ত প্রমাণিকতার—লেখকের দৃষ্টিতে তা যতোই সন্দেহজনক হোক, একটা পূর্ণ সিলসিলা বর্তমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে প্রমাণিকতার কোনো অস্তিত্বই নেই। যে প্রাচীন গ্রন্থাবলীকে তিনি ইতিহাসের সবচাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য উৎস মনে করেন, সেগুলো যে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারগণই লিখেছেন—এ সম্পর্কে তার কাছে কোনো প্রমাণই বর্তমান নেই। অনুরূপভাবে ঐ গ্রন্থগুলোতে যেসব অবস্থার কথা লিখিত হয়েছে, সেগুলোর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও কোনো প্রমাণিকতা তার কাছে উপস্থিত নেই। কাজে হাদীসের ধারাবাহিকতা ও বর্ণনার প্রমাণিকতাকে যদি এতো সহজেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে ইতিহাসের গোটা সূত্রকে তার চাইতেও সহজে নাকচ করে দেয়া

www.bjilibrary.com

যেতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, দুনিয়ায় আরববাসীদের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। উম্মী সালতানাত কোনো দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্ব নেহাতই একটি কল্পিত কাহিনী মাত্র।

ফলকথা, যে দলিলের সাহায্যে লেখক হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান, তার চাইতেও শক্তিশালী দলিলের সাহায্যে ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করা যেতে পারে। কারণ হাদীসের সূত্রগুলো যতোখানি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য, দুনিয়ার কোনো প্রাচীন ঘটনার সূত্রই ততোখানি প্রমাণ্য নয়। এমতাবস্থায় সেই হাদীসও যদি অনির্ভযোগ্য হয়, তাহলে প্রাচীনকাল সংক্রান্ত যতো বর্ণনার কথাই আমরা জানি, তা সবই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যে ব্যক্তি হাদীসের বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করতে পারে, যার মতে রসূলে করীম (স)-এর নিকটতম যুগের খ্যাতনামা মুসলিম মনীষীগণ—যাদের চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাতির মধ্য থেকে পেশ করা সম্ভবপর নয়—ইসলামের দাবী করা সত্ত্বেও রসূলে করীম (স)-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিতেন এবং নিজেরা মনগড়া হাদীস তৈরী করে রসূলের ওপর আরোপ করতেন—এমন ব্যক্তি কিভাবে ইতিহাসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে? তিনি কেন বলছেন না যে, তিবরী, ইবনে কাসীর, ইবনে খালদুন এবং ইতিহাসের সমস্ত গ্রন্থই মনগড়া কাহিনী মাত্র এবং অতীত কালের কোনো ঘটনাই আমাদের কাছে বিশুদ্ধভাবে এসে পৌঁছেনি? এর চাইতেও পরিতাপের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ এমন কি, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম হাসান বছরীর মতো ব্যক্তিকে পর্যন্ত অনির্ভরযোগ্য মনে করে, সে ভন ক্রেমার[১] থেকে প্রমাণিকতা গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না। অন্ধ বিদ্বেষ যে মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, এর থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

কোনো অনভিজ্ঞ মুসলমান কিংবা অমুসলমান 'সত্যভাষী' সাহেবের পুস্তিকাটি পড়লে স্বভাবতই তার মনে দাগ কাটবে যে, রসূলে করীম (স)-এর তিরোধানের পর মাত্র ৫০ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলমানরা

১. প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। ধর্মীয় বিষয়ের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে ইনি শীর্ষস্থানীয়--- অনুবাদক।

www.bjilibrary.com

রসূলুল্লাহ ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাইকারীভাবে বিদ্রোহ করেছিলো এবং ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসে যারা সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এবং যাদেরকে ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ মনে করা হয়, তারাই এ বিদ্রোহের ধ্বজাধারী ছিলেন। এ লোকগুলোর মনে ঈমানের গন্ধ পর্যন্ত ছিলো না। এরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে হাদীস, ফিকাহ, সুন্নাত, শরীয়াত ইত্যাকার চমকপ্রদ শব্দাবলী তৈরী করেছেন এবং দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে আঁ হযরত ও কুরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাবার্তা রসূলে করীমের প্রতি আরোপ করেছেন। এহেন ধারণা সৃষ্টির পর কোনো ব্যক্তি আর ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করবে, এমন প্রত্যাশা অন্তত আমি করি না। কারণ, যে ধর্মের ইমাম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের অবস্থা হচ্ছে এই, তার অনুবর্তীদের মধ্যে 'সত্যভাষী' সাহেব এবং তার কতিপয় মুষ্টিমেয় সমর্থককে দেখলে এটি কোনো সত্য ধর্ম হতে পারে—এ কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করবে? ব্যাপারটি শুধু এখানেই শেষ নয় ; রবং এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হলে খোদ ইসলামই বর্তমানে আসল রূপে সুরক্ষিত আছে কিনা, এ সন্দেহই লোকদের মনে উদিত হতে পারে। কারণ মুসলিম মনীষীদের মধ্যে প্রথম শতক থেকে আজ পর্যন্ত নবীজীর জীবন চরিত্র, কথাবার্তা ও শিক্ষাধারাকে সার্থকভাবে সুরক্ষিত রাখার মতো একটি দলও যখন বর্তমান রইলেন না, এ জাতির ছোটো বড়ো প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিই যখন খেয়ানতকারী ছিলেন এবং নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি আরোপ করতেন, তখন ইসলামের কোনো কথার ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। বরং আরবে যে বাস্তবিকই কোনো পয়গাম্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন এ কথাটি বিশ্বাস করা যায় না। মূলত জনগণের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্যেই যে রসূল ও রেসালাতের কাহিনী বানানো হয়নি, তাই বা বিচিত্র কি? অনুরূপভাবে কুরআন কোনো পয়গাম্বরের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলো কিনা, আর অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও মূল ভাষায় সুরক্ষিত রয়েছে কি না, এ সন্দেহও প্রকাশ করা যেতে পারে। কারণ এটি আমাদের কাছে পৌছবার মাধ্যম হচ্ছেন তারাই, যাঁরা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারীদের কথাবার্তা নিয়ে পয়গাম্বরদের প্রতি আরোপ করতে কিছু মাত্র লজ্জানুভব করতেন না। কিংবা যাদের সামনে এসব কিছু সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও একটি টু-শব্দ পর্যন্ত করতেন না। বস্তুত 'সত্যভাষী' সাহেব এবং তার সমর্থক হাদীস অবিশ্বাসীরা এ দ্বারা ইসলামের শত্রুদের হাতে এমন একটি অস্ত্র তুলে দিয়েছেন, যা হাদীসের সংগ্রহীত অস্ত্রের চাইতে লক্ষগুণ বেশী ভয়ঙ্কর। এ দ্বারা তো ইসলামের মূল শিকড়ই উপড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

অবস্থা দৃষ্ট মনে হয়, 'সত্যভাষী' সাহেব হাদীসের গ্রন্থাবলীর প্রতি শুধু ছিদ্রান্বেষণের জন্যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থগুলোর বেশুমার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে যে জিনিসগুলো হাদীসকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার পক্ষে উপযোগী হতে পারে ভেবেছেন, নিজের গোটা সময় সেগুলোর সন্ধানেই ব্যয় করেছেন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এরূপ ছিদ্রান্বেষণের দৃষ্টিতে তিনি যদি কুরআনের প্রতি তাকান, তবে এ কিতাবটিও তার কাছে শুধু দোষ-ত্রুটি পূর্ণই মনে হবে। এই যে হাজার হাজার কাফের ও বিধর্মী কুরআন পড়ে এবং সৎপথ পাবার পরিবর্তে আরো পথভ্রষ্ট হয়, এর কারণটা কি? এই নয় কি যে, তারা সৎপথ পাবার উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ে না বরং ছিদ্রান্বেষণ করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকে। এই কারণেই তারা কুরআনে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। কারণ মানুষ যা তালাশ করে, তাই সে পেয়ে থাকে। কাজেই আমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি যে, কুরআন অধ্যয়নকালে 'সত্যভাষী' সাহেবের চোখের ওপর ছিদ্রান্বেষণের চশমা লাগানো হয়নি। নচেত তিনি দেখতে পেতেন যে, ইসলামের শত্রুদেরকে এ কিতাবও বহুতরো অস্ত্র যুগিয়ে দিয়েছে। আর এটা তাঁকে কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস করার জন্যে তেমনিই উদ্বুদ্ধ করতো, যেভাবে শত্রুদের হাতে হাদীসের যোগানো অস্ত্র দেখে তিনি হাদীসকেই অবিশ্বাস করে বসেছেন।

'সত্যভাষী' সাহেব হাদীস সম্পর্কে যতো প্রশ্ন তুলেছেন, তার প্রতিটি প্রশ্নেরই পুংখানুপুংখ জবাব দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে খুঁটিনাটি আলোচনায় লিপ্ত হওয়া সমীচিন মনে করি না, বরং আলোচনার ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি নীতিগত বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাই। যদিও তার এবং সাধারণ হাদীস অবিশ্বাসীদের ছিদ্রান্বেষীসূলভ মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনের আশা খুবই কম, তবু আমার ধারণা এই যে, এঁদের ভ্রষ্টতার সূচনা সদিচ্ছা থেকে হয়েছে এবং নিছক অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমীই এদেরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছে। এ কারণেই আমি আশা করি, তারা যদি নিজেদের মন-মানসকে অবিশ্বাসীসুলভ ধ্যান-ধারণা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্ত রেখে আমাদের যুক্তি-প্রমাণগুলো সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে তাদের আকীদা-বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হতে পারে।

সর্বপ্রথম চিন্তার বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদ এবং তার পূর্বেকার আসমানী গ্রন্থগুলোকে কেনো নবীদের মাধ্যমে নাযিল করেছেন?

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ তায়ালা কি এসব গ্রন্থ ছাপানো আকারে দুনিয়ার বুকে হঠাৎ এক সাথে পাঠিয়ে দিতে এবং তার এক এক কপি প্রতিটি মানুষের কাছে আপনা আপনি পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন না? তিনি যদি এ ব্যাপারে সক্ষমই না থাকবেন তবে তাকে আল্লাহ্ই বা মানবেন কেনো? আর যদি সক্ষমই থাকবেন—অবশ্যই তিনি সক্ষম ছিলেন—তাহলে প্রচারের এ মাধ্যমটি কেনো তিনি অবলম্বন করলেন? এটা তো দৃশ্যত হেদায়াতের সুনিশ্চিত মাধ্যম হতে পারতো। কারণ সুস্পষ্ট মুজেযা ও অলৌকিকতা দেখে প্রতিটি ব্যক্তি বিশ্বাস করতো যে, এ হেদায়াত নিসন্দেহে আল্লাহ্র কাছ থেকে আগত। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা এ পন্থাটি অবলম্বন না করে হামেশা নবীদের মাধ্যমেই কিতাব পাঠিয়ে এসেছেন। পরন্তু এ নবুয়াতের কাজের জন্যেও তিনি কোন ফেরেশতা কিংবা অন্য কোন অতিমানসিক সত্তাকে নিযুক্ত করেননি বরং হামেশা এর জন্যে মানুষকেই মানোনীত করেছেন। এমন কি, প্রত্যেক যুগেই কাফেররা বারংবার বলেছে যে, আল্লাহ্ যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পৌঁছাতেই চান তবে ফেরেশতা কেনো পাঠান না—যাতে করে সে পয়গাম আল্লাহ্র কাছ থেকে আগত বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মে? কিন্তু আল্লাহ্ এ ধরনের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবেই বলেছেন যে, আমি ফেরেশতা পাঠালেও তাদেরকে মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً – (انعام : ٩)

দুনিয়ায় যদি ফেরেশতারা বসবাস করতো তবে তাদের হেদায়াতের জন্যেও আমি ফেরেশতা পাঠাতাম--

لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكاً رَّسُوْلاً *– (بنى اسرائيل : ٩٥)

প্রশ্ন এই যে, কিতাব নাযিলের জন্যে নবীদেরকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা এবং নবুয়াতের জন্যে তামাম সৃষ্টি জগতের মধ্যে শুধু মানুষকেই মনোনীত করার ব্যাপারে এতো গুরত্ব কেনো আরোপ করা হয়েছে? এর জবাবও খোদ কালামুল্লাহ থেকে পাওয়া যায়। কুরআন আমাদের বলছে যে, আল্লাহ্ যতো নবী পাঠিয়েছেন, তারা আল্লাহ্র ফরমান অনুযায়ী নির্দেশ জারি করবেন এবং লোকেরা তাদের বিধি-ব্যবস্থার আনুগত্য করবে— এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্র কানুন অনুসারে জীবন যাপন করবেন আর লোকেরা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলবে—এ জন্যেই তাঁদের পাঠানো হয়েছে-وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط– (النساء : ٦٤)

www.bjilibrary.com

নবীগণ একের পর এক দুনিয়ায় এসেছেন এবং প্রত্যেক লোকদের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য করো–

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ*–(الشعراء : ١٠٨، ١٢٦، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩)

নবী করীমের দ্বারা বলানো হয়েছেঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ– (ال عمران :٣١)

মমিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ – (الاحزاب : ٢١)

বস্তুত যদি শুধু আল্লাহ্‌র কিতাবই নাযিল করা হতো, আর কোনো নবী না আসতেন, তাহলে লোকেরা আয়াতের অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য করতো এবং সে মতানৈক্য মীমাংসা করারও কেউ থাকতো না। লোকেরা আল্লাহ্‌র বিধি–ব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে ভুল করে বসতো এবং তাদেরকে নির্ভুল তাৎপর্য বাতলে দেবার কেউ থাকতো না। এ প্রয়োজনের কতকটা অবশ্য ফেরেশতা দ্বারা পূরণ করা যেতো। কিন্তু পবিত্রতা, নির্মলতা ও তাকওয়া সংক্রান্ত বিধি নিষেধের বেলায় লোকেরা মনে করতো যে, বাস্তব জীবনে এগুলো পালন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ফেরেশতারা তো মানবীয় আবেগ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। তাদের কোনো ক্ষুৎ পিপাসা ও যৌনচেতনার বালাই নেই। তারা সব রকম মানবীয় প্রয়োজন থেকে বেনিয়াজ। কাজেই তাদের পক্ষে মুত্তাকীসুলভ জীবন যাপন করা কিছু মাত্র কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আমরা এতো মানবীয় দুর্বলতা নিয়ে তাদের অনুকরণ করবো কিভাবে? এ কারণেই দুনিয়ায় প্রথম একজন মানুষ আসার প্রয়োজন ছিলো, যিনি উল্লেখিত স্বভাব প্রবণতা, প্রয়োজনবোধ, শক্তি-ক্ষমতা ও মানবীয় সীমাবদ্ধতার অধিকারী হবেন এবং লোকদের সামনে আল্লাহ্‌র বিধি–ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করে মানুষ কিভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতে পারে, তার বাস্তব নমুনা দেখাবেন। যিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবনের তাবৎ বিষয়ের সম্মুখীন হবেন। যিনি তামাম বিষয়াদিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কার্যত অংশগ্রহণ করবেন, প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ দিবেন, বিশেষভাবে শিক্ষাদান করবেন এবং জীবনের পেঁচানো পথগুলো থেকে আত্মরক্ষা করে মানুষ কিভাবে সত্য ও সুকৃতির পথে চলতে পারে, তা বাতলে

www.bjilibrary.com

দেবেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্যে শুধু কিতাবুল্লাহ্কেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং তার সঙ্গে রসূলের অনুসরণ এবং তার উত্তম আদর্শের অনুবর্তনকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন শরীফে স্পষ্টত তিনটি জিনিসের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম, আল্লাহ্র হুকুম, দ্বিতীয়ত, রসূলের হুকুম এবং তৃতীয়ত, মুসলমান শাসকদের বিধান (اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء) যদি কুরআনের অনুবর্তনই শুধু যথেষ্ট হতো এবং তাছাড়া আর কোনো জিনিসের আনুগত্যের প্রয়োজন না হতো, তাহলে রসূল এবং মুসলিম শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশই দেয়া হতো না। যদি রসূল এবং শাসকের নির্দেশ কুরআনী বিধান ছাড়া আর কিছু নাও হতো, তবু এদের আনুগত্যের হুকুম পৃথকভাবে দেয়া অর্থহীন হতো। তিনটি জিনিসের আনুগত্যের নির্দেশ পৃথকভাবে দেয়ায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেঃ কুরআনে সরাসরিভাবে আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া বিধি-ব্যবস্থাগুলো ছাড়াও যেগুলো রসূলে করীম দিয়েছেন, সেগুলোর আনুগত্যও বাধ্যতামূলক এবং তার এ আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যেরই অনুরূপ- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (النساء:৮০)। পরন্তু আল্লাহ্ ও রসূল ছাড়া মুসলমানদের তারিপ্রাপ্ত শাসক যেসব বিধি-নির্দেশ দেবেন, সেগুলোর আনুগত্যও বাধ্যতামূলক। তবে সে জন্য শর্ত এই যে, সেসব বিধি-নির্দেশ আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে নীতিগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ ও রসূলের দেয়া পথনির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে-

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ- (النساء:৫৯)

এর থেকে জানা গেলো যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্র কিতাবই যথেষ্ট নয়, এর সাথে নবুয়াতের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। আর আল্লাহ্র কিতাবের আনুগত্য যেমন প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ফরয, রসূলের আনুগত্য এবং তার আদর্শের অনুবর্তনও তেমনি ফরয। কাজেই যে ব্যক্তি শুধু কিতাবুল্লাহ্কে গ্রহণ করার এবং রসূলের আদর্শ ও বিধানকে বর্জন করার কথা বলে, সে মূলত নবুয়াতের সঙ্গেই নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করে দেয়। সে এমন একটি সম্পর্ক সূত্রকে কেটে দেয়, যাকে স্বয়ং আল্লাহ্ই তার বান্দাহ ও তার কিতাবের মধ্যে একটি অপরিহার্য সূত্র হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন। সে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে যে,

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্‌র কিতাবই তার বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলো; কিন্তু আল্লাহ্‌ অহেতুক তার কিতাবকে নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে একটি পণ্ডশ্রম করেছেন–

سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাতে রসূলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণিত হবার পর এবার আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করা দরকার। তা হলো এই রসূলের বিধি–নির্দেশের আনুগত্য এবং তার আদর্শের অনুবর্তন কি শুধু তার জীবনকাল পর্যন্ত জরুরী ছিলো? তার পরে কি আর তার কোনো প্রয়োজন নেই? যদি তা–ই হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, রসূল যতদিন সশরীরে জীবিত ছিলেন, তার রিসালাত শুধু ততোদিনকার জন্যেই ছিলো। তার তিরোধানের পর দুনিয়ার সঙ্গে তার নবুয়াতের সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরূপ অবস্থায় নবুয়াতের মর্যাদাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। রসূলের কাজ যদি শুধু একজন পত্রবাহকের মতো কিতাবুল্লাহ্‌কে পৌঁছিয়ে দেয়াই হয়, এর চাইতে বেশী আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আবার আমি বলবো যে, এরূপ অবস্থায় রসূলেরই কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কারণ এ কাজটি কোনো ফেরেশতাই করতে পারতো। বরং এটা সরাসরি করাও সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু কিতাব পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়াও যদি কোনো জিনিসের প্রয়োজন থাকে, এর জন্যই আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, পরন্তু মানব জাতির পথনির্দেশের জন্য যদি কুরআনের সাথে রসূলের বিধি–নির্দেশ এবং তাঁর বাস্তব জীবনাদর্শের প্রয়োজন থাকে, তাহলে এসব কিছু শুধু ২৩/২৪ বছরের মধ্যে সীমিত থাকার কী অর্থ থাকতে পারে? মাত্র এক শতকের এক–চতুর্থাংশের জন্যে একজন নবী প্রেরণ করা, এটুকু সময়ের জন্যে নবুয়াতের মতো একটি বিরাট পদমর্যাদার সৃষ্টি করা এবং নবীর দৈহিক তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার জন্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে—এমন একটি ঠুনকো জিনিসকে এতো সাড়ম্বরে হেদায়াতের মাধ্যম রূপে ঘোষণা করার ব্যাপারটিকে নেহায়েতই ছেলেখেলা বলে মনে হয়। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা কিছুতেই শোভনীয় হতে পারে না।

তাই খোদ আল্লাহ্‌ তায়ালাই তার কিতাবে এ অপবাদের নিরসন করে দিয়েছেন। তিনি মুহাম্মাদ (স)–কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ *–(انبياء:١٠٧) এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবী করীমের নবুয়াত যদি কেবল তাঁর নিজ জীবনকালের জন্যেই হয়, তাহলে

www.bjilibrary.com

তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন বা বিশ্ব জগতের রহমত বলা যেতে পারে না। যদি বলা হয় যে, তিনি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কুরআন নিয়ে এসেছেন, এ জন্যেই তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন—তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, রহমাত তিনি ছিলেন না বরং রহমাত হচ্ছে কুরআন, তাকে খামাখাই রহমাত বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনকে পৃথক রহমাত বলেছেন এবং তার বাহককে বলেছেন আলাদাভাবে। পরন্তু তিনি বলেছেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ এ আয়াত স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে যে, নবী করীমের আবির্ভাবের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা 'মানুষ' (الناس)নামে অবিহিত হবে, তাদের সবার জন্যেই তিনি আল্লাহ্র রসূল। তার নবুয়াত কোনো বিশেষ যুগের জন্যে নয় বরং দুনিয়ার বুকে যতোদিন মানুষ বসবাস করবে, ততোদিনই তাঁর নবুয়াত কায়েম থাকবে। আয়াতে এমন কোনো ফাঁক নেই, যদ্বারা 'মানুষ' বলতে শুধু সেই যুগের লোকদেরই বুঝনো হয়েছে বলে ধারণা হতে পারে। কিংবা এমন কোনো সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতও নেই, যদ্বারা পরবর্তী কোনো যুগ পর্যন্তকার লোকদের জন্যে একে সীমিত রাখার কথা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে এ কথা সমর্থিত হয় যে, হযরতের নবুয়াত চিরস্থায়ী। আল্লাহ্ তায়ালা তার মাধ্যমেই দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ– হযরতের মাধ্যমেই নবুয়াতের ধারা শেষ করে দেয়া হয়েছে। مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا *(احزاب) অন্যান্য নবীদের আনীত গ্রন্থাবলীর মুকাবিলায় তার অনীত কিতাবকে চিরদিনের তরে সুরক্ষিত করা হয়েছে। কারণ পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলী নির্দিষ্ট যুগের জন্যে হেদায়াত ছিলো আর এটি হচ্ছে চিরস্থায়ী হেদায়েত–

وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ *– (الحجر: ٩)

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম (স)–এর নবুয়াত ও রিসালাত চিরদিনের জন্যে। আর এটা যখন প্রতিপন্ন হলো, তখন যেসব আয়াতে হযরতের বিধি–নির্দেশের আনুগত্য ফরয ঘোষণা করা হয়েছে, তার জীবন চরিত্রকে উত্তম আদর্শ আখ্যা দেয়া হয়েছে, তার অনুবর্তনকে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের মাধ্যম আখ্যা দেয়া হয়েছে, এবং সুপথ প্রাপ্তিকে তার অনুসরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে– وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط – (النور: ٥٤) সেসব

www.bjilibrary.com

আয়াতও চিরদিনের তরে স্থায়ী। কারণ আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভ ও সুপথ প্রাপ্তির প্রয়োজন যেমন নবী করীমের সমকালীন লোকদের ছিলো, তেমনি আজকের লোকদেরও রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোক আসবে, সবার জন্যেই থাকবে। কাজেই এ দু'টি জিনিস যখন নবী করীমের অনুবর্তন এবং তার জীবনাদর্শের অনুকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তখন নবী জীবনের পবিত্র আদর্শ এবং তার বিধি-নির্দেশগুলোও—যেগুলোর সাহায্যে তার সমকালীন লোকেরা সৎপথের সন্ধান পেয়েছিলো—কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে সুরক্ষিত থাকা উচিত। নচেত পরবর্তী কালের লোকদের পক্ষে হেদায়াত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমি 'হেদায়াত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে' কথাটি খুবই নম্রতার সঙ্গে ব্যবহার করেছি। নচেত কিতাব অবতরণের সঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা নবুয়াতের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে যে অপরিবর্তিনীয় নিয়ম শুরু থেকে চলে আসছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তো আমার বলা উচিত ছিলো যে, নবীর আদর্শ যদি বাকী না থাকতো তার বিধি-ব্যবস্থা যদি সুরক্ষিত না থাকতো এবং নবী চরিতে নিহিত হেদায়াতের পবিত্র উৎস যদি বন্ধ হয়ে যেতো, তাহলে শুধু কিতাবুল্লাহ্‌র সাহায্যে দুনিয়াকে সৎপথে চালিত করা সম্ভবপর হতোনা। এ কারণে যে, নবুয়াতের নিদর্শন মুছে যাবার পর কিতাবুল্লাহ্‌র বাকী থাকা ঠিক রসূল ছাড়া কিতাব নাযিল হওয়ারই সমতুল্য। যদি কিতাব অবতরণের পর নবুয়াতের নিদর্শন বাকী থাকার প্রয়োজন না থাকে তবে অবতরণের জন্যে নবুয়া তের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতি স্পষ্ট বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে কিতাব অবতরণের জন্যে নবুয়াত যদি অপরিহার্য হয়, তবে তার সঙ্গে নবুয়াতের নির্দশন অবশিষ্ট থাকাও একান্ত অপরিহার্য। নবুয়াতের নিদর্শন ছাড়া শুধু কিতাবুল্লাহ হেদায়াতের উৎস হতে পারে না। এর কারণ খুব সহজেই বোঝা যেতে পারে। নবুয়াতের নিদর্শনাদি যদি মুচে যায়, তবে যেসব জাতির কাছে কতকগুলো কিচ্ছা- কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নেই, মুসলমানদের পরিণতি ঠিক তাদের মতো হবে। লোকেরা বলবে ঃ তোমাদের দাবী অনুযায়ী যে ব্যক্তির ওপর এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তার জীবন কথাটা বলো তো! তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রসূল হবার উপযুক্ত ছিলেন কিনা একটু যাচাই করে দেখি! কিন্তু আমরা তাদেরকে কিছু বলতে পারবো না। লোকেরা জিজ্ঞেস করবে ঃ কুরআনের দাবীর স্বপক্ষে তোমাদের কাছে এমন কি

www.bjilibrary.com

বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, যদ্বারা তোমাদের নবীর নবুয়াত প্রতিপন্ন হতে পারে? কিন্তু আমরা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারবো না। এমন কি, কবে ও কোন্ অবস্থায় কুরআন নাযিল হয়েছে, কিভাবে নবীজির ব্যক্তিত্ব ও তার পবিত্র জীবনধারা দেখে লোকেরা দলে দলে ঈমান এনেছে, কিভাবে তিনি লোকদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করেছেন, হেকমত ও বিচক্ষণতার শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ্র আয়াতের পঠন পাঠন দ্বারা সত্যের আলো বিচ্ছুরিত করেছেন—আমরা নিজেরাই এটা জানতে পারবো না। অনুরূপভাবে কিভাবে তিনি মানবীয় জীবনের তামাম দিকে সংগঠন ও সংস্কারের এতোবড়ো বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং শরীয়াতের এতো বড়ো ব্যাপক ও বিচক্ষণ বিধি-ব্যবস্থা তৈরী করেছেন—যা শুধু মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয় এবং যা তার নবুয়াতের পক্ষে এক অনস্বীকার্য প্রমাণ—তাও আমাদের পক্ষে জানবার কোনো উপায় থাকবে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, হাদীস অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে যেসব বর্ণনা আজ নদীতে নিক্ষেপ করার উপযোগী, সেগুলো না থাকলে আমরা কুরআনের প্রমাণিকতাকে তার বাহক পর্যন্তই পৌঁছাতে পারতাম না। এ কুরআন যে এ ভাষায়ই রসূলে করীমের প্রতি নাযিল হয়েছিলো, এর স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোনোই প্রমাণ থাকতো না। আজকে জেন্দাবেস্তা, গীতা, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর যে মর্যাদা, আমাদের এ কিতাবের মর্যাদাও ঠিক তা-ই হতো। অনুরূপভাবে আমাদের ধর্মীয় জীবনের যতো ক্রিয়াকর্ম, রীতিনীতি ও আইন-কানুন রয়েছে, তা সবই প্রমাণহীন হয়ে পড়তো। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মগুলো যে রসূলে করীমের নির্ধারিত পন্থায়ই পালন করা হচ্ছে—এ কথা নিজেরাও জানতে পারতাম না, অন্যকেও বলতে পারতাম না। হাদীস অবিশ্বাসীরা বলেন যে, এসব ক্রিয়াকর্মের জন্যে 'অব্যাহত সুন্নাত'ই যথেষ্ট। কিন্তু সুরক্ষিত ও প্রামাণ্য বর্ণনার অবর্তমানে এ 'অব্যাহত সুন্নাতে'র মর্যাদা পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তীদের পর্যন্ত চলে আসা প্রথা ছাড়া আর কি হতো? এ ধরনের প্রমাণহীন অব্যাহত সুন্নত তো হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যেও রয়েছে। তারাও সবাই এ কথাই বলে যে, আমরা যেসব পূজাঅর্চনা করি এবং আমাদের মধ্যে যেসব আচার অনুষ্ঠান চালু রয়েছে তা প্রাচীন লোকদের থেকে এমনিই চলে এসেছে। কিন্তু আজকে তাদের এ অব্যাহত সুন্নাত সম্পর্কে কি বিশ্ববাসী এবং খোদ ঐ জাতিগুলোর আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করেন? তাদের মনে কি এ প্রশ্ন জাগেনা যে, এ রীতি-নীতিগুলোর আসল রূপ কি ছিলো এবং যুগের

www.bjilibrary.com

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তা আল্লাহ্‌ই জানেন। এসব রীতিনীতির প্রতি কি আজ রসমপরস্তির (Riteration) বিদ্রূপ করা হয় না? কেউ যদি এগুলোকে পরিবর্তিত করে কোনো নতুন রীতি প্রবর্তন করতে চায়, তাহলে বাপ-দাদার কাল থেকে প্রচলিত রীতিনীতিতে পরিবর্তন হতে পারে না—এ দোহাইটুকু ছাড়া এর বিরুদ্ধে আর কি দলিল বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় হাদীস অবিশ্বাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে আমাদের যুগ থেকে রসূলে করীমের যুগ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা বা উক্তির প্রমাণিকতা বহনকারী ধারাবাহিক, প্রামাণ্য ও সুসংবদ্ধ 'রেওয়ায়েত' যদি না থাকতো, আর আমাদের কাছেও শুধু অব্যাহত আমল—'সত্যভাষী' সাহেব যাকে 'অব্যাহত সুন্নাত' আখ্যা দিয়েছেন—বাকী থাকতো, তাহলে আমাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের অবস্থা হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং 'রসম রেওয়াজ' ও 'ধর্মীয় কাহিনী' নামে আখ্যাপ্রাপ্ত [১] রীতিনীতি ও কুসংস্কারগুলোর চাইতে তেমন কিছু ভিন্ন হতো না। এটা কি ইসলামের জন্যে শক্তি ও দৃঢ়তার কারণ হতো—না দুর্বলতা ও অসংবদ্ধতার কারণ—তা একটু তলিয়ে চিন্তা করা দরকার।

এ আলোচনা থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কিতাবুল্লাহ্‌র সঙ্গে সুন্নাতে রসূলের বর্তমান থাকা একান্ত অপরিহার্য।

এখন সুন্নাতে রসূল আমাদের কাছে পৌঁছবার উপায় কি এবং কি হতে পারে, এ প্রশ্নটিতে আসা যাক। এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবী করীম তার নবুয়াতের পর থেকে তিরোভাব পর্যন্ত প্রায় সিকি শতক পর্যন্ত যে সময়টি পেয়েছিলেন, সেটি শুধু কুরআন পড়া আর শুনানোর কাজেই ব্যয় করেননি বরং এ সময় কুরআন পাঠ ছাড়াও তিনি দিনরাত ইসলামের কথা প্রচার করছিলেন, গোমরাহ লোকদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, ঈমান পোষণকারীদের শিক্ষা দান করছিলেন এবং নিজের এবাদাত-বন্দেগী, নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্মের দৃষ্টান্ত পেশ করে লোকদের ট্রেনিং ও সংশোধন কার্যে মশগুল ছিলেন।

খোদ কোরআনে বলা হয়েছেঃ

---

১. বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে উরস উৎসব, নিয়াজ-মান্নত এবং বিয়ে শাদী ও শোক দুঃখ প্রকাশের যে প্রথা চালু রয়েছে, হাদীসের অবর্তমানে এগুলোকেও 'অব্যাহত সুন্নাত' আখ্যা দেয়া চলে। আর হাদীসের প্রতি অবিশ্বাসের পর এগুলোর কোনো প্রতিবাদই করা যেতে পারে না।

www.bjilibrary.com

يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ * -(البقره: ١٥١)

পরন্তু কুরআন থেকে এও জানা যায় যে, এ শিক্ষাসুলভ জীবন তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তার আরাম ও বিশ্রামের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিলো না। প্রতিটি মুহূর্তই তিনি এবাদত-বন্দেগী, ওয়াজ-নছিহত, হেকমত শিক্ষা ও চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতেন। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা পর্যন্ত তাঁকে বারবার জিজ্ঞেস করতেনঃ আপনি এতো মেহনত কেন করেন? কেন নিজেকে এভাবে ধ্বংস করছেন?

এমতাবস্থায় এ কথা কি কেউ বলতে পারে যে, এহেন কর্মতৎপর মুবাল্লেগী জীবনে কুরআনী আয়াত ছাড়া মুখস্থ রাখা ও প্রচার করার মতো আর কোনো কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুতো না? তাঁর জীবনে এমন কোনো কাজ কি ছিলো না, যাকে লোকেরা নিজেদের জন্যে আদর্শ মনে করতে এবং অপরকে এ নির্মল আদর্শ অনুসরণের পরামর্শদান করতে পারতো? তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে তো ঈমানদার লোকদের বিশ্বাস ছিলো এবং কুরআনও তাদেরকে এ বিশ্বাস পোষণের নির্দেশ দিয়েছিলো যে, তাঁর প্রতিটি কথাই সত্যাশ্রয়ী-(وما ينطق عن الهوى (النجم : ٣)এবং প্রতিটি কাজই হচ্ছে অবশ্য অনুকরণীয়-(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب : ٢١)
এ কথা সুস্পষ্ট যে, এহেন বিশ্বাস পোষণের পর মুসলমানরা অবশ্যই নবী করীমের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো, তাঁর প্রতিটি কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো এবং পরস্পরে হযরতের কথা ও কাজ নিয়ে আলোচনা করতো। যেখানে নবুয়াত বা কোনো প্রকার পবিত্রতার ধারণা বর্তমান নেই, সেখানেও বড়ো বড়ো লোকদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি লোকেরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করে। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম যে মহান ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করতেন, তাঁর কাছ থেকে শুধু কুরআন গ্রহণ করা এবং তাঁর অন্যান্য সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি উদাসীন থাকা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ছিলো?

www.bjilibrary.com

তখনকার দিনে ফটোগ্রাফির কোনো যন্ত্রপাতি ছিলো না—হযরতের তামাম ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধির চিত্র গ্রহণ সম্ভবপর ছিলো না। তাঁর কথাবার্তা ও বক্তৃতাবলী রেকর্ড করে রাখার মতো কোনো শব্দগ্রহণ যন্ত্রপাতিও বর্তমান ছিলো না। তখন মক্কা ও মদীনা থেকে কোনো সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতো না—তাঁর প্রচারমূলক তৎপরতা ও সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মের দৈনন্দিন রিপোর্ট প্রকাশ করারও উপায় ছিলো না। তখন সংরক্ষণ ও পুনরালোচনার একমাত্র মাধ্যম ছিলো লোকদের স্মৃতিশক্তি ও মুখের ভাষা। প্রাচীনকালে শুধু আরবে নয়, দুনিয়ার সকল জাতির কাছেই ঘটনাবলী সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী বংশ ধরদের কাছে পৌছানোর এই একটি মাত্র মাধ্যমই বর্তমান ছিলো। কিন্তু আরবরা বিশেষভাবে তাদের স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুল পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলো। তাদের এ বৈশিষ্ট্য এমনি উজ্জ্বল ছিলো যে, সম্ভবত আমাদের 'সত্যভাষী' সাহেব ভন ক্রেমার একে অস্বীকার করবেন না। বস্তুত যে জাতি আরব ইতিহাস, জাহেলী সাহিত্য, বিভিন্ন গোত্রের এমন কি উট ও ঘোড়ার বংশ-তালিকা পর্যন্ত মুখস্থ করতো এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে মুখস্থ করাতো, তারা রসূলে করীমের মতো বিরাট পুরুষের জীবনচরিত ও কথাবার্তাকে মুখস্থ রাখবে না এবং তা পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছাবে না—এটা কিছুতেই সম্ভবপর ছিলো না।

তারপর যখন রসূলে করীম তিরোধান করলেন, তখন লোকদের মধ্যে তাঁর জীবনচরিত ও কথাবার্তা সম্পর্কে অনুসন্ধান-স্পৃহা বেড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো। যারা হযরতের দর্শন ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাদের মধ্যে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের কাছ থেকে তাঁর কথাবার্তা ও জীবনচরিত জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। আমরা নিজেরাই দেখতে পাই যে, গত শতকের কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছে, এমন কেউ আত্মপ্রকাশ করলে লোকেরা অমনি তার কাছে ছুটে যায় এবং তার কাছে প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবন কথা জিজ্ঞেস করে। আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি উত্তর ভারত থেকে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) পর্যন্ত এমনি এক উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো ঃ সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীর সাহচর্য পেয়েছেন—এমন কোনো প্রবীন ব্যক্তির সাক্ষাত পেলে তার কাছ থেকে তিনি সাইয়েদ সাহেবের জীবনকথা জেনে নিবেন। একজন সাধারণ লোকের বেলায় যখন এ রকম ব্যাপার ঘটতে পারে, তখন সবচাইতে সেরা পয়গাম্বর এবং দুনিয়ার সবচাইতে বিরাট শিক্ষাদাতার তিরোধানের পর মুসলমানদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

তাঁর জীবনকথা জানবার এবং তাঁর কথাবার্তা থেকে উপকৃত হবার কোনো আকাংখা জাগবে না—এটা কি সম্ভবপর ছিলো? লোকেরা কোথাও কোনো সাহাবীর সন্ধান পেলে শত—শত মাইল ভ্রমণ করে সেখানে গিয়ে উপনীত হতো এবং হযরতের জীবনকথা জিজ্ঞেস করতো—ইতিহাসের এসব ঘটনাবলীর মধ্যে কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? সাহাবীদের পর তাবেয়ীদের বেলায়ও নিসন্দেহে এরূপ ব্যাপারই ঘটেছে। অন্তত দু'শতক পর্যন্ত হাদীস প্রচার ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার অসাধারণ আগ্রহ মুসলমানদের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে লক্ষ করা গিয়েছে। এটা শুধু আনুমানিক কথাই নয় বরং ইতিহাসও এর সাক্ষ্য বহন করে।

হাদীস-অবিশ্বাসীরা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমানকে তো কাজেই প্রয়োগ করে না ; আর ইতিহাসের ততোটুকু অংশই তারা মানে, যেটুকু দ্বারা হাদীস-অবিশ্বাস করার উপাদান সংগৃহীত হতে পারে। এ ছাড়া ইতিহাসের আর যতো সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, সবাই তাদের কাছে অনির্ভরযোগ্য। কিন্তু যাদের মধ্যে হাদীস অবিশ্বাস করার জন্যে একগুঁয়েমীর সৃষ্টি হয়নি, তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, মুসলমানদের মধ্যে অন্তত দুশো বছর পর্যন্তও নবী করীম (স)-এর জীবন-কথা জানবার এবং তাঁর কথাবার্তা ও উপদেশাবলী শোনবার মতো সাধারণ আগ্রহের সৃষ্টি হবে না—তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর উজ্জ্বল পয়গাম্বরী জীবন এতোখানি উপেক্ষণীয় ছিলো না। একে অস্বীকার করার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রথম যুগের লোকদের ওপর রসূলে করীম (স)-এর কোনো প্রভাব ছিলো না এবং যারা তাঁর নবুয়াতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তারাও তাঁর প্রতি বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করতেন না। হাদীস-অবিশ্বাসীরা রসূলে করীম এবং তাঁর নিকটতর লোকদের সম্পর্কে ইচ্ছা হলে এর চাইতেও কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে কোনো মুসলমান তো দূরের কথা, ইলামী ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্যের পাঠক কোনো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন অমুসলমানও এ মতকে নির্ভুল বলে স্বীকার করবে না।

এ কথা নিসন্দেহ যে, নবুয়াতের যুগ দূরবর্তী হবার পর মুসলমানদের মধ্যে বহিরাগত প্রভাবও অনুপ্রবেশ করছিলো। আর এ প্রভাব বহুলাংশে তারাই নিয়ে আসছিলো যারা ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও মিসরে ইসলাম গ্রহণ করছিলো বটে, কিন্তু প্রাচীন ধর্মের ধ্যান-ধারণা তাদের মন-মানস থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। এ কথাও নিসন্দেহ যে, মুসলমানদের মধ্যে একটি দল

www.bjilibrary.com

মনগড়া সব কথা বলে বেড়াতো এবং শুধু লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে সেসব কথা রসূলে করীমের প্রতি আরোপ করতো। এ দু'টি জিনিসই ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। আর বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান থেকেও বোঝা যায় যে, এরূপ অবশ্যই হয়ে থাকবে। কিন্তু এদ্বারা কি এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত যে, মুসলমানদের সবাই এরূপ লোকই ছিলো? সবাই মিথ্যাবাদী ও বেঈমান ছিলো?—সবাই এমনি মুনাফিক ছিলো যে, যে মহামানবের নবুয়াত সম্পর্কে দৈনিক অন্তত পাঁচবার তাঁরা সাক্ষ্যদান করতো, তাঁর প্রতি অপবাদ চাপাতো? সবাই এমনি সত্যদুশমন ছিলো যে, সারা দুনিয়ার কুসংস্কার এনে রসূলের নামের আল্লাহ্‌র দীনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত এবং এভাবে তার মূলে কুঠারাঘাত হানতো? বস্তুত এরূপ সিদ্ধান্ত না বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে, আর না ইতিহাস এর সমর্থন করে। আর এটা যখন সত্য বা যথার্থ নয়, তখন সততার সঙ্গে কেবল এটাই বলা যেতে পারে যে, প্রথম শতকের শেষভাগে হাদীসের মধ্যে মনগড়া রেওয়ায়েতের একটি অংশও ঢুকে পড়েছিলো এবং পরবর্তী বংশধরদের কাছে যেসব হাদীস পৌঁছেছে, তার মধ্যে যথার্থ, ভ্রান্ত ও সন্দেহজনক সব রকমের হাদীসই মিশ্রিত ছিলো।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ আসল ও মেকীর এ মিশ্রণের পর সঠিক কর্মনীতি কি ছিলো? ভেজালের কারণে যথার্থ ও ভ্রান্ত সবগুলোকে এক সঙ্গে নাকচ করে দিলে এবং পরবর্তী কালের মুসলমানরা নবুয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেই কি সঠিক কাজ হতো?—হাদীস অবিশ্বাসীরা একে একটি সহজ জিনিস মনে করে। কিন্তু যারা কুরআনের প্রতি ঈমান রাখতেন, রসূলুল্লাহর ব্যক্তি সত্তাকে উত্তম আদর্শ মনে করতেন এবং যাদের দৃষ্টিতে হযরতের অনুবর্তন ছাড়া হেদায়াত পাওয়াই সম্ভবপর ছিলো না, তাদের পক্ষে এরূপ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিলো—এতো কঠিন ব্যাপার, যতোটা কারো পক্ষে স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া কঠিন হতে পারে। তাই তারা সবকিছুকে নাকচ করার চাইতে পাহাড় খুড়ে হীরা জহরত বের করার শ্রমকে বেশী সহজ মনে করেন। নবুয়াতের সঙ্গে নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলানদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে দিনরাত মেহনত করেন। হাদীসকে যাচাই পরখ করার জন্যে মূলনীতি নির্ধারণ করেন। আসলকে মেকী থেকে পৃথক করেন। একদিকে রেওয়ায়েতের মূলনীতি অনুসারে হাদীসের বাছ বিচার করেন, অন্যদিকে সহস্র লক্ষ্য বর্ণনাকারীর জীবনচরিত যাচাই পরীক্ষা করেন। সেই

www.bjilibrary.com

সঙ্গে রেওয়ায়েত অনুসারে হাদীসগুলোরও সমালোচনা করেন। এভাবে সুন্নাতে রসূল সম্পর্কে তারা এমন এক তথ্য ভাণ্ডার সংগ্রহ করে দিয়েছেন যার সমান প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার আজ দুনিয়ার বুকে অতীত কালের কোনো ব্যক্তি বা কোনো যুগ সম্পর্কেই বর্তমান নেই। হাদীস অবিশ্বাসীরা তাদের এই সমগ্র মেহনতকে কলমের এক খোচায় উড়িয়ে দিতে পারেন। তারা দীন ইসলামের এসব সাচ্চা খাদেমকে হাদীস রচনাকারী অনারব সভ্যতাজাত, বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের তল্পীবাহক[১] কিংবা অন্য যা কিছু বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ মুহাদ্দিসগণ মুসলমানদের প্রতি এতোবড়ো অনুগ্রহ করেছেন, যার ঋণ তারা কিয়ামত পর্যন্তও শুধতে পারবে না (আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)। বস্তুত এসব রসূলপ্রেমিকের নিরলস মেহনতের ফলেই আমাদের কাছে রসূলে করীম ও সাহাবায়ে কেরামের সময়কার পূর্ণ ইতিহাস খুঁটিনাটি বিবরণসহ বর্তমান রয়েছে। আমাদের কাছে এমন মাপকাঠিও রয়েছে, যার দ্বারা হাদীসের তথ্য ভাণ্ডারকে যাচাই পরখ করে ঘটনাবলীর সত্যিকার রূপ নির্ণয় করতে পারি। হাদীস অবিশ্বাসীরা বলেন, মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত ছাড়া (যা খুবই কম) বাকী হাদীসগুলো সুনিশ্চিত নয়, এগুলো থেকে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। বরং বড়োজোর প্রবল অনুমান লাভ করা যায়। কাজেই এহেন জিনিসের ওপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপনের কি অর্থ থাকতে পারে? আমরা বলবো ঃ চাক্ষুষ প্রমাণ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো মাধ্যমই সুনিশ্চিত হতে পারে না। তাওয়াতির বা ধারাবাহিকতাকেও নিছক এ ধারণার ভিত্তিতেই নিশ্চিত মনে করা হয় যে, মিথ্যা বিষয়ে বহু সংখ্যক লোকের একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু মুতাওয়াতির বর্ণনার জন্যে যে শর্তাবলী রয়েছে তা খুব কম বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ অদৃশ্য বিষয়েই—তা অতীত কালের হোক কি বর্তমান কালের—আমাদের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে 'প্রবল অনুমানের' ওপর, যা অন্তত দু'টি সাক্ষ্য থেকে অর্জিত হয়। খোদ কুরআন এ অনুমান নির্ভর সাক্ষ্যকে এতোটা নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছে যে, এর ভিত্তিতে একজন মুসলমানের রক্ত 'মুবাহ' হতে পারে অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানদের রক্ত এতোখানি সম্মানার্হ যে, কেউ কোনো মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করলে তাকে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

---

১. এই উপাধিগুলো 'সত্যভাষী' সাহেব ইমাম মুহাদ্দিসদের জন্যে ব্যবহার করেছেন।

www.bjilibrary.com

এমনিভাবে ব্যভিচার, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তির ক্ষেত্রে মাত্র দু'চারটি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যার ফলে একজন মুসলমানের হাত কেটে ফেলা যেতে পারে কিংবা একজন মুসলমানের পিঠে চাবুক মারা যেতে পারে। কাজেই কুরআন মজীদেই যখন গায়ের মুতাওয়াতির সাক্ষ্যের ওপর গোটা বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, তখন কোনো হাদীসকে হাদীসে রসূল মানার জন্যে প্রমাণস্বরূপ দু-চার জন রাবীই যথেষ্ট নয়—কোন মুসলমানের এ কথা বলার দুসাহস হতে পারে?

অবশ্য প্রত্যেক সাক্ষীকে যেমন আমরা বিশ্বাস করি না, তেমনি প্রত্যেক রাবীর ওপরই নির্ভর আমরা করবো না। এ ব্যাপারে আমরা কুরআনের নির্দেশ অনুসারে ذَوَا عَدْلٍ এর শর্ত আরোপ করি আর এরই সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে 'আসমাউর রিজাল' বা রাবীদের জীবনী বৃত্তান্ত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে করে রাবীদের জীবন কাহিনী সম্পর্কে খোঁজখবর ও অনুসন্ধান নেয়া খুবই সহজসাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে আমরা রাবীদের ওপর জেরা চালিয়ে দেখবো যে, হাদীসের মূল বক্তব্যের ব্যাপারে তাদের মধ্যে এমন মতবৈষম্য আছে কিনা যা তাদের বর্ণনাকেই সন্দেহজনক করে তোলে? একই ভাবে আমরা 'দেরায়েত' বা বক্তব্য বিচারেরও সাহায্য গ্রহণ করবো কোনো মামলার ক্ষেত্রে বিচারক যেমন বক্তব্য বিচারের সাহায্য নিয়ে থাকেন।[১] কিন্তু সাক্ষীদের বক্তব্য বিচার যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয়, তেমনি 'দেরায়েত' বা হাদীসের বক্তব্য বিচারও কোনো ছেলেখেলা নয়। যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে ইসলামের মূলনীতিকে খুব উত্তমরূপে বুঝে নিয়েছে এবং অধিকাংশ হাদীসের গভীরতর অধ্যয়নের দ্বারা হাদীস বিচারের দূরদৃষ্টি অর্জন করেছে কেবল সেই ব্যক্তিই দেরায়েতের মূলনীতি অনুসারে হাদীসের বক্তব্য বিচার করতে পারে। প্রচুর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক শক্তির সৃষ্টি হয়, যদ্বারা সে রসূলে করীম (স)-এর মেজাজ প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে, তার মন ও মস্তিষ্কে ইসলামের সঠিক ভাবধারা দৃঢ়মূল হয়ে যায়। অতপর সে একটি হাদীস দেখে রসূলে করীম এরূপ বলতে

১. আইনশাস্ত্রে বিচারকের রায় ও বিচার শক্তির যা মর্যাদা, হাদীস শাস্ত্রে 'দেরায়েতের' ঠিক তাই মর্যাদা। বিচারক যেমন প্রত্যেক সাক্ষীর বক্তব্যকে এমনিই গ্রহণ করেন না, বরং বিভিন্ন দিক থেকে তাকে যেমন পরখ করে মতস্থির করেন, তেমনি একজন মুহাদ্দিসও প্রতিটি রেওয়ায়েতকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করেন না বরং ভালোমত যাচাই-পরখ করে সে সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

www.bjilibrary.com

পারতেন কিনা, কিংবা তাঁর আমল এরূপ হতে পারতো কিনা তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে পরন্তু একটি মামলার ব্যাপারে দু'জন বিচারকের সিদ্ধান্ত যেমন বিভিন্ন হয়ে থাকে, এবং কুরআনের অর্থের ব্যাপারে দু'জন পণ্ডিতের তাফসীর যেমন বিভিন্ন হতে পারে, তেমনি দু'জন মুহাদ্দিসের 'দেরায়েত' বা হাদীসের বক্তব্য বিশ্লেষণেও মতবিরোধ হওয়া সম্ভব। আল্লাহ্ আমাদেরকে মানবীয় শক্তির চাইতে বেশী কোনো জিনিসের জন্যে দায়িত্বশীল করেননি। মতবিরোধের সৃষ্টি মানুষের প্রকৃতিসম্মত। এর দোহাই পেড়ে আমরা কুরআন, হাদীস ও আদালতের বিচার, কোনোটাই ছাড়তে পারি না।

মোটকথা একটি হাদীস সম্পর্কে যতোটা খোঁজখবর ও সন্ধান নেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব, তার উপকরণ মুহাদ্দিসগণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে সেই উপকরণের ব্যবহার করে আসলকে মেকী থেকে পৃথক করা এবং আসলটির অনুসরণ করা—আসল ও মেকীর মিশ্রণ দেখে একেবারে নবুয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়।

হাদীস অবিশ্বাসীরা বলেন যে, আমরা হাদীসকে শুধু ইতিহাসরূপে গ্রহণ করবো—শরীয়তের দলিলে পরিণত করবো না। কিন্তু এ ভদ্রলোকেরা কি রসূলের ইতিহাসকে আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়নের ইতিহাস মনে করেছেন যে, তা যথার্থ হওয়া বা না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না। তারা কি এটুকুও মনে করেন না যে, এটা যে মহাপুরুষের জীবন ইতিহাস, তার আনুগত্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয, তার অনুবর্তনের ওপর ইহ-পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল এবং তার জীবনচরিত মুসলমানদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ?—বস্তুত এ মহামানবের জীবনেতিহাস কেবল দু'রকমই হতে পারে—হয় তা যথার্থ কিংবা ভ্রান্ত হবে যদি ভ্রান্ত হয়। তবে তা গ্রহণ করার কোনোই মানে থাকতে পারে না তা আগুনে নিক্ষেপ করাই বিধেয়। কারণ রসূলের নামে মিথ্যাপবাদ রটনা হলে তাকে ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। আর যদি তা যথার্থ হয় তবে তার অনুবর্তন করা একান্তই কর্তব্য। কারণ মুসলমান নামে পরিচিত হয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে কিছুতেই বাঁচা যেতে পারে না।

হাদীস অবিশ্বাসীদের রচনাবলী পর্যালোচনা করলে তাদের অবিশ্বাসের মূলে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় হাদীসের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়ত, হাদীস পদবাচ্য জিনিসটি অনির্ভরযোগ্য।

এর প্রথম কারণটির জবাব পূর্বেই দিয়েছি। আর দ্বিতীয় কারণটির ভ্রান্তির প্রতিও ইতিপূর্বে সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে আলোকপাত করেছি। কিন্তু এখানে বিস্তৃতভাবে সন্দেহটির নিরসন করা দরকার। হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য মনে করার মূল কারণ হচ্ছে সন্দেহ ও সংস্কার। মানুষের প্রকৃতিতে সন্দেহ নামক জিনিসটি এ জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তা হামেশা আলোচনা, গবেষণা ও অন্বেষণের প্রেরণা যোগাবে এবং প্রতিনিয়ত সত্যের সন্ধানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা থাকে, যা অতিক্রম করলে সে জিনিসটি ভারসাম্যহীন বরং অকল্যাণকর হয়ে পড়ে। সন্দেহের প্রবৃত্তি যদি মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়—আর তা অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে মানুষের আয়ত্তাধীন পন্থাগুলোর প্রতি তাকে সন্তুষ্ট হতে না দেয় বরং সন্ধানের এক অসম্ভাব্য মানে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় না—এমন জিনিসগুলোকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে—তবে এটা হবে এক ন্যক্কারজনক প্রবৃত্তি। বাংলায় একেই বলা হয়, 'সংশয়বাদিতা'।

একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সন্ধানের ফলে বড়ো জোর 'প্রবল অনুমান' লাভ করা যায়, মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য। সে যদি এই সন্ধানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া প্রতিটি জিনিসকে অস্বীকার করে বসে, তাহলে সে দুনিয়ার কোনো কাজ করতে পারবে না, এমন কি সে হয়তো, জীবিতও থাকতে পারবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমি আজ পর্যন্ত কাউকে সাপের কামড়ে মরতে দেখিনি। আমাকেও কখনো সাপে কামড়ায়নি যে, তার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত জ্ঞান হবে। আমি শুধু লোকমুখে শুনেছি যে, সাপে কামড়ালে মানুষ মরে যায়। আমি এ বর্ণনার প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং সাপ দেখলেই তা থেকে আত্মরক্ষা করি। কিন্তু আমি যদি এ বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করি এবং বলি যে, সাপ আমার সামনে কাউকে না কামড়ালে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আমার সামনেই সে না মরলে কিংবা খোদ আমাকে না কামড়ালে এবং তার বিষে আমি মারা না গেলে সাপ যে মারাত্মক এ কথা আমি বিশ্বাস করবো না—তা'হলে আমার এ সন্দেহের যা পরিণতি হবে তা সুস্পষ্ট।

এ তো গেল 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার দৃষ্টান্ত ; এ ধরনের বর্ণনা সুদৃঢ় বিশ্বাসের অন্তর্গত বলে সাধারণত স্বীকার করা হয়। কিন্তু জীবনের বেশুমার ব্যাপারেই

www.bjilibrary.com

আমরা একক তথ্য 'খবরে ওয়াহেদ' অর্থাৎ দু'একজন বর্ণনাকারীর পরিবেশিত তথ্যকে বিশ্বাস করে থাকি এবং তারই ওপর নিজের জ্ঞান, কাজ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করি। নিছক তথ্য হিসেবে প্রত্যেক তথ্যের ভেতরেই সত্য এবং মিথ্যা হওয়ার সমান সম্ভাবনা নিহিত থাকে। কিন্তু আমরা এ দু'টির মধ্য থেকে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে নিছক তথ্য হওয়ার ওপরই গুরুত্ব দেই না, বরং বাহ্যিক লক্ষণাদির সাহায্য নিয়ে সত্য কিংবা মিথ্যার কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেই। আর কখনো কখনো এ অগ্রাধিকারটা এতো বেশী শক্তিশালী হয় যে, দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা স্বীকার করতেও আমরা প্রস্তুত থাকি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যে আপন পিতার বৈধ সন্তান, এ কথা কেবল মায়ের বর্ণনা থেকেই জানা যায়। এ খবরে ওয়াহেদ বা একক তথ্যের ভেতর যার দ্বিতীয় কোনো সাক্ষীই পাওয়া যেতে পারে না ; তথ্য হিসেবে সত্য মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কোনো ভদ্র ব্যক্তি এর ভেতরে মিথ্যার সম্ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা, কিছুমাত্র স্বীকার করতেও প্রস্তুত হবে না—এমনকি প্রকৃত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মায়ের বর্ণনাকে বিশ্বাস করা সমীচীন না হলেও সে এমন কাজ করবে না।

বলা যেতে পারে যে, এটা আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমি বলবো ঃ যেখানে আবেগের কোনো প্রভাব নেই, সেখানেও এমনিভাবে 'খবরে ওয়াহেদ' বা একক তথ্যের সম্ভাবনা বাছবিচার করে সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। এ অগ্রাধিকার থেকে যদিও শুধু প্রবল ধারণাই লাভ করা যায় ; কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করলে যেমন আমরা আমল করে থাকি এ ধারণার ওপরও আমরা তেমনি আমল করে থাকি। আমাদের জীবনের নানা বিষয়ের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয় হচ্ছে আইন আদালত। এ জিনিসটির মধ্যে কোথাও ভাবাবেগের কিছুমাত্র প্রভাব নেই বরং নিরেট বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষার ওপর এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। বিচারক বা জজের সামনে যতো মামলা উত্থাপিত হয়, তার সবগুলোরই সম্পর্ক হচ্ছে অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে ; এবং খুব কম ঘটনাবলী বরং কদাচিত দু'একটি ঘটনার সাক্ষ্যকেই হয়তো 'মুতাওয়াতির' সাক্ষ্য বলা যেতে পারে ; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিচারকের সামনে 'খবরে ওয়াহেদ' বা একক তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। এসব তথ্যকে সওয়াল জবাব আনুষঙ্গিক লক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুমানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিচারক সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনার মধ্যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দান করেন। আর কোনো একটি যখন

www.bjilibrary.com

অগ্রাধিকার লাভ করে, তখন তার ভিত্তিতে তিনি এমনি ফায়সালা গ্রহণ করেন, যেন ঘটনাবলী সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। কোনো বিচারক যদি প্রত্যেক সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী এবং প্রত্যেক সাক্ষ্যকে অসত্য ধারণা করে কাজ শুরু করেন, আর প্রতিটি ঘটনা বিশ্বাস করার জন্যে চোখের সামনেই ঘটনার অনুষ্ঠান কিংবা তার নিকট পর্যন্ত 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা পৌঁছানোর জন্যে দাবী জানান, তাহলে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে বিচারকের আসন ত্যাগ করতে হবে।

এমনিভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়ে দিনরাত একক তথ্যের ভিত্তিতেই আমাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। বরং বহুতরো তথ্য আমাদের শুধু তারবার্তা ও সংবাদপত্র পড়েই বিশ্বাস করতে হয়, যেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতেই অনেক শোবা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। যে ব্যক্তি আমায় তারবার্তা দিল, সে প্রকৃতপক্ষে বার্তায় উল্লেখিত ব্যক্তি কিনা, আমি তা বলতে পারি না। বার্তাটি প্রকৃতপক্ষে তার প্রেরিত হলেও যে তথ্য সে আমায় পরিবেশন করছে, তা কি সূত্রে সে জানতে পারলো এবং সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কিনা—এসব কিছুই আমি জানি না। এ ধরনের বহুতরো সন্দেহ ও সম্ভাবনা প্রত্যেক তারবার্তায় থাকে। কিন্তু যাদের গোটা কাজকর্ম এ জাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, তারা এসব সন্দেহের প্রতি খুব কম ভ্রূক্ষেপই করে থাকে। বরং তারবার্তাটি তাদেরই প্রতিনিধির প্রেরিত কিনা, বাহ্যিক লক্ষণাদির সাহায্যে তারা কেবল এটুকুই করে নেয়। এভাবে যখন তাদের একটি প্রবল ধারণা জন্মে, তখন তার ভিত্তিতে তারা লাখ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়োজিত করে থাকে।

ধর্মীয় বিষয়গুলোও ঠিক এরূপ। আমাদের সবচাইতে বড়ো ঈমান হচ্ছে কুরআন মজীদের ওপর। এ গ্রন্থটি যে আল্লাহ্‌র কালাম, এ তথ্যটি আমরা মাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে জানতে পেরেছি। আর সে সাক্ষীটি হচ্ছেন মহানবী হযরত রসূলে করীম (স)। নিছক তথ্য হিসেবে এর মধ্যেও সত্য এবং মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা বর্তমান রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও সৎস্বভাব দেখে এবং তাঁর পরিবেশিত তথ্যের যৌক্তিকতা ও সত্যতা লক্ষ্য করে আমরা মিথ্যার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। কিন্তু অপরদিকে আবার বহুতরো লোক এ বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যে সন্দেহ পোষণ করে এবং সন্দেহের ভিত্তিতেই তারা এর সত্যতাকে অস্বীকার করছে। আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা এক

www.bjilibrary.com

সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছি আর তারা তার সাক্ষ্যে সন্দেহ করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। নচেত অহী অবতরণ করতে আমরাও দেখিনি আর তারাও দেখেনি, এ কথা সুস্পষ্ট।

এ দৃষ্টান্তগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সাধারণত মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা জীবনের বিষয়াদিতে খুব বেশী দুর্বল বিশ্বাসী হয় না, প্রত্যেক তথ্যকেই তারা বহু বিচার ও অনুসন্ধান ছাড়া গ্রহণ করে না। আবার তারা মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহমনা ও সংশয়বাদীও হয় না, প্রত্যেক তথ্যের সত্যতা ও বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার প্রতিই তারা সন্দেহ পোষণ করে না এবং প্রত্যেক ব্যাপারে মত স্থির করার জন্যে কেবল অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ কিংবা 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা থেকে অর্জিত হয়—এমন সুদৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞানও দাবী করে না। এ দু' প্রান্তিকধর্মীদের মাঝে সুস্থ বিচার ও বুদ্ধি সুষমপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের কর্মনীতি এই যে, তারা বর্ণনা ও তথ্যাবলীকে সম্ভাব্য সকল অনুসন্ধান উপায়ে যাচাই করে এবং এ যাচাই–পরখে সেগুলোর মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (বিশ্বাস নয়) হলে অমনি বর্জন করে আর সেগুলোর মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (বিশ্বাস নয়) হলে গ্রহণ করে, সেই অনুসারে কাজ করে। অবশ্য অনুসন্ধান ও যাচাই পরখের মাপকাঠিও সমস্ত তথ্যের বেলায় একরূপ হয় না, বরং যে ব্যাপারের সঙ্গে তথ্যটি সংশ্লিষ্ট তার গুরুত্ব এবং তথ্যের প্রকৃতির ওপরই মাপকাঠির কঠোরতা ও নমনীয়তা নির্ভর করে।

এ তো গেল বিষয়টির জ্ঞানগত দিক। এবার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, এই সুষম প্রণালীটি ঠিক বিচার–বুদ্ধিসম্মত এবং এর বিপরীত দুর্বল বিশ্বাস ও সংশয়বাদিতা উভয়ই হচ্ছে বিচার–বুদ্ধির বিরোধী। সত্য বটে যে, বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা সম্ভবপর। এমন কি, ইন্দ্রিয়গোচর পর্যবেক্ষণলব্ধ জিনিসও সন্দেহ করা যেতে পারে। কিন্তু যে কাজটি করা যেতে পারে, তা সম্পাদন করাই বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে সঙ্গত ও সমীচীন হয়ে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পরন্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যেক তথ্য সম্পর্কে কেবল এটুকু সিদ্ধান্ত করে যে, এর মধ্যে সত্য এবং মিথ্যার সমান সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ নিছক তথ্য হিসেবে তা সত্য কিংবা মিথ্যা হওয়ার সমান সম্ভাবনাপূর্ণ এবং এর কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান না থাকা পর্যন্ত কোনো তথ্যকে না সত্য বলা যেতে পারে আর না মিথ্যা বলা চলে। কিন্তু

www.bjilibrary.com

কোনো তথ্যকে নিছক তথ্য হিসেবেই আমাদের কাছে পৌছে না। বরং এর সঙ্গে অবশ্যই বহুতরো আনুষঙ্গিক লক্ষণ বর্তমান থাকে, যেগুলোর সাহায্যে সত্য কিংবা মিথ্যার দিকে পাল্লা অবশ্যই ঝুঁকে পড়ে। নিছক সন্দেহের জায়গাটি অর্থাৎ যেখানে সত্য কিংবা মিথ্যা কোনোটাই নেই—অত্যন্ত সূক্ষ্ম জায়গা—সেখানে মানুষের মন-মানস কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণেই যে কোনো তথ্য বা সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন সন্দেহকে অতিক্রম করে সত্য কিংবা মিথ্যা পর্যন্ত পৌছিবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে—এমন সব কারণ তালাশ করে বেড়ায়। তারপর এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টিকে সে যুক্তিযুক্ত কারণসহ অগ্রাধিকার দেবে কি অযৌক্তিক কারণসহ এটা তার মনের সুস্থতা কি অসুস্থতার ওপর নির্ভর করে। কোনো তথ্যকে অসত্য ঘোষণা করার জন্যে তা 'মুতাওয়াতির' কিংবা একক তথ্য—নিছক এর ভিত্তিটুকু বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে মোটেই যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে কোনো সংবাদ অনেক প্রাচীন কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বহু সূত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে—কেবল এটুকু কথাই তাকে মিথ্যা ঘোষণা করার জন্যে যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কিংবা প্রত্যেক সংবাদদাতাই মিথ্যাবাদী এবং দুনিয়ার সমস্ত সংবাদদাতাই একমত হয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরূপ কল্পনা করতে পারে না। অবিশ্বাসী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের যেসব ধারণা-কল্পনা আচ্ছন্ন করে আছে এবং যেগুলোর ভিত্তিতেই প্রতিটি তথ্যকেই তারা অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তা সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধির বিপরীত। অনুরূপভাবে এর বিপরীত যেসব ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে প্রতিটি সংবাদ এবং প্রত্যেক সংবাদদাতারই সত্যতা স্বীকার করা হয়—তাও বিচার-বুদ্ধি সম্মত নয়। একজন সুস্থ মানস-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি এ দু' চরম ভ্রান্তের মাঝখানে এ পন্থাটিই অবলম্বন করবে যে, সে সামগ্রিকভাবে সকল তথ্যকে যেমন স্বীকার করবে না, তেমনি অস্বীকারও করবে না। বরং প্রতিটি তথ্যকে সে পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে তার বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধান ও অন্বেষণের এক বিশেষ মাপকাঠিতে যাচাই করবে। এ সন্ধান ও যাচাইয়ের ফলে যখন সত্য এবং মিথ্যার মধ্য থেকে কোনো একটির প্রতি প্রবল ধারণার সঞ্চার হবে, তখন তার পক্ষেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এবার আমরা দেখবো, কোনো সংবাদ বা তথ্য যাচাই করার কঠোরতা ও কার্যকরী মাপকাঠি কী হতে পারে। মনে করা যাক, আজ থেকে এক শো

www.bjilibrary.com

বছর পূর্বে জায়েদ নামক এক ব্যক্তি ছিলো। তার সম্পর্কে আমর আমাদের কাছে একটি রেওয়ায়েতর পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এখন জায়েদ সংক্রান্ত এ রেওয়ায়েত সত্য কিনা, তা আমাদের যাছাই করে দেখতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নোক্ত বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারিঃ

(১) রেওয়ায়েতটি আমর পর্যন্ত কিভাবে পৌছলো? মধ্যবর্তী সূত্রগুলো। জায়েদ পর্যন্ত পৌছে কি। মধ্যবর্তী প্রত্যেক রাবী যার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছে, তার সঙ্গে কি সাক্ষাত করেছে? প্রত্যেক রাবী কোন্ বয়সে এবং কি অবস্থায় রেওয়ায়েতটি শুনেছে? রেওয়ায়েতটি কি সে অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করেছে, না তার অর্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছে?

(২) এ একই রেওয়ায়েত কি অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে? বর্ণিত হয়ে থাকলে সমস্ত বর্ণনা কি একরূপ, না বিভিন্ন রূপ? বিভিন্নতা থাকলে তা কতোখানি? বিভিন্নতা স্পষ্টতর হয়ে থাকলে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে কোন্ সূত্রের রেওয়ায়েতটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য?

(৩) যাদের মাধ্যমে এ তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে, তারা কিরূপ লোক? তারা মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসভঙ্গকারী তো নয়? এ রেওয়ায়েতের ভেতর তার কোনো ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বার্থ তো প্রচ্ছন্ন নেই? তাদের মধ্যে সঠিকভাবে কণ্ঠস্থ করা ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করার ক্ষমতা ছিলো কি?

(৪) জায়েদের গঠন-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তাধারা ও তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যেসব মশহুর ও 'মুতাওয়াতির' রেওয়ায়েত অথবা প্রামাণ্য তথ্যাবলী আমাদের কাছে বর্তমান রয়েছে, আলোচ্য রেওয়ায়েত কি তার বিপরীত?

(৫) রেওয়ায়েতটি কি কোনো অসাধারণ ও কল্পনাতীত বিষয়ে-সংশ্লিষ্ট, না সাধারণ ও কল্পনাগ্রাহ্য বিষয় সংক্রান্ত? যদি প্রথম ধরনের হয় তেবে রেওয়ায়েতের সূত্রটি কি এরূপ জিনিস যা বিশ্বাস করার মতো বিপুল, ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্য? আর যদি দ্বিতীয় ধরনের হয় তেবে বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা লাভ করার জন্যে রেওয়ায়েতটির বর্তমান রূপ কি যথেষ্ট?

এ পাঁচটি পন্থায় কোনো সংবাদ বা তথ্য যাচাই পরখ করা যেতে পারে। এ প্রশ্নগুলো যাচাই করার সূত্র যদি আমাদের কাছে বর্তমান থাকে এবং সে

www.bjilibrary.com

সূত্রের সাহায্যে কোনো তথ্য যাচাইয়ের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তা আমাদের অবিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই। আর কোনো তথ্য এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ না হলে তা অবিশ্বাস বা নাকচ করার আমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু যাচাইয়ের সূত্র পুরোপুরি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি তথ্যকে যাচাই করার এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে কতিপয় জাল তথ্যের মিশ্রণ অথবা কতিপয় রাবীর দুর্বলতা প্রতিপাদন কিংবা কতিপয় তথ্য তার বোধগম্য না হওয়ার অজুহাতে সমস্ত তথ্যকেই সে একসঙ্গে মিথ্যা ঘোষণা করে অথবা নাকচ করে দেয়, তাহলে তার চাইতে অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতামূলক কর্মনীতি আর কিছুই হতে পারে না।

এই প্রাথমিক আলোচনা থেকেই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ যদি মহানবীর জীবনাদর্শ ও কর্মনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে না চায় তবে আলাদা কথা। কিন্তু সে যদি হযরতের আনুগত্য ও অনুসরণকে প্রয়োজনীয় মনে করে এবং হযরত তাঁর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবন কিভাবে অতিবাহিতি করেছেন, কোন্ কোন্ কাজ সম্পাদন করেছেন আর কোন্ কোন্‌টি পরিহার করেছেন, কি কি জিনিস জায়েজ করেছেন আর কি কি বারণ করেছেন ইত্যাদি তার বাস্তবিকই জানতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। এখানে সে দেখতে পাবে যে, বর্তমান সময়েও দুনিয়ায় অন্তত ৪/৫ লক্ষ লোক বর্তমান রয়েছে, যাঁদের কাছে হাদীসের গ্রন্থাবলী—ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল, ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমাম–মুহাদ্দিসের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় এসে পৌছেছে। কাজেই এ গ্রন্থগুলো যে তাঁদেরই লেখা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরন্তু তাঁরা প্রতিটি হাদীসের যে সূত্র রসূলে করীম বা সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়েছেন, তা অন্তত তাঁদের যাচাই অনুসারে সত্য ছিলো—এতেও কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই হিজরী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের ইমাম–মুহাদ্দিসগণের কাছে হাদীসের যে জ্ঞানভাণ্ডার ছিলো, এ গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে তা প্রায় নিশ্চিতরূপেই আমাদের কাছে পৌছেছে। এ ছাড়া হাদীস সংক্রান্ত যেসব তথ্য ব্যবহার করে ঐ মুহাদ্দিসগণ হাদীস ও তার রাবীদের জীবনী যাচাই–পরখ করেছিলেন, সে তথ্যগুলোও সম্পূর্ণ আমাদের কাছে পৌছেছে। ইতিপূর্বে একটি তথ্য বা সংবাদ যাচাইয়ের জন্যে আমরা যে প্রশ্নমালা পেশ করেছি, তার প্রতিটি প্রশ্নের

www.bjilibrary.com

বিস্তারিত জবাব প্রায় প্রতিটি হাদীস সম্পর্কেই আমরা এ গ্রন্থগুলোতে পেতে পারি। পরন্তু হাদীস এবং তার যাচাইয়ের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাও পূর্ণ দলিল-প্রমাণ ও কারণসহ সুরক্ষিত রয়েছে। এহেন ব্যাপক, বিস্তৃত ও প্রবল আস্থাসম্পন্ন তথ্যভাণ্ডার বর্তমান থাকতে রসূলে করীমের জীবনের কোনো ঘটনা এবং তাঁর কোনো কথা আজ দুনিয়ায় অবিকৃতরূপে বর্তমান নেই—কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ কথা দাবী করতে পারে না। এরূপ দাবী করার পূর্বে নবুয়াতের যুগ থেকে নিয়ে আমাদের যুগ পর্যন্ত হাদীসের বর্ণনা ও পঠন-পাঠনে নিয়োজিত কোটি কোটি মুসলমানের সবাই কিংবা তাদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী ছিলো এবং তারা সর্বসম্মতভাবে রসূলে করীমের নামে মিথ্যাপবাদ রটানো এবং মুসলমানদের গোমরাহ করে ইসলামের ধ্বংস ও বরবাদ করার কাজেই সারা জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো—এ কথা প্রমাণ করতে হবে। কোনো হাদীস অবিশ্বাসীর কাছে এর প্রমাণ থাকলে তা সে পেশ করতে পারে। আমরা তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার এ বিস্ময়কর আবিষ্কারের সামনে সারা দুনিয়ার গবেষক ও আবিষ্কারকের কৃতিত্ব ধূলিচাপা পড়ে যাবে। কিন্তু তার দাবীর পক্ষে যদি নিছক সংশয়বাদ, মিথ্যাপবাদ এবং কতিপয় ব্যক্তির বোঝা সবার ওপর চাপাবার মতো বিভ্রান্তি ও বিচার-বুদ্ধি বিরোধী কর্মনীতি ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাহলে অন্তত নির্ভুল বিচার-বুদ্ধি ও সুস্থ মানস-প্রকৃতির অধিকারী লোকেরাও তার দাবীকে মেনে নিয়ে হাদীসের গোটা তথ্য-ভান্ডারকে সামগ্রিকভাবে ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করবে—এতোখানি দুরাশা তার পোষণ করা উচিত নয়।

আমরা কখনো এ মত সমর্থন করিনি যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইমাম-মুহাদ্দিসগণের অন্ধ তাকলিদ করা অথবা তাঁদেরকে ভ্রান্তির ঊর্ধে মনে করা উচিত। কিংবা প্রতিটি গ্রন্থে 'ক্বালা রসূলুল্লাহ' দ্বারা যে রেওয়ায়েতের সূচনা হয়েছে, তাকে চোখ বুঝে রসূলে করীমের হাদীস বলে মেনে নেয়া উচিত—এ দাবীও আমরা কখনো করিনি। বরং আমাদের মতে, কোনো হাদীসকে হাদীসে রসূল আখ্যা দেয়ার দায়িত্ব এক বিরাট গুরুদায়িত্ব—প্রচুর পড়া-শোনা ও গবেষণা ছাড়া এ দায়িত্বভার বহনের দুসাহস কখনো করা উচিত নয়। পরন্তু গবেষণা ও ইজ্‌তিহাদ সম্পর্কেও ইসলামের নির্দেশ এই যে, এটি কোনো বিশেষ যুগের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, এর দরজা সকল যুগেই উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু

www.bjilibrary.com

তার অর্থ এ নয় যে, যারা হাদীস শাস্ত্রের গবেষণা এবং তার যথারীতি পড়াশুনা ও অনুসন্ধানে পুরো একটি মাসও ব্যয় করেননি, তারা এ শাস্ত্রের খেদমতে গোটা জীবন অতিবাহিত করে দেন—এমন সব মনীষীর কৃতিত্বের সমালোচনা করবে। কেবল হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপারেই নয়, অপরিপক্ক ও আনাড়ী লোকদেরকে রিসার্স করার এবং বিশেষজ্ঞসুলভ মত প্রকাশ ও মুজতাহিদসুলভ কথা বলার অধিকার দেয়া হয়—দুনিয়ায় এমন জ্ঞানশাস্ত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ যখন কোনো শাস্ত্রের মূলনীতি ও মূলভিত্তিকে আয়ত্বাধীন করে নেয় এবং এতদসম্পর্কিত গোটা জ্ঞানভাণ্ডার তার দৃষ্টিপথে থাকে, কেবল তখনি এ অধিকার সে লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা এ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদের জন্যে উক্ত শাস্ত্রের মনীষী ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, অনুসন্ধান ও মতামত অনুসরণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। সমস্ত দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি উত্তম ও নির্ভুল। একে পরিত্যাগ করে যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ছাড়াই ইজতিহাদ করার দুসাহস করেন, তারা দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই নিজেদের জন্যে অপমান ও লাঞ্ছনা ডেকে আনেন।

(প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৩৪)

www.bjilibrary.com

সুষম মতবাদ

প্রত্যেক মুসলমানই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ধর্মীয় ব্যাপারে নবী করীম (স)–এর কথা ও কাজ তার পক্ষে অবশ্য পালনীয় এবং কুরআনের পর হযরতের কর্মনীতির মাধ্যমেই আমরা দীন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে থাকি। এখন কি কি উপায়ে হযরতের কর্মনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় এবং দীন–ইসলামে তার কোন্ উপায়টির কি গুরুত্ব, সেটাই হলো প্রশ্ন।

যেসব বিষয় হযরতের কাছ থেকে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে, সেগুলো মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। এর প্রথম ভাগটি এসেছে ধারাবাহিক রূপে, কোনোটি ধারাবাহিক কার্যক্রম রূপে আর কোনোটি তথ্যরূপে। প্রথম ভাগটি সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত যে, তা সুনিশ্চিত সত্য। আমাদের বিচার–বুদ্ধিও বলে যে, একে প্রামাণ্য সত্য হিসেবেই স্বীকার করে নেয়া উচিত। কারণ ধারাবাহিক রূপে আগত জিনিস যে সুনিশ্চিত, এটা সর্বজনস্বীকৃত। আর দ্বিতীয় ভাগটিকে নীতিগতভাবে সবাই আনুমানিক বিষয় বলে স্বীকার করে। এ কথা কেউ বলে না যে, তা নিশ্চিত জিনিস। কিন্তু এই নীতিগত আনুমানিকতার ভিত্তিতে একক রাবী বর্ণিত হাদীসের[১] সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে–এ প্রশ্নেই হলো আসল মতানৈক্য। এ ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন মতাবাদ রয়েছেঃ

একদল বলেন যে, হাদীসের গোটা ভাণ্ডারই হচ্ছে অনুমাননির্ভর, এ কারণে তা সমগ্রভাবেই বর্জনীয়। কারণ যা আনুমানিক, তা প্রামান্য নয়, আর যা প্রামাণ্য নয় তা অনুসরণযোগ্যও নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই এ মতবাদটির ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কথা নিসন্দেহ যে, কোনো আনুমানিক জিনিসই প্রামাণ্য নয়, কিন্তু কোনো জিনিস প্রামাণ্য না হলেই তা বর্জনীয় হবে, এ যুক্তি কিভাবে মানা যেতে পারে ? অনুবর্তনের জন্যে নিশ্চিত হওয়াই যদি শর্ত হয়, তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, দুনিয়ার নিশ্চিত জিনিস কয়টি আছে? মানুষ তার জীবনের কয়টি ক্ষেত্রে শুধু নিশ্চিত বস্তুর অনুবর্তন করে এবং

---

১. এখানে মূল পরিভাষাটি হচ্ছে 'খবরে ওয়াহেদ'–অর্থাৎ রসূলের কথা ও কাজ সম্পর্কে এমন বর্ণনা, যা একজন মাত্র বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। ——অনুবাদক

www.bjilibrary.com

আনুমানিক বিষয়কে সমগ্রভাবে বর্জন করে? একটু সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে যে, জীবনে এ নীতি, না কখনো চলেছে আর না চলতে পারে। বস্তুত অনুমান নির্ভর জিনিসকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা যতোখানি ভুল, তাকে সমগ্রভাবে বর্জন করাও ঠিক ততোখানি ভুলা। সুস্থ বিচার বুদ্ধির দাবী এই যে, সমগ্র অনুমান নির্ভর বিষয়কে একই মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত নয় বরং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। প্রতিটি বিষয়কে পৃথকভাবে যাচাই করা উচিত এবং কোন্ বিষয়টি বিশ্বাসের কতোখানি নিকটবর্তী কিংবা কিতোটা দূরবর্তী—পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম প্রয়োগ করে তা সন্ধান করা উচিত। অতপর যে জিনিসটি দূরবর্তী তাকে বর্জন করা উচিত, যে জিনিসটি নিকট ও দূরের মধ্যবর্তী, সে সর্ম্পকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা উচিত। আর যে জিনিসটি নিকটতর, তাকে তার মান অনুসারে গ্রহণ করা উচিত। এ নীতি অনুসারে দুনিয়ার সমগ্র কাজকর্ম সম্পাদন করা হয়, মানুষ এ নীতিই জীবনে অনুসরণ করে চলে। আর যেহেতু আমাদের দীন অযৌক্তিক নয়, সেহেতু দীনি বিষয়াদিতেও এ নীতির অনুবর্তন করা উচিত। অন্তত আমরা কুরআনে এমন একটি আয়াতও পাইনি যা এ নীতিকে সত্যবিরোধী আখ্যা দান করে। যেসব আয়াতে আন্দাজ অনুমানের অনুসারীদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, অনুমান কোনো গোনাহর কাজ কিংবা তা সম্পূর্ণ পরিহার করা ওয়াজিব বরং তার একমাত্র অভিপ্রায় হলোঃ যে আন্দাজ-অনুমান অহীর বিপরীত কিংবা যা অহীর প্রতি বিমুখ ও বেপরোয়া, তাই হচ্ছে গোমরাহীর উৎস।

হাদীসকে সম্পূণত নাকচ করার ফলে কার্যত যে খারাবীর উদ্ভব হয়, তাহলো এই যে, খুঁটিনাটি ও ছোটোখাটো বিষয়ে মানুষ নবুয়াতের পথ নির্দেশ থেকে বঞ্চিত হয় এবং দীন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমানের প্রভাব অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। এর ফলে নীতিগত বিধি-বিধানের মূল ভাবধারাটিই পণ্ড হবার আশঙ্কা থাকে। পরন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে যখন আদৌ কোনো প্রাধিকার (Authourity) থাকবে না তখন স্বভাবতই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভাবশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই মতামত ও ঝোঁক-প্রবণতা অনুসারে যে কোনো পন্থা ইচ্ছা, গ্রহণ করবে। এর ফলে অনৈক্য, বিশৃংখলা ও কর্ম বৈষম্যকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের চরম সীমায় পৌছানো থেকে রোধ করতে পারে—এমন কোনো শক্তিই বাকী থাকবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে জুময়ার নামাযের কথাই ধরা যাক। আমাদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞানের

www.bjilibrary.com

যেসব মাধ্যম রয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কুরআন। এ কুরআন আমাদের শুধু এটুকু নির্দেশ দেয় যে, যখন জুমায়ার নামাযের জন্যে ডাকা হয়, তখন সব কাজকর্ম ছেড়ে ছুটে যাও। দ্বিতীয় মাধ্যম অর্থাৎ ধারাবাহিক কার্যক্রম আমাদেরকে এর চাইতে আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। সে আমাদেরকে এটুকু শিক্ষা দেয় যে, জুময়ার সময় হচ্ছে জোহরেরর সময়। এর জন্যে জামায়াত অপরিহার্য। এর প্রথমে খোতবা হওয়া প্রয়োজন। এর রাকায়াত মাত্র দু'টি। এর জন্য আজান বা সাধারণ আহ্বানও একান্ত জরুরী। এ বিষয়গুলো ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে আর যতো খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে,তার কোনো একটি জিনিসও আমরা কুরআন ও 'ধারাবাহিক কার্যক্রমের' সাহায্যে জানতে পারি না। এখন যদি একক রাবী বর্ণিত হাদীসকে সামগ্রিকভাবে নাকচ করে দেবার নীতিই গ্রহণ করা হয়, তাহলো ফল দাঁড়াবে এই যে, প্রত্যেকেই নিজস্ব পসন্দ ও মতানুসারে খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারণ করবে। কোনো মতেই অপরাপর মতের মুকাবিলায় কোনো অগ্রাধিকার পাবেনা এবং মুসলমানদের কোনো বিরাট দলের পক্ষেই তার অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এর দ্বারা খুঁটিনাটি বিষয়ে কিরূপ অনৈক্য ও বৈপরিত্যের সঞ্চার হবে, সমাজ ব্যবস্থার কতোখানি ক্ষতিসাধিত হবে এবং বিভিন্ন অবস্থায় শরীয়াতের উদ্দেশ্য পর্যন্ত কিভাবে পন্ড হয়ে যাবে— তা সহজেই অনুমেয়।

এ কথা নিসন্দেহ যে, একক রাবী বর্ণিত হাদীস সূত্রে যে বিস্তারিত বিবরণ জানা গিয়েছে, তাও কতকটা বিভিন্নরূপী এবং তার ভিত্তিতেও বিভিন্ন মজহাব সৃষ্টি সম্ভবপর। কিন্তু প্রথমত তাতে বড়োজোর ৫/৭টি মজহাব সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ থেকে যতোগুলো মজহাব সৃষ্টি হয়, তার প্রত্যেকের কাছেই এক সর্বোচ্চ প্রাধিকার (Authority) বর্তমান রয়েছে— যাকে সমস্ত মুসলমানই স্বীকার করে এবং যার শক্তির বলে মুসলমানদের এক বিরাট অংশ তার অনুবর্তন করে। পক্ষান্তরে একক রাবী বর্ণিত হাদীসকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেবার পর বেশুমার মজহাব সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে কোনো মজহাবের কাছেই এমন কোনো প্রাধিকার (Authority) থাকবে না, যা মাত্র দু'জন মুসলমান সমাজকেও কোনো ক্ষুদ্রতর প্রশ্নে একটি কর্মনীতির ভিত্তিতে একত্রিত করতে পারে। এর পরিণতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এর ফলে জুময়ার বৃহত্তর শক্তি খতম হয়ে যাবে। আর সে উদ্দেশ্যে জুময়ার নামায ফরয করা হয়েছে, লোকদের কর্ম–বৈষম্য সে উদ্দেশ্যকেও পণ্ড করে ছাড়বে।

www.bjilibrary.com

জুময়ার প্রশ্নটিকে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবেই পেশ করলাম। নচেত একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, যে জিনিসটি ইসলামের শরয়ী ব্যবস্থাকে এক স্থায়ী অপরিবর্তনীয় কার্যকর ব্যবস্থায় পরিণত করে এবং যা মুসলমানদের তাহজিব, তামাদ্দুন, সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি–তথা গোটা সমাজ জীবন ও ব্যক্তিক আচরণকে এক সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃতরূপে ঢালাই করে, তা এ এককধারা বর্ণিত হাদীস থেকে অর্জিত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। রসূলে করীম (স)–এর প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত (Private) জীবন, তাঁর অভ্যাস ও আখলাক, তাঁর এবাদাত–বন্দেগী, তাঁর শিক্ষা ও প্রচার তাঁর বিচারের পদ্ধতি, তাঁর আইনানুগ ফায়সালা, বিভিন্ন বিষয়ে তার পথনির্দেশ, তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর খলীফা, সাহাবা, পারিবারিক সদস্য ও তাবেয়ী'দের অনুসৃত নীতি–ইত্যাকার জিনিসগুলোই ইসলামের বাস্তব জীবনের পূর্ণাঙ্গ নকশা পেশ করে। আর এ নকশার ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু এ জিনসগুলো অর্জন করার মাধ্যম–কুরআনও নয় আর ধারাবাহিক কার্যক্রমও নয়। বেকলমাত্র একক রাবী বর্ণিত হাদীসই জ্ঞান–তথ্য ও পথনির্দেশের এ বিশাল ভাণ্ডারকে আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছে। পরন্তু একে বর্জন করে দেখুন, ইসলামের নেহায়েত একটি প্রাণহীন কাঠামোই থেকে যাবে–তার ওপর কোনো রক্ত মাংসের সৃষ্টি হবে না। তার আকার–আকৃতি ও রূপ–প্রকৃতিকে যার যেমন ইচ্ছা–তৈরী করে নেবে। বস্তুত এরূপ অবস্থায় কোনো সমাজ ব্যবস্থাই দাঁড়াতে পারবে না–ইসলামী সভ্যতার নামে কোনো সভ্যতার গোড়াপত্তন তো দূরের কথা। এ কারণেই যারা ইসলামী সভ্যতা ও জীবন পদ্ধতিকে চূরমার করতে চায়, মূলত তারাই আজ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তারা এর সীমারেখার মধ্যে নিজস্ব ইচ্ছা–অভিরুচি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কোনো অবকাশ খুঁজে পায় না ; এ করণেই তারা যে জিনিসটি এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, প্রথমত তাকে নিশ্চিহ্ন করার এবং তারপর স্বাধীনভাবে ইসলামের কাঠামোর ওপর রক্ত মাংম সৃষ্টি করার ও তার রূপ–প্রকৃতি বদলে দেবার মতবাদ গ্রহণ করেছে।

এ সব লোক হাদীসশাস্ত্রকে সামগ্রিকভাবে ভ্রান্ত আখ্যা দেবার জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কতকগুলো বিশেষ ধরনের হাদীস পেশ করে। যেসব হাদীস পরস্পর বিরোধী, যেগুলো নবীদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক, যেগুলো স্পষ্টত বিচার–বুদ্ধির বিপরীত, কিংবা যেগুলোকে কুরআনের বিরোধী মনে হয়, সেসব হাদীসকে এরা নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে দলিল হিসেবে উত্থাপন করে। এ ধরনের

www.bjilibrary.com

কয়েকটি হাদীসের সাহায্যেই এরা হাদীসের গোটা ভাণ্ডারকে ভ্রান্ত ও বর্জনীয় বলে যুক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু এ যুক্তিধারা হচ্ছে কোনো জাতির কতিপয় দুর্বৃত্তের দ্বারা গোটা জাতিকেই দুর্বৃত্ত বলে যুক্তি প্রদর্শন করার অনুরূপ। বস্তুত মূল বচন ও সূত্রের দিক দিয়ে প্রতিটি রেওয়ায়েতই যখন অপর রেওয়ায়েত থেকে ভিন্ন, তখন প্রতিটি রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য কি বর্জনীয়, তা পৃথক পৃথকভাবে বাছবিচার করেই সিদ্ধান্ত করা উচিত। সবগুলোকে এক সমষ্টি হিসেবে ধরে নিয়ে গোটা হাদীস ভাণ্ডার সম্পর্কে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোনো বুদ্ধিমান লোকের কাজ হতে পারে না। আপত্তিকারীরা যদি হাদীসগুলোর প্রতি পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করতো, তাহলে তারা প্রকৃত সত্য বুঝতে পারতো, হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে এমন কিছুসংখ্যক হাদীস আছে বটে, যেগুলো দেখা মাত্রই মন সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস হতে পারে না ; কিন্তু সেখানে এমন বিপুল সংখ্যক হাদীসও রয়েছে, যেগুলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদে পরিপূর্ণ, যেগুলোয় আইন-কানুন ও নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম মূলনীতি বর্তমান, যেগুলো ইসলামের স্বরূপ এবং তার যৌক্তিতা ও বিচক্ষণতার প্রতি চমৎকারভাবে আলোকপাত করে এবং যেগুলো দেখামাত্র মন সাক্ষ্য দেয় যে, এ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রসূলেরই হাদীস হতে পারে। পরন্তু এ লোকগুলো সত্যসন্ধ ও ন্যায়পরায়ণ হলে এও দেখতে পেতো যে সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ নবুয়াতের যুগ ও সাহাবাদের যুগের হাদীস ও 'আছার'[১] সংগ্রহ করার এবং সেগুলোর বাছবিচার ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে যে মেহনত করেছেন, দুনিয়ার কোনো মানবগোষ্ঠী কোনো ইতিহাসের জন্যেই তা করেননি। তাঁরা হাদীসের যাচাই বাছাইয়ের জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কোনো বিগত যুগের ইতিহাস বিচারের জন্যে তার চাইতে উত্তম পদ্ধতি আজ পর্যন্ত মানবীয় বুদ্ধি উদ্ভাবন করতে পারেনি। মানুষের কাছে সত্যাসত্য বিচারের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য যেসব উপায় রয়েছে, তার সবই তাঁরা ব্যবহার করেছেন এবং এমনি কঠোরভাবে ব্যবহার করেছেন যে, ইতিহাসের কোনো যুগেই তার নজীর মেলে না। প্রকৃতপক্ষে এ জিনিসটি আমাদের মনে এই প্রতীতিই জন্মায় যে, এ বিরাট খেদমতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার তাওফীকই সর্বদা তাদের সহায়ক ছিলো। যে আল্লাহ্ তাঁর সর্বশেষ কিতাবের সংরক্ষণের জন্যে অসাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তিনিই তাঁর সর্বশেষ নবীর

---

১. সাহাবাদের কথা ও কাজ সংক্রান্ত বর্ণনাকে 'আছার' آثار বলা হয়। —অনুবাদক

www.bjilibrary.com

পদচিহ্ন ও পথনির্দেশের হেফাজতের জন্যে অতুলনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নচেত এতবড় কাজ কিছুতেই সম্ভবপর হতো না।

যারা হাদীসকে নীতিগত আনুমানিকতার কারণে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিতে চান, এ পর্যন্ত শুধু তাদের সম্পর্কেই বলা হলো। এবার এর বিরপীত প্রান্তিক–ধর্মী দলটির কথা ধরা যাক। এ দলের লোকেরা মুহাদ্দিসদের অনুসরণ করার ব্যাপারে সঙ্গত সীমার চাইতে অনেক বেশী কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে। এদের বক্তব্য হলো, মুহাদ্দিসগণ দুধ থেকে পানি পৃথক করার ন্যায় প্রতিটি হাদীসকে যাচাই বাছাই করে কোন্‌টি কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য আর কোন্‌টি কতোখানি অবিশ্বাসযোগ্য, তা চূড়ান্তভাবে বাতলে দিয়ে গিয়েছেন। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হলো, এ মহাত্মাগণ হাদীসের যে মর্যাদা নিরূপণ করে দিয়েছেন, সে অনুসারে তাদেরকে বিশ্বাস ও দলিলের মর্যাদা দান করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেটি সুদৃঢ় সনদ সম্বলিত, সেটির মুকাবিলায় দুর্বল সনদ সম্বলিত হাদীসকে বর্জন করা ; তাঁরা যাকে অভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে গিয়েছেন, তাকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা এবং যার সত্যতা খণ্ডন করে গিয়েছেন, তার পক্ষে আদৌ যুক্তি প্রদর্শন না করা। তাঁদের নির্ধারিত সুকৃতিকে সুকৃতি আর দুষ্কৃতিকে দুষ্কৃতি বলে গ্রহণ করা। রাবীদের স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা, সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব মতামত তাঁরা ব্যক্ত করে গিয়েছেন, সেগুলোর প্রতি প্রায় ঈমান পোষণ করা। তাঁদের দৃষ্টিতে হাদীসের নির্ভর বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ার যে মাপকাঠি রয়েছে, ঠিক সেই মাপকাঠিই আমাদের অনুসরণ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মশহুরকে শাজে'র পর, মা'রুফকে মুরসালের পর এবং মুসালসালকে মুনকাতা'র পর অবশ্যই অগ্রাধিকার দেয়া এবং তাঁদের অঙ্কিত সীমারেখা চুল পরিমাণও অতিক্রম না করা। বস্তুত এরূপ মতবাদ এবং এর কঠোরতাই বহুতরো স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লোককে হাদীসের পূর্ণ বিরোধিতা তথা দ্বিতীয় প্রান্তসীমার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মুহাদ্দিসগণ যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা সর্বজনস্বীকৃত। এও স্বীকৃত যে, তাঁরা হাদীস বিচারের জন্যে যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা প্রথম যুগের হাদীস ও আছারের সত্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে খুবই কার্যকরী। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই ; বরং তাঁদের ওপর সম্পূর্ণত নির্ভর করা কতোখানি সঙ্গত, প্রশ্নটি কেবল এখানেই নিহিত। কারণ তাঁরা ছিলেন মানুষই। মানবীয় জ্ঞানের জন্যে আল্লাহ যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা

www.bjilibrary.com

অতিক্রম করতে তাঁরা সমর্থ ছিলেন না। মানবীয় কাজকর্মে স্বভাবতই যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তা থেকে তাঁদের কাজও মুক্ত ছিলো না। তাহলে তাঁরা যাকেই অভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছেন, তাই অভ্রান্ত হবে এ কথা কী করে বলা যায়? বস্তুত কোনো জিনিসের নির্ভুল বা অভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের নিজেদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস ছিলো না। তাঁরাও বড়োজোর এটুকুই বলতেন যে, এ হাদীসের যথার্থতা সংক্রান্ত অনুমানটা খুব প্রবল। পরন্তু এ প্রবল অনুমানটাও তাঁরা লাভ করতেন নেহায়েত রেওয়ায়েতের দৃষ্টিতেই-হাদীসের মূল বচনের (درايت) দৃষ্টিতে নয়। তাদের বেশীর ভাগ দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো তথ্যনির্ভর। ফিকাহ তাঁদের আসল বিষয়বস্তু ছিলো না। এ কারণে ফিকাহসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা ফকীহ মুজতাহিদদের তুলনায় স্বভাবতই দুর্বল ছিলেন। কাজেই তাঁদের কৃতিত্বের সঙ্গত স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে যে, হাদীস সম্পর্কে তাঁরা যা কিছু তথ্যানুসন্ধান করেছেন, তাতে দু' রকমের দুর্বলতা বর্তমান রয়েছে। একটি হচ্ছে সনদ বা সূত্রের দিক থেকে, দ্বিতীয়টি 'তাফাককুহ' বা অনুধ্যানের দিক থেকে।

এ বিষয়টিকে সুস্পষ্টরূপে বোঝার জন্যে আমরা দু'রকমের ত্রুটি সম্পর্কেই কিঞ্চিত আলোচনা করবো।

কোনো রেওয়ায়েত যাচাই করার ব্যাপারে সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করা হয় যে, রেওয়ায়েতটি যাদের মাধ্যমে এসেছে, তারা কি রকমের লোক। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে এক একজন রাবীকে যাচাই পরখ করা হয়। তাঁরা তো মিথ্যাবাদী নন? রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ব্যাপারে তো অসতর্ক নন? ফাসেক, ফাজের ও ভ্রান্তবিশ্বাসী তো নন? কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা দুর্বল স্মৃতিসপন্ন তো নন? তাঁরা কি অপরিচিত না সুপরিচিত ব্যক্তি? এ সকল দিক থেকে রাবীদের জীবনী যাচাই পরখ করে মুহাদ্দিসগণ 'আসমাউর রিজাল' সংক্রান্ত বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেছেন, যা নিসন্দেহে অতীব মূল্যবান। কিন্তু এর কোন্ জিনিসটিতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই? প্রথমত রাবীদের জীবনী, তাঁদের স্মৃতিশক্তি এবং তাঁদের অন্যান্য গোপন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, তাদের সম্পর্কে যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, খোদ তারাই মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে ছিলেন না। 'নফস' নামক বস্তুটি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিলো। আর লোকদের সম্পর্কে ভালো বা মন্দ সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত ঝোঁকপ্রবণতাও কতকাংশে

www.bjilibrary.com

প্রভাবশীল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিলো। এ সম্ভাবনা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনাই নয়, বরং বহুবার এটি যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এরও প্রমাণ রয়েছে। হাম্মাদের (حماد) মতো একজন বুজর্গ ব্যক্তি হেজাজের গোটা আলেমদের সম্পর্কে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'তাদের জ্ঞানের বালাই নেই; তোমাদের শিশুরাও তাদের চাইতে বেশী জ্ঞানের অধিকারী।' আতা (عطا) , তাউস (طاوس) ও (مجاهد) মুজাহিদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও তাঁর এই অভিমত। এই হাম্মাদ কে? ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফার ওস্তাদ এবং ইবরাহীম নাখয়ীর উত্তরাধিকারী। ইমাম জুহরীর কথা দেখুন। সমকালীন মক্কাবাসীদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করছেনঃ مَارَأَيْتُ انقَضَ لَعَرَى الاسْلاَمَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ অথচ মক্কায় তখন উচ্চ শ্রেণীর আলেম ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের অভাব ছিলো না। শাবী (شعبى) এবং ইবরাহীম নাখয়ী উভয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু একে অপরের প্রতি কিরূপ আঘাত হানছেন। শা'বী বলছেনঃ 'ইবরাহীম নাখয়ী রাত্রে আমার কাছ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে নেয় আর সকালে তা লোকদের সামনে নিজের তরফ থেকে বর্ণনা করে। ইবরাহীম নাখয়ী বলছেনঃ 'সে (শা'বী) কাজ্জাব মসরূক থেকে বর্ণনা করে অথচ সে মসরূকের সঙ্গে সাক্ষাত পর্যন্ত করেনি।'

এভাবে যেহাকের (ضحاك) অবস্থা দেখুন। একবার তিনি নিজের কথার আতিশয্যে এসে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলে ফেললেনঃ 'আমি তাঁদের চাইতে বেশী জানি।' সাঈদ বিন্ জাবীরের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি একবার একটি ব্যাপারে শা'বীর বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ করেন এবং আকরামাহ্ সম্পর্কে নিজের গোলামের কাছে বলেনঃ لاَ تَكْذِبْ عَلَىَّ كَمَا كَذَبَ عِكْرِمَةُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ইমাম মালেকের উচ্চ পদমর্যাদার প্রতি একবার তাকান, আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের মতো ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর এ উক্তিও দেখুনঃ ذَالِكَ دَجَّالٌ الدَّجَاجِلَةِ এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তিনি ইরাকের গোটা আলেম সমাজকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন এবং তাঁদের সম্পর্কে বলেনঃ اَنْزِلُوْهُمْ مُنْزِلَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ لاَتُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ ইমাম আবু হানিফা কতোখানি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল ফকীহ্; অথচ তিনি আ'মাশ (اعمش) সম্পর্কে বলেন যে, সে কখনো রমযানে রোযা রাখেনি, নাপাকীর জন্যেও গোসল করেনি। এর একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, আ'মাশ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ মতের সমর্থক ছিলেন এবং হোজায়ফার

www.bjilibrary.com

হাদীস মুতাবেক সেহরী খেতেন। আবদুল্লাহ্ বিন্ মুবারক কীরূপ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। অথচ একবার তাঁর ওপরও একগুঁয়েমী প্রভাবশীল হয়ে বসে এবং ইমাম মালেক সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকে এ উক্তি নির্গত হয়ঃ 'আমি তাঁকে আলেমই মনে করি না।' ইয়াহইয়া বিন্‌মুয়ীন তো বড়ো বড়ো মর্যাদাশালী ব্যক্তির ওপর আঘাত হেনেছেন। জুহরী, আওয়াজায়ী, আবু ওসমান হিন্দী, তাউস–এক কথায় তৎকালীন বড়ো বড়ো লোকদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এমন কি, ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, لَيْسَ بِثِقَةٍ ।

এসব কিছুর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কখনো –কখনো সাহাবায়ে কেরামের ওপরও মানবিক দুর্বলতা প্রভাবশীল হয়ে বসতো এবং তাঁরা একে অপরের ওপর কঠোর আঘাত হানতেন। একবার ইবনে উমর (রা) শুনতে পেলেন যে, আবু হোরায়রা বেতেরকে আবশ্যকীয় মনে করেন না। অমনি বললেন ঃ 'আবু হোরায়রা মিথ্যাবাদী।' হযরত আয়েশা একবার আনাস (রা) এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা) সম্পর্কে বলেন যে, 'ওরা হাদীসে রসূলের কী জানে। ওরা তো তখন শিশু ছিলো।' হযরত হাসানের কাছে একবার شَاهِد وَ مَشْهُود এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি তার অর্থ বিবৃত করলেন। বলা হলো যে, ইবনে উমর (রা) এবং ইবনে জোবায়ের (রা) তো এমন এমন বলেন। তিনি বললেনঃ 'ওরা উভয়ে মিথ্যাবাদী।' হযরত আলী (রা) একবার মুগীরাহ বিন শো'বাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেন। উবাদাহ্ বিন ছামেত একদা একটি মাসয়ালা বর্ণনা প্রসঙ্গে মাসউদ বিন আওস আনসারীকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেন অথচ তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্যতম।[১]

এসব দৃষ্টান্ত পেশ করার মূলে আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত তামাম জ্ঞান–তথ্যই ভ্রান্ত। বরং আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই ব্যক্ত করা যে, যাঁরা রাবীদের যাচাই বিচার ও সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন। তাদের সঙ্গেও মানবীয় দুর্বলতার প্রশ্ন জড়িত ছিলো। তারা যাকে খাঁটি বলেছেন, সে সুনিশ্চিতভাবে খাঁটি এবং তার সমস্ত রেওয়ায়েত খাঁটি হবে আর যাকে অখাঁটি বলেছেন, সে সুনিশ্চিতভাবে অখাঁটি

১. এসব উদাহরণ আল্লামা ইবনে আবদুল বারকী রচিত গ্রন্থ "জামে বয়ানুল ইলম" থেকে উদ্ধৃত।

www.bjilibrary.com

এবং তার সমস্ত বর্ণনাই বিশ্বাসের অনুপযোগী হবে এর কী আবশ্যকতা রয়েছে। তারপর এক একজন রাবীর স্মৃতিশক্তি, তার সদিচ্ছা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা তো আরো কঠিন ব্যাপার। আর সবচাইতে কঠিন ব্যাপার হলো, ফকীহসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে মাসয়ালা উদ্ভাবনে যেসব প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে, প্রত্যেক রাবী প্রতিটি রেওয়ায়েতের বর্ণনায় সেসব খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন কিনা, তা অনুসন্ধান করা।

এতো গেলো রাবীদের অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়। এরপর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো সনদ বা সূত্রের ধারাবাহিকতা। মুহাদ্দিসগণ এক একটি হাদীস সম্পর্কে এ তথ্যগুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন যে, প্রত্যেক রাবী যার কাছ থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন, সে তার সমসাময়িক ছিলো কিনা, সমসায়িক হলে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন কিনা, সাক্ষাত করে থাকলে এ বিশেষ হাদীসটি তার কাছ থেকেই শুনেছেন, না অন্য কারো থেকে শুনে নিয়েছেন কিন্তু তার উল্লেখ করেননি? এসব বিষয়ে মানুষ যতোখানি অনুসন্ধান করতে পারে, তাঁরা ঠিক ততোটাই করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক রেওয়ায়েতের অনুসন্ধানে এ বিষয়গুলো তাঁরা সঠিকভাবে জানতে পেরেছেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সম্ভবত যে রেওয়ায়েতকে তাঁরা অবিচ্ছিন্ন সূত্র সমন্বিত আখ্যা দিচ্ছেন, তা মূলতই বিচ্ছিন্ন এবং তাঁরা এও জানতে পারেননি যে, মাঝখানে কোনো অপরিচিত অথচ অখাঁটি রাবী বাদ পড়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব রেওয়ায়েত মুরসাল, মু'যিল কিংবা মুনকাতি' এবং এ হিসেবে বিশ্বাসের অনুপযোগী বলে বিবেচিত, সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি হয়তো খাঁটি রাবীদের থেকে এসেছে এবং সম্পূর্ণ অভ্রান্ত।

এ ধরনের বহুতরো বিষয় রয়েছে, যেগুলোর কারণে সনদ এবং বাছবিচার সংক্রান্ত জ্ঞানকে সম্পূর্ণত–নির্ভুল মনে করা চলে না এ জিনিসগুলো সুন্নাতে নববী এবং সাহাবাদের নিদর্শনাবলী সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কার্যে সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য এবং এগুলোর প্রতি যথোপযুক্ত লক্ষ রাখা উচিত। কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণতা নির্ভরযোগ্য কোনো জিনিস নয়।

ওপরে যেমন বলেছি, রেওয়ায়েতের দৃষ্টিতে তথ্য ও নিদর্শনাদির অনুসন্ধান করাই ছিলো মুহাদ্দিসগণের প্রধান বিষয়বস্তু। এ কারণেই তাদের ওপর তথ্যমূলক দৃষ্টিকোণ প্রভাবশীল হয়ে বসেছিলো। কোনো রেওয়ায়েতকে

www.bjilibrary.com

নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করার ব্যাপারে সনদ ও রাবীর দৃষ্টিতে, সেটি কিরূপ–প্রধানত এ জিনিসটির প্রতিই তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন। আর ফকীহসুলভ দৃষ্টিকোণ (অর্থাৎ হাদীসের বচন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে তা গ্রহণযোগ্য কিনা সিদ্ধান্ত করা) তাঁদের প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক প্রকার অপ্রসাঙ্গিক ছিলো। এ কারণেই বেশীর ভাগ সময় এ বিষয়টি তাদের দৃষ্টিপথ থেকে অপসৃত হয়ে যেতো। এদিক থেকে তারা রেওয়ায়েতের ওপর খুব কমই দৃষ্টিপাত করতেন। আর এ করণেই অনেক ক্ষেত্রে এরূপও হয়েছে যে, একটি রেওয়ায়েতকে তাঁরা নির্ভুল আখ্যা দিয়েছেন, অথচ অর্থের দিক থেকে তা তেমন বিশ্বাসের যোগ্য নয়। অপর একটি রেওয়ায়েতকে তারা কম বিশ্বাসযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন, অথচ অর্থের দিক থেকে তা নির্ভুল মনে হয়। এখানে উদাহরণ দিয়ে বিস্তৃতভাবে এ দিকটির ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। কিন্তু যারা শরয়ী বিষয়াদিতে দূরদৃষ্টির অধিকারী, তাদের কাছে এটা প্রচ্ছন্ন নয় যে, মুহাদ্দিসসুলভ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে বহুতরো ক্ষেত্রে ফকীহসুলভ দৃষ্টিকোণের সংঘর্ষ হয়েছে এবং ফকীহ–মুজতাহিদগণ যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস থেকেও বিধি–বিধান ও মাসয়ালা মাসায়েল উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেননি।

এ আলোচনা থেকে এ কথা জানা গেলো যে, হাদীসকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেবার পক্ষপাতি ব্যক্তিরা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি হাদীসকে অনুসরণ করার ব্যাপারে শুধু রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরাও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত নয়। প্রকৃত ও নির্ভুল মতবাদ এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত আর তা হচ্ছে ইমাম–মুজতাহিদগণের অবলম্বিত মতবাদ। ইমাম আবু হানীফার ফিকাহশাস্ত্রে প্রায়শ এ ধরনের মাসায়েল দেখা যাবে, যা মুরসিল, মু'যাল ও মুনকাতি হাদীসের ওপর নির্ভরশীল কিংবা যেগুলোতে কোনো শক্তিশালী সূত্র সম্বলিত হাদীসকে বর্জন করে কোনো দুর্বল সূত্র সম্বলিত হাদীসকে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা যেগুলোতে হাদীস এক কথা বলেছে আর ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ অন্য কথা বলেছেন। ইমাম মালেকের অবস্থাও এরূপ। তাঁর ওপর তথ্যমূলক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত প্রভাবশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুধ্যান (تفقه) তাঁকে এমন হাদীসের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে বাধ্য করেছে, যেগুলোকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তাই লাইস বিন সা'দ তাঁর ফিকাহ থেকে এ ধরনের প্রায় ৭০টি বিষয় বের করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর অবস্থাও এর

www.bjilibrary.com

থেকে বেশী কিছু ভিন্ন ছিলো না। মায়াজাল্লাহ, এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, এরা কোনো হাদীসকে সহীহ জেনেও তাকে অগ্রাহ্য করতেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিলো এই যে, তাদের দৃষ্টিতে হাদীসের সত্যতা বিচারের মাপকাঠি একমাত্র সনদ বা সূত্র ছিলো না, বরং সূত্র ছাড়াও আর একটি মাপকাঠি দ্বারা তাঁরা হাদীসকে যাচাই করতেন এবং যে হাদীস প্রকৃত সত্যের নিকটবর্তী বলে তাদের মনে প্রতীতি জন্মাত, মুহাদ্দিসসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে তা যতোই 'মারজূহ,' হোক না কেন–তাকেই গ্রহণ করতেন।

এ দ্বিতীয় মাপকাঠিটা কি? আমরা এর পূর্বেও ইঙ্গিতে কয়েকবার এর উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা যাকে فقه বা অনুধ্যান শক্তি দান করেছেন, কুরআন ও নবী–চরিতের গভীরতর অধ্যয়নের ফলে তার ভেতর এক বিশেষ মেজাজ বা বিচার শক্তির (Taste) সৃষ্টি হয়–ঠিক যেমন, কোনো প্রবীণ মণিকারের মধ্যে মণিমুক্তার সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যটি পর্যন্ত যাচাই করার মতো এক অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়। তার দৃষ্টি সামগ্রিকভাবে শরীয়াতের গোটা পদ্ধতির ওপর প্রসারিত এবং সে এ পদ্ধতির মূল প্রকৃতিকে চিনে নেয়। এরপর যখন তার সামনে খুঁটিনাটি বিষয় আসে তখন কোন্ জিনিসটি ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর কোন্‌টি সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার বিচারশক্তিই তাকে বাত্‌লে দেয়। সে যখন রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন সে ক্ষেত্রেও এ মাপকাঠিই গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ডে পরিণত হয়। ইসলামের মেজাজ হচ্ছে–ঠিক নবী করীমের মেজাজ। যে ব্যক্তি ইসলামের মেজাজকে বোঝে এবং ব্যাপকভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের গভীরতর অধ্যয়ন করে থাকে, সে নবী করীমের মেজাজের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে যায়। হাদীস সংক্রান্ত রেওয়ায়েত দেখার পর তার ভেতর কোন্ উক্তি বা কাজটি মহানবীর হতে পারে আর কোন্ জিনিসটি সুন্নাতে নববীর নিকটবর্তী, তা স্বভাবতই তার অন্তর্দৃষ্টি তাকে বাতলে দেয়। কেবল এটুকুই নয়, বরং যেসব বিষয়ে সে কুরআন সুন্নাহ থেকে কোনো স্পষ্ট পথনির্দেশ পায় না, সেসব ব্যাপারেও সে বলতে পারে যে, অমুক প্রশ্নটি নবী করীমের সামনে উত্থাপিত হলে তিনি এমনিভাবে তার মীমাংসা করতেন। এটা এ কারণে সম্ভবপর যে, তার রূহ্ 'রূহে মুহাম্মাদীর' ভেতর বিলীন এবং তার দৃষ্টি নববী অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তার মন–মগজ ইসলামের ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় এবং ইসলাম যেরূপ চায় সেভাবেই সে দেখতে এবং

www.bjilibrary.com

ভাবতে অভ্যস্ত হয়। এ পর্যায়ে পৌছার পর মানুষ সূত্র বা সনদের খুব বেশী মুখাপেক্ষী থাকে না। সে সনদ থেকে অবশ্যই সাহায্য গ্রহণ করে, কিন্তু তার ফায়সালা এর ওপর নির্ভর করে না। সে কখনো কখনো এক দুর্বল, উপেক্ষিত, বিচ্ছিন্ন সনদ, নিন্দনীয় হাদীসকেও গ্রহণ করে, এ কারণে যে, তার দৃষ্টি এই অনাদৃত পাথরের মধ্যকার হীরকের জ্যোতি দেখতে পায়। আবার কখনো কখনো এক নির্দোষ, অব্যতিক্রম, অবিচ্ছিন্ন সূত্র ও জনপ্রিয় হাদীস থেকেও সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, কারণ এ স্বর্ণ পেয়ালায় যে অর্থের পানীয় ভরা রয়েছে, তার কাছে তা ইসলামের প্রকৃতি ও নববী মেজাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়না।

এ জিনিসটি সম্পূর্ণ বিচারশক্তি সংক্রান্ত ; এ কোনো আইন বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালিত নয়। এ কারণেই এতে মতানৈক্যের অবকাশ পূর্বেও ছিলো এখনো আছে আর ভবিষ্যতেও থাকেব। বস্তুত এ কারণেই ইমাম মোজতাহিদগণের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রচুর মতানৈক্য হয়েছে। পরন্তু এক ব্যক্তির বিচারশক্তি আগাগোড়া অন্য ব্যক্তির বিচারশক্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে এটা এমনও কোনো জিনিস নয়। এ কারণেই দেখা যায় যে, একই মতের ইমামরা বহুতরো বিষয়ে পরস্পরে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর সহচরদের কথাবার্তায় যে মতানৈক্য দেখা যায়, তা এরই উজ্জ্বল প্রমাণ। তাছাড়া পত্যেক মুজতাহিদেরই বিচারশক্তি প্রতিটি ব্যাপারেই নির্ভুল কাজ করবে–এটাও জরুরী নয়। মানুষ সর্বদাই দুর্বলসত্তা। সুতরাং কোনো উচ্চতম মানের মুজতাহিদও ভুল করতে পারেন এবং তা করেও থাকেন। এ কারণে ইমাম–মুজতাহিদগণ হামেশা ভয় করতেন ; তারা আপন অনুবর্তিদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করো না ; বরং নিজেরাও সত্য অনুসন্ধান করতে থাকো। যখন কোনো সুন্নাত আমাদের কথার বিরোধী সাব্যস্ত হবে, তখন আমাদের কথা বর্জন করে সুন্নাতের অনুবর্তন করো।' ইমাম আবু ইউসুফ বলছেনঃ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ مُقَالَتَنَا حَتّٰى يَعْلَمَ مِنْ اَيْنَ قُلْنَا (আমাদের কথার উৎস কি, তা অনুসন্ধান না করেই তার ভিত্তিতে ফর্তোয়া দেয়া কারো পক্ষে জায়েজ নয়) ইমাম জুফরের (زفر) উক্তি হচ্ছেঃ

اِنَّمَانَأْخُذُ بِالرَّأْيِ مَالَمْ نَجِدِ الْاَثَرَ فَاِذَا جَاءَ الْاَثَرُ تَرَكْنَا الرَّأْيَ وَاَخَذْنَابِالْاَثَرِ–

www.bjilibrary.com

(যখন আমরা কোনো হাদীস পাই না, তখন নিজস্ব মতানুসারে ফায়সালা করি আর যখন হাদীস পেয়ে যাই, তখন মত বর্জন করে হাদীসকে গ্রহণ করি) ইমাম মালেকের এরশাদ হচ্ছেঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخْطِئُ وَاُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِيْ رَائِيْ فَكُلَّمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلَّمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ-

(আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুলও করি, নির্ভুল সিদ্ধান্তও করি। সুতরাং আমার মতামতকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখো। এতে যা কিছু কিতাব ও সুন্নাত অনুসারে পাও, গ্রহণ করো আর যা তার বিপরীত তা বর্জন করো) ইমাম শাফেয়ী বলেছেনঃاِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَاضْرِبُوْا بِقَوْلِيْ الْحَائِطَ(যখন তোমরা সহীহ হাদীস পাও, তখন আমার কথাকে দেয়ালের ওপর নিক্ষেপ কোরো) তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ

لَاقَوْلَ لِاَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(সুন্নাতে রসূলের মুকাবিলায় কারো কিছু বলার অধিকার নেই। ফলকথা, ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে, যার সামনে কোনো বিষয়ে সুন্নাতে রসূল প্রতিভাত হয়ে উঠবে, তার পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তির উক্তি–সে যতোই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হোক না কেন–গ্রহণ করা হারাম।

---

www.bjilibrary.com

প্রশ্নোত্তর

এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর আহলে হাদীস বন্ধুদের তরফ তেকে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং আমার তরফ থেকে সেসবের যে জবাব দেয়া হয়েছে, এখানে তা উদ্ধৃত করলে পাঠকগণ উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

জনৈক আহলে হাদীস বন্ধু প্রশ্ন করেছেনঃ

(ক) মুসলমানরা কোন্ বিধান অনুসারে চারটি ফিকাহ্কে সত্যাশ্রয়ী বলে মানে?

(খ) হাদীসের সনদ এবং মুজতাহিদদের অনুধ্যানের (تفقه) মধ্যে কোন্টির ওপর কোন্টি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী?

(গ) মুজতাহিদদের অনুধ্যান শক্তি (تفقه) এবং হাদীসের সনদের মধ্যে কোন্টিতে আনুমানিকতা (ظنيت) বেশী?

(ঘ) মুহাদ্দিস এবং ফকীহ একই ব্যক্তি হতে পারেন কিনা? এবং তিনি নিছক মুহাদ্দিস বা নিছক ফকীহর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কিনা?

(ঙ) ইমাম আবু হানীফা মূল বচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুর্বল সূত্র সমন্বিত হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং সবল সূত্র-সমন্বিত হাদীস বর্জন করেছেন, এরূপ কোনো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন।

(চ) এটা কি ইমামদের কথা নয় যে, তাদের ফায়সালার মুকাবিলায় সবল সূত্র-সমন্বিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য?

(ছ) দেরায়েতের কোন্ মাপকাঠি সামনে রেখে নির্ভুল সবল সূত্র-সমন্বিত হাদীসকে বর্জন করা চলে? কোন্ বিধান অনুসারে দেরায়েতের এ শর্ত এবং তার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে, জানাবেন?

জবাব

(ক) চারটি ফিকাহকে কোনো নির্দেশ অনুসারে সত্যাশ্রয়ী মানা হয় না। বরং এর ভিত্তি হলো ঃ কুরআন ও সুন্নাহ তেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করার

www.bjilibrary.com

জন্যে শরীয়াতে যেসব মূলনীতির অবকাশ ও বুনিয়াদ রয়েছে, এ চারটি ফিকহী মাজহাব সেই মূলনীতিগুলোই অবলম্বন করে থাকে। খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের মধ্যে যতোই মতভেদ হোক এবং এ ধরনের বিষয়ে তাদের সঙ্গে মতভেদ করার যতোই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকুক—কিন্তু নীতিগতভাবে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করার যে পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত এবং যেগুলো মাসয়ালা-মাসায়েল উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা) ব্যবহার করেছিলেন—এই মজহাবগুলো সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে।

(খ) হাদীসের সনদ এবং মুজতাহিদদের অনুধ্যানের (تفقه) মধ্যে কোনো-টিকে কোনোটির ওপর চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেয়া চলে না। আসলে যে রেওয়ায়েত নবী করীম (স) থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌছুচ্ছে তা কতোখানি নির্ভরযোগ্য, সনদ হচ্ছে এরই একটা সাক্ষ্য মাত্র। আর মুজতাহিদের অনুধ্যান হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত (Reacherch), যিনি কুরআন ও হাদীসে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের পর একটি রিপোর্ট সম্পর্কে অনুমান করেন যে, তা কতোখানি গ্রহণযোগ্য আর কতোখানি নয়। কিংবা সে রিপোর্ট থেকে যে অর্থ নির্গত হয়, তা শরয়ী ব্যবস্থায় কতোখানি মানানসই (Fit) হতে পারে আর কতোখানি বেমানান (Unfit) হয়। এ দু'টি জিনিসই পৃথক পৃথক মর্যাদার অধিকারী—আদালতে যেমন সাক্ষ্য প্রমাণ আর বিচারকের রায় দু'টি আদালা মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে এ কথা বলা চলে না যে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর বিচারকের ফায়সালারই অগ্রাধিকার রয়েছে। আবার এ কথাও বলা যায় না যে, বিচারকের রায়ের ওপর সাক্ষ্য প্রমাণেরই অগ্রাধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসের সাক্ষ্য আর ফকীহ-ইমামের ইজতেহাদী গবেষণা—এ দু'টির মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া চলে না।

(গ) মুজতাহিদের অনুধ্যান (تفقه) আর হাদীসের সনদ উভয়ের মধ্যেই ভূলের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই আমার দৃষ্টিতে একজন জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে মুজতাহিদদের ইজতিহাদ এবং হাদীসের রেওয়ায়েত উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শরীয়াতের বিধান সন্ধান করা আবশ্যক। আর যারা নিজেরা শরয়ী বিধান সন্ধান করতে অপারগ, তারা কোনো আলেমের ওপরও নির্ভর করতে পারে, আবার নির্ভুল সূত্র সমন্বিত হাদীসের ওপরও আমল করতে পারে—তাদের পক্ষে উভয় পন্থাই যথার্থ।

(ঘ) এক ব্যক্তি একই সময় মুহাদ্দিস এবং ফকীহ হতে পারে এবং এরূপ ব্যক্তি নিছক মুহাদ্দিস বা নিছক ফকীহর মুকাবিলায় নীতিগতভাবে

www.bjilibrary.com

অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আমার এ জবাব শুধু নীতিগত। কোনো বিশেষ ব্যক্তির বেলায় এ নীতি প্রয়োগ করা হলে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেরূপ মর্যাদা, অনুধ্যানের (تفقه) ক্ষেত্রেও তাঁর তেমনি মর্যাদা আছে কিনা, তা অবশ্যই দেখতে হবে।

(ঙ) বর্তমান মুহূর্তে আমার সামনে ইপ্সিত কোনো উদাহরণ নেই, আর এমনিতেও দৃষ্টান্ত পেশ করতে গেলে আলোচনার ধারা দীর্ঘ হয়ে যায়।

(চ) ইমাম-মুজতাহিদগণ যা কিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমি নিজেও তা সমর্থন করি। আমি যা বলেছি তার তাৎপর্য এই যে, কখনো কখনো নির্ভুল সনদ সমন্বিত হাদীসও মূল বচনের (Text) দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জ্ঞান-তথ্যের সাথে মূল বচনের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনতরো অবস্থায় সেই হাদীসের নবমূল্যায়ন কিংবা তাকে বর্জন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

(ছ) দেরায়েত (درايت) বলতে বুঝায় দীন সংক্রান্ত বুৎপত্তি। কুরআন মজীদে যাকে 'হিকমত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্তক্রিয়া রোগের যা মর্যাদা, শরীয়াতের যথার্থ অনুবর্তনের বেলায় এ 'হেকমত'ও ঠিক সেই মর্যাদার অধিকারী। যারা এ জিনিসটি কম অর্জন করেছে কিংবা এর মূল্যমান সম্পর্কেই যাদের কোনো অনুভূতি নেই, তাদের পক্ষে তো লিখিত জিনিসের হুবহু অনুকরণ করাই সমীচীন। কিন্তু যারা এর বেশ কিছুটা অর্জন করতে পেরেছে, তারা কিতাব সুন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দেয়া এ অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে না লাগালে আমার মতে গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।

(জ) হিকমত, ফিকাহ ও দীন সংক্রান্ত বুৎপত্তির মধ্য থেকে কে কতোখানি অর্জন করতে পেরেছে, তা মেপে জোখে দেখবার উপযোগী কোনো মাপকাঠি আমি নির্দেশ করতে পারি না—তেমন কোনো উপায়ও আমার কাছে নেই। কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসাশাস্ত্রে, মণিকারের মণি-পরিচিতিতে ও শাস্ত্রকারের শাস্ত্র-পারদর্শিতার যেমন মাপা জোখা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এটাও ঠিক তেমনি ব্যাপার। কিন্তু এর সীমারেখা নির্ধারণ করতে না পারার অর্থ এ নয় যে, শরীয়াতে আদৌ এর কোনো স্থান নেই।

(ঝ) এ প্রশ্নের জবাব উপরোল্লিখিত জবাবগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এখানে শুধু এটুকু সংযোজন করা চলে যে, দেরায়েতের প্রয়োগের ভুলের

www.bjilibrary.com

সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এরূপ সম্ভাবনা শুধু এ ব্যাপারেই নয়, কোনো হাদীসকে নির্ভুল, কোনোটিকে দুর্বল এবং কোনোটিকে মনগড়া আখ্যা দেয়ার ব্যাপারেও একইরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো মুসলমান যদি দেরায়েতের প্রয়োগে ভুল করে অপরাধী হয়ে যায়, তাহলে সে হাদীসের মর্যাদা নির্ণয়েও ভুল করে একইরূপ অপরাধী হবে। কিন্তু শরীয়াত মানুষের সামর্থ এবং তার সম্ভাবনা পর্যন্তই তার ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছে এবং এ পর্যন্তই তাকে দায়িত্বশীল আখ্যা দিয়েছে।

অপর এক আহ'লে হাদীস বন্ধুর পত্র হচ্ছেঃ

"কিতাব ও সুন্নাহর অধীনে ফিকাহ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় প্রতিপালনে মতভেদ হওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার, একে বরদাশতও করা চলে। কিন্তু নীতিগতভাবে রেওয়ায়েতে নববী আর দেরায়েতে মুজতাহিদকে সমান মর্যাদা দেয়া অসহ্য ব্যাপার, বরং কোনো কোনো অবস্থায় এটা হাদীস অবিশ্বাসের সমার্থক হয়ে পড়তে পারে। খোদ হানাফী মতের ইমামগণও এর সমর্থক নন। খোদ ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত এ ধরনের আকীদা ও ধারণার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্যে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এবং 'শামী' দেখুন।"

জবাব

আপনার উক্তি 'নীতিগতভাবে রেওয়ায়েতে নববী আর দেরায়েতে মুজতাহিদকে সমান মর্যাদা দেয়া' অবশ্যই আমার মতের প্রতিনিধিত্ব করে না। পরন্তু আপনার মন্তব্য 'কোনো কোনো অবস্থায় এটা হাদীস অবিশ্বাসের সমার্থক হয়ে পড়তে পারে' বেইনসাফী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আপনি নিজেই ইনসাফের সঙ্গে চিন্তা করুন, এ গ্রন্থে হাদীস সম্পর্কে আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছি এবং অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে যেভাবে হাদীসের দ্বারা যুক্তিপ্রয়োগ ও প্রতিবাদ করে আসছি, সেসব দেখার পর হাদীস অবিশ্বাসীদের মতবাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক রয়েছে বা হতে পারে—এরূপ সন্দেহ করার কোনো অবকাশ কি বের করা যেতে পারে? পরন্তু আপনি যদি আমায় ঈমানদার মুসলমান মনে করেন, তাহলে কোনো রেওয়ায়েতকে যথার্থ হাদীসে রসূল বলে বিশ্বাস করার পরও তার ওপর কারো অনুমান (تفقه) বা ইজতিহাদ কিংবা কোনো ইমামের উক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে পারি—এরূপ অনুমানই বা আপনি কিভাবে করতে পারেন? অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা ; যদি

www.bjilibrary.com

উভয়কে সমানও মনে করি, এমন কি তার ধারণা পর্যন্ত পোষণ করি, তাহলে আমি কিভাবে মুমিন থাকতে পারি?

প্রকৃতপক্ষে আপনারা এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে আছেন যে, আমরা ইজতিহাদ ও অনুধ্যানকে (تفقه) হাদীসে রসূলের ওপর অগ্রাধিকার দেই কিংবা উভয়কে সমান আখ্যা দেই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এটা নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোনো রেওয়ায়েত রসূলে করীমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তার সম্পর্কের যথার্থ ও নির্ভরযোগ্যাতার প্রশ্নটি স্বভাবতই আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়ে। আপনাদের মতে সনদের দিক দিয়ে মুহাদ্দিসরা নির্ভুল আখ্যা দিয়েছেন—এমন প্রতিটি রেওয়ায়েতকে হাদীসে রসূল বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। কিন্তু আমরা সনদের যথার্থকে হাদীসের যথার্থতার জন্যে অপরিহার্য প্রমাণ মনে করি না। আমাদের মতে সনদের সত্যতা হাদীসের সত্যতা জানবার জন্যে একমাত্র পন্থা নয়। বরং যেসব উপায়ে কোনো রেওয়ায়েতের হাদীসে রসূল হওয়ার পক্ষে প্রবল ধারণা লাভ করা যায়, সনদ হচ্ছে তার অন্যতম। সেই সঙ্গে হাদীসের মূল বচন (Text) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা, কুরআন হাদীসের সামগ্রিক জ্ঞান থেকে অর্জিত দীন সংক্রান্ত বুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং আলোচ্য রেওয়ায়েতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য সবলতর উপায়ে প্রাপ্ত প্রামাণ্য সুন্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আমারা আবশ্যক মনে করি। এ ছাড়া আরো কতিপয় দিক রয়েছে, যেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোনো হাদীসকে রসূলে করীম (স)-এর প্রতি আরোপ করা আমরা সঙ্গত মনে করিনা। কাজেই হাদীসে রসূল আর ইজতিহাদে মুজতাহিদ সমান মর্যাদার অধিকারী কিনা—আপনার এবং আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। বরং রেওয়ায়েতের গ্রহণ ও বর্জন এবং তা থেকে বিধি-বিধান উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সনদের দিক থেকে একজন মুহাদ্দিসের মত এবং দেরায়েতের দিক থেকে একজন মুজতাহিদের মত সমান মর্যাদার অধিকারী কিনা অথবা উভয়ের মধ্যে কার মত বেশী গুরুত্বপূর্ণ—আসল মতভেদ হচ্ছে এ প্রশ্নে। এ ব্যাপারে কেউ উভয়কে সমান মর্যাদা দিলেও সে গুনাহগার হবে না কিংবা উভয়ের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দিলেও কোনো গুনাহর দায়ে দোষী হবে না। কিন্তু আপনারা তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করার জন্যে খামাখা তার প্রতি এ অপবাদ চাপাতে চান যে, সে হাদীসকে হাদীসে রসূল মানার পরও কোনো মুজতাহিদের মতকে তার সমান কিংবা তার ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্য বলে প্রচার করে। অথচ এরূপ জিনিসের ধারণাও কোনো মুমিনের অন্তরে স্থান পেতে পারে না।

www.bjilibrary.com

মুহাদ্দিসগণ যেসব ভিত্তির ওপর হাদীসকে অভ্রান্ত, ভ্রান্ত এবং দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কয়েকটি দিক আমি বিবৃত করেছি। প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতার এ দিকগুলো হাদীস শাস্ত্রে বর্তমান আছে কিনা, দয়া করে আপনিই তা আমায় বলুন! যদি বর্তমান থাকে, তাহলে মুহাদ্দিসগণের মতামতের প্রতি ঈমান আনার জন্যে আপনারা আমাদের কাছে এতো গুরুত্ব সহকারে দাবী করেন কেন? মুহাদ্দিসগণকে আমরা কখনো সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বলিনি—তেমন ধারণাও আমরা অন্তরে পোষণ করতে পারি না। বরং এর বিপরীত—হাদীসের সত্যতা বিচারে সনদের দিক থেকে তার অবস্থা কিরূপ ; সেদিকে লক্ষ্য করাকে আমরা সর্বপ্রথম জরুরী কাজ বলে মনে করি। এ ব্যাপারে যে পর্যায়ের মুহাদ্দিস তাকে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, তাঁর মর্যাদা অনুসারে তাঁর মতামতকে আমরা পুরোপুরিই সমীহ করি। কিন্তু হাদীস-শাস্ত্রের উপরোল্লেখিত দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নিছক রেওয়ায়েত সংক্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা অর্জিত তথ্যাবলীর ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে এবং শুধু এই জ্ঞান অনুসারে নির্ভুল আখ্যা প্রাপ্ত প্রতিটি হাদীসকে অবশ্যই হাদীসে রসূল বলে স্বীকার করতে আমরা কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। আপনারা এ মতের প্রতি সমর্থন জানাতে না পারেন—যেমন আপনাদের মতকে আমরা সমর্থন করি না—কিন্তু এ মতানৈক্যের পরিণতিতে আমরা যা করিনি, আমাদের ওপর তেমন গুনাহর অপবাদ চাপানো কিছুতেই সমীচীন নয়।

---

www.bjilibrary.com

হাদীস সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন

'তরজুমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক লিখেছেনঃ

'হাদীস-অবিশ্বাসীদের জবাবে তরজুমানুল কুরআনে আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিফল দান করুন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আরো কিছুটা আলোকপাত করলে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ সাধারণভাবে এবং পত্রিকা পাঠকগণ বিশেষভাব উপকৃত হবে।

(১) কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে রসূলে করীম (স)-এর উক্তি لَاتَكْتُبُوْا عَنِّىْ سِوَى الْقُرْاٰنِ এক জরুরী সতর্কমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো।

সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যাদেশ অনুসারে কুরআনের লিখন, পঠন ও মুখস্ত করণের কাজে নিযুক্ত এবং কর্মরত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কুরআনের পঠনরীতিতে (قرأت) মতভেদের সৃষ্টি হয়-হযরত উসমানের আমলে যার নিরসন হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের মতো হাদীস তেমন সুরক্ষিত হতে পারেনি। বিশেষত জামাল ও ছিফফীনের যুদ্ধের পর যখন দীর্ঘদিন যাবত নানাভাবে হাদীসের সংগ্রহ ও সমালোচনার চেষ্টা করা হয় তখন বর্ণনা সূত্র রাবী ও মনগড়া হাদীসের বাছ-বিচার অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিলো।

(২) হাদীসে ফে'লী ও কওলীর মধ্যে অনেকগুলোরই তাওয়াতোর বা সুষম ধারাবাহিকতার মর্যাদা লাভ করা উচিত ছিলো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হাদীসে ফে'লীর মধ্যে নামাযের স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাপারে আদৌ কোনো মতভেদ না হোক, এটাই বিচারবুদ্ধি দাবী করে। বিশেষত যখন নবী করীমের নির্দেশ ছিলো صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ অন্তত হেরেম শরীফে দিনরাত পাঁচবার এক বিরাট দল প্রত্যেক যুগে এ কাজটি পর্যবেক্ষণ করে আসছে ; কিন্তু প্রথম যুগেই নামাযে হাত উঠানো (রাফে' ইয়াদাইন), হাত খোলা রাখা,[১] হাত

১. শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হাত খোলা রেখে নামায পড়ে।

www.bjilibrary.com

বাঁধা, সশব্দে আমীন বলা ইত্যাদি রূপে ইমাম মুজতাহিদদের মধ্যে যে মতভেদ প্রকাশ পেয়েছে, তা এ কর্মগত ধারাবাহিকতার (তাওয়াতোরে ফে'ল) গুরুত্বকে খাটো করে দিয়েছে। আর তাওয়াতোরে কওলীর মর্যাদা তো আরো বেশী হ্রাস পেয়েছে। রাবী বর্ণিত হাদীসের কথা আর কী বলবো!

(৩) এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, রসূলে করীম (স)-এর জীবনাদর্শ আমাদের জন্যে কার্যকরীভাবে শিক্ষণীয়। প্রথম যুগে যখন হাদীসের সংগ্রহ ও সঙ্কলন সন্তোষজনকভাবে হয়নি, মক্কা ও মদীনার বাইরের মুসলমানরা কুরআন মজীদ থেকেই নবী করীমের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতো। রসূলে করীমের আখলাক সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেনঃ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ ফলকথা, কুরআনে পাক থেকে ইসলামী আখলাক ও জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার প্রচুর উপাদান রয়েছে। তা ছাড়া পয়গাম্বরের (স)-এর জীবনচরিত বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত, এমন যুগমানবের সংখ্যাও খুব কম। কিন্তু শরীয়াতের অনুবর্তীরা সাধারণভাবে তার মূলনীতি ও বিধানগুলো সম্পর্কে অবহিত, আর এটাই ছিলো আসল লক্ষ্য।

উপরোক্ত বিষয়টি হচ্ছে হাদীসের সত্যতায় অবিশ্বাসী কোনো কোনো ব্যক্তির সন্দেহ, এর অপনোদন হলে পাঠকবর্গ অবশ্যই উপকৃত হবেন। নচেত অধীন তো مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا এ আয়াতকে সঠিক অর্থে গ্রহণ করে হাদীসের সত্যতায় বিশ্বাসী।

আপনি যে প্রশ্নগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেগুলো ছাড়াও হাদীস-অবিশ্বাসীদের তরফ তেকে আরো বহুতরো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যেমন প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির শামিল, তেমনি নিষ্প্রয়োজনও। আসল কথা এই যে, মানুষের মতামত সম্পূর্ণত তার দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো বিষয়ে সে বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সমস্ত যুক্তি প্রমাণকেই সে প্রতিকূল দেখতে পায়। আর যখন সে অনুকূল দৃষ্টিকোণ থেকে তাকায়, তখন সমস্ত যুক্তি-প্রমাণই তার অনুকূল মনে হয়। কিন্তু যখন সে শূন্য মস্তিষ্ক হয়ে সত্যসন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শ্রেণীর যুক্তি-প্রমাণের ওপরই তার দৃষ্টি পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে তুলনা করে সে একটি সুষম মত গঠন করে। এ কারণেই যারা ইসলামের শত্রুদের হামলায় ভীত হয়ে কিংবা অসতর্ক আলেমদের

www.bjilibrary.com

রেওয়ায়েতে অতিষ্ট হয়ে হাদীসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তারা যখন বিরোধী সুলভ মানসিকতা নিয়ে হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতার পক্ষেই শুধু যুক্তি-প্রমাণ পেতে থাকে। পক্ষান্তরে যারা রক্ষণশীল পরিবেশে লালিত পালিত, তারা রসূলে করীম (স)-এর প্রতি আরোপিত প্রতিটি হাদীসকেই—তা দুর্বল হোক কি মনগড়া—নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে বসে। আমার মতে এ দু'টি দৃষ্টিকোণই ভ্রান্ত; আর দৃষ্টিকোণই যখন ভ্রান্ত তদ্বারা যা কিছু দেখা হয়েছে তাও ভ্রান্ত। যারা সমস্ত হাদীসকে নির্বিচারে ভ্রান্ত মনে করে, তারাও ভ্রান্ত। আর যারা তামাম হাদীসকে নির্বিচারে অভ্রান্ত মনে করে, তারাও ভ্রান্ত। যারা হাদীস ও কুরআনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তারাও পথভ্রষ্ট। আর যারা হাদীসকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দেয়, তারাও পথভ্রষ্ট। নির্ভুল পথ এই চরম পন্থার মাঝখানে অবস্থিত। আর দ্রষ্টা ঐ পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণ বর্জন করে মধ্যবর্তী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ মধ্যবর্তী পন্থাটি দৃষ্টিপথে আসতে পারে না। কাজেই খুটিনাটি বিষয়ে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সরাসরি হামলা করা এবং তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ওপর টেনে আনাই হচ্ছে সংশোধনের নির্ভুল পন্থা।

তবু আপনি যখন আপনার উত্থাপিত বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করার অনুরোধ জানিয়েছেন, তখন সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ করছি।

(১) এ কথা সত্য যে, কুরআন মজীদ যতোখানি সুরক্ষিত, হাদীস ততোখানি সুরক্ষিত নয়। কিন্তু তাই বলে এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, হাদীস মোটেই সুরক্ষিত নয় এবং রসূলে করীম (স)-এর কোনো কথা ও কাজই আমাদের কাছে অবিকৃতরূপে পৌছেনি। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, হাদীসের বর্ণনা-পদ্ধতি এবং রাবীদের জীবনী বাছ-বিচারে বহুতরো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদও হয়েছে ; কিন্তু হাদীস-শাস্ত্রের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সন্ধান ও অন্বেষণের 'হক' পুরোপুরিই আদায় করেছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে এতো মেহনত করেছেন যে, তার চাইতে বেশী কিছু করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ছিলো না। নিজস্ব পরিশ্রম বলে তাঁরা যে তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন, তা আজ আমাদের কাছে বর্তমান রয়েছে। তাঁদের মধ্যে যেসব মতভেদ হয়েছে, সেগুলোও পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ বর্তমান রয়েছে। সে জ্ঞান ভান্ডারের প্রতি

www.bjilibrary.com

কেউ যদি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তাহলে নবী করীম (স) কি বলেছেন আর কি বলেননি, কি করেছেন আর কি করেননি—তেরোশো বছর অতিক্রান্ত হবার পরও তা তার পক্ষে জানা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। পরন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন প্রতিটি রেওয়ায়েত যথার্থ ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে কতোখানি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, তাও বোঝা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, জ্ঞানের সূত্র হিসেবে কুরআন মজীদ যতোখানি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য, হাদীস ঠিক ততোখানি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়। এ কারণে যথার্থতার আসল মাপকাঠি কুরআন মজীদই হওয়া উচিত। যে জিনিস কুরআন মজীদের ভাষা ও ভাবধারার বিপরীত হবে, তাকে আমরা নাকচ করে দেবো। সেটি কুরআনের বিপরীত হওয়া থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হবে যে, জিনিসটি রসূলে করীম (স)-এর দ্বারা প্রামাণ্য ও সমর্থিত নয়। পক্ষান্তরে যে জিনিস কুরআনের ভাষা ও ভাবধারার অনুকূল হবে এবং কুরআনী শিক্ষার এমন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কিংবা বিধি-ব্যবস্থার এমনি বিস্তৃত বিবরণ হবে, যা তার প্রতিকূল[১] নয়, পরন্তু রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের দিক থেকেও তার নির্ভরযোগ্য হওয়ার পক্ষে প্রবল ধারণা জন্মিবে, তাকে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং নিজস্ব অভিমতের ওপর তাকে অগ্রাধিকার দেবো।

(২) বাহ্য দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ সত্য বলেই মনে হয় যে, যেসব ফে'লী ও কওলী হাদীসের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা বিপুল, সেগুলোর তাওয়াতোরের মর্যাদা লাভ করা এবং সে সবের মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ না থাকাই উচিত। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি এটা সহজেই বুঝতে পারে যে, যে খুঁটিনাটি বিপুলসংখ্যক লোকে দেখেছে কিংবা তদনুসারে আমল করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে চুল পরিমাণও পার্থক্য সূচিত হবে না, এতোখানি ঐকমত্য কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে ঘটনা বা বক্তৃতার মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তো সবার মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই, কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়গুলোতে অনেক কিছুর মতভেদ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মতভেদ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সে ঘটনাটি আদৌ সংঘটিত হয়নি। একটি

---

১. মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের বিপরীত হওয়া এক জিনিস আর কুরআনের চাইতে বেশী হওয়া ভিন্ন জিনিস। এক শ্রেণীর লোক এই পার্থক্যটার প্রতি লক্ষ্য রাখেনা এবং কুরআনী সংক্ষেপের চাইতে হাদীসে যে জিনিসগুলো বেশী দেখা যায়, সেগুলোকে কুরআনের বিপরীত ঘোষণা করতে শুরু করে। পরবর্তী প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

উদাহরণ দিচ্ছি ঃ আজকে আমি একটি বক্তৃতা করছি, কয়েক হাজার লোক সে বক্তৃতা শুনছে। সভা শেষ হবার মাত্র কয়েক ঘন্টা পর মাস বা বছরের পর নয়, বরং মাত্র কয়েকটি ঘন্টা পর লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করুন ঃ বক্তা কি বলেছেন? দেখবেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তিতে সবারই বর্ণনা একরূপ হবে না। কেউ একটি অংশ বিবৃত করবে, কেউ করবে অন্য অংশ। কেউ কোনো বাক্যের মূল শব্দাবলী সহ বর্ণনা করবে, কেউ তার অনিবার্য অর্থকে নিজের ভাষায় বিবৃত করবে। কেউ অতি বিচক্ষণ লোক হবে এবং বক্তৃতাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করে তার নির্ভুল তাৎপর্য বর্ণনা করবে। আবার কেউ তেমন ভালো বোধশক্তির অধিকারী হবে না এবং বক্তৃতার তাৎপর্যকে নিজের ভাষায় ভালো করে পেশ করতে পারবে না। কারো স্মৃতিশক্তি ভালো হবে এবং বক্তৃতার বেশীর ভাগ অংশ সে হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারবে। আবার কারো স্মরণশক্তি ভালো হবে না এবং বক্তৃতার বর্ণনাও পুনরাবৃত্তিতে সে ভুল-ত্রুটি করবে। এখন কেউ যদি এসব মতভেদ দেখে বলে দেয় যে, আদতে আমি কোনো বক্তৃতাই করিনি, লোকেরা সম্পূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা করেছে, তা হলে তা আদৌ সমীচিন হবে না। পক্ষান্তরে বক্তৃতা সংক্রান্ত তামাম একক তথ্য একত্র করা হলে জানা যাবে যে, আমি বক্তৃতা করেছি, অমুক জায়গায় করেছি, বহুসংখ্যক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলো, বক্তৃতার বিষয়বস্তু অমুক ছিলো—অন্তত এ কয়টি ব্যাপারে সবাইর মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। পরন্তু বক্তৃতার যে অংশগুলো সম্পর্কে শব্দগত বা অর্থগত দিক দিয়ে অধিকতর মতৈক্য পাওয়া যাবে, তাই বেশী প্রামাণ্য বিবেচিত হবে এবং সেগুলোকে মিশিয়ে বক্তৃতার একটি প্রামাণ্য সংগ্রহ তৈরী করে নেয়া হবে। আর যে অংশগুলোর বর্ণনায় বর্ণনাকারীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র দেখা যাবে, তা তুলনামূলকভাবে কম নির্ভরযোগ্য হবে। কিন্তু বক্তৃতার সামগ্রিক ভাবধারার বিপরীত না হওয়া কিংবা সেগুলোর যথার্থ সন্দেহজনক হওয়ার মতো কোনো জিনিস না পাওয়া—যেমন বক্তৃতার নির্ভরযোগ্য অংশগুলো থেকে ভিন্নরূপ হওয়া কিংবা বক্তার ভাবধারা, প্রকাশভঙ্গি ও মেজাজ-প্রকৃতি সম্পর্কে লোকদের কাছে সুরক্ষিত নির্ভুল তথ্যাবলীর বিপরীত হওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে মনগড়া বা ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া সঙ্গত হবে না।

হাদীসে ফে'লীর অবস্থাও হচ্ছে এরূপ। আপনি নামাযের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমিও এ দৃষ্টান্তটিকে সামনে রেখেই জবাব দান করছি। নামায সম্পর্কে ধারাবাহিকতা কওলী ও আমলের থেকে এটা সর্বসম্মতভাবে

www.bjilibrary.com

প্রমাণিত যে, হযরত নবী করীম (স) দৈনিক পাঁচবার ফরয নামায আদায় করতেন। তিনি নামায জামায়াতের সঙ্গে পড়তেন। মুক্তাদীরা তাঁর পেছনে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতো এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করতো। তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তাকবীরে তাহরীমার সাথে নামায শুরু করতেন। কিয়াম, রুকূ, সিজদা ও কুয়ুদ দ্বারা নামায সমাধা হতো। নামাযের প্রতিটি রোকন বা গুরুত্বপূর্ণ অংশের অমুক অমুক রূপ-প্রকৃতি ছিলো। ফলকথা, নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদানগুলোর ব্যাপারে সমস্ত বাচনিক রেওয়ায়েতই একমত এবং নবুয়াতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সে অনুসারে আমলও হচ্ছে। এরপর হাত উঠানো (رفع يدين) , হাত বাঁধা (وضع يدين) ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর মতভেদের এ অর্থ হতে পারে না যে, নামায সংক্রান্ত তামাম রেওয়ায়েতই মিথ্যা ; বরং এ মতভেদ থেকে এ সত্যই জানা যায় যে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে হযরতের আমল বিভিন্নরূপ দেখেছে। আর যেহেতু নামাযে এ জিনিসগুলোর বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, এগুলোর মধ্যে কোনোটি করা বা না করার ফলে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না, পরন্তু হযরত নিজেই ছিলেন শরীয়াতপ্রণেতা, তাই তিনি যখন যেরূপ ইচ্ছা আমল করতেন। কিন্তু হযরত ছাড়া অন্য কেউ যেহেতু শরীয়াতপ্রণেতা ছিলেন না এবং লোকদের কাজ ছিলো শুধু তাঁর অনুসরণ করা—শরীয়ত প্রণয়ন করা নয়—তাই দর্শকরা তাঁকে যেরূপ কাজ করতে দেখেছে, তারই অনুসরণ করেছে এবং অন্যান্য লোকদেরকে তারই অনুসরণ করতে বলেছে। পরবর্তী কালের ইমামগণ রেওয়ায়েতগুলো ছাঁটাই-বাছাই করে খুঁটিনাটি বিষয় সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর নির্ভুল ও প্রামাণ্য—তা জানবার চেষ্টা করেছেন। স্পষ্টত, এ সন্ধান ও অন্বেষণের ফলে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার্ ছিলো এবং তা হয়েছেও। কেউ একটি রেওয়ায়েতকে বেশী প্রামাণ্য মনে করেছেন আবার কেউ তার বিপরীত রেওয়ায়েতে পরিতুষ্টি লাভ করেছেন। কিন্তু এসব মতভেদের কোনো গুরুত্ব নেই। আর এর দ্বারা হযরতের নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো কওলী ও ফে'লী তাওয়াতোর পাওয়া যায় না—এ কথাও প্রমাণিত হয় না।

(৩) কুরআন মজীদ ও হাদীসে রসূলের সম্পর্ককে সঠিক ও সার্বিকরূপে না বোঝার ফলেই তৃতীয় প্রশ্নটির সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন মজীদে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ঈমানের প্রতি। আর ঈমানের বিস্তৃত ব্যাখ্যায়ই সমগ্র কুরআন পরিপূর্ণ। কাজেই এর জন্যে আমাদের কুরআনের বাইরে যাবার

www.bjilibrary.com

কোনোই প্রয়োজন নেই আর হাদীসেও এর চাইতে বেশী কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। এরপর নৈতিক শিক্ষার কথা। কুরআনে নীতিশিক্ষার মূলসূত্র প্রায় সবই বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, বাস্তব নমুনার সঙ্গে নৈতিকতার যতোটা সম্পর্ক, শাব্দিক বর্ণনার সঙ্গে ততোটা নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলকে নৈতিকতার আদর্শ প্রতিমূর্তি রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আর তাঁর রসূল (স) নিজের কর্মকাণ্ড, আদেশ-উপদেশ, শিক্ষা-দীক্ষা, বাস্তব ট্রেনিং ও চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে কুরআন মজীদে বিবৃত সেই নীতিশিক্ষার মূলসূত্রগুলোর বাচনিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি নবীর এহেন আদর্শকে পরিত্যাগ করে কুরআনকেই নিজের জন্যে যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে, সে এক বিরাট অনুগ্রহ-সম্পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা যে কিতাব নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে রসূলও প্রেরণ করেছেন, তাঁর এ কাজটিকেও সে নিরর্থক মনে করেছেন। রসূল প্রেরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ আমার নবী তোমাদেরকে শুধু আমার বাণীই শোনাবে না, তোমাদের ব্যক্তি-চরিত্রও সংশোধন করবেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর জীবনে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শও থাকবে—এগুলোকেও সে অনর্থক কথা মনে করে নিয়েছে।

এবার বিধি-ব্যবস্থার কথা। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক আইন-কানুন বিবৃত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) কার্যত সেই বিধি-ব্যবস্থাগুলোকে জীবনের বাস্তব ক্রিয়াকর্মে প্রবর্তন করেছেন এবং নিজের কথা ও কাজের দ্বারা বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এসব বিবরণের মধ্যে কোনো কোনোটির বেলায় আমাদের ইজতেহাদের কোনো অবকাশ নেই। এসব ক্ষেত্রে হযরত থেকে যেরূপ আমল প্রমাণিত, অবিকল তার অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। যেমন এবাদাত সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন। আবার কোনো কোনো বিবরণ থেকে আমরা মূলনীতি উদ্ভাবন করে ইজতিহাদের সাহায্যে খুঁটিনাটি বিষয় তৈরী করতে পারি। যেমন, নবুয়াত যুগের সামাজিক নিয়ম-কানুন। আর কোনো কোনো বিবরণ থেকে আমরা ইসলামের মূলগত ভাবধারা জানতে পারি। এ ভাবধারা আমাদের হৃদয় ও আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হলে আমরা জীবনের তাবৎ বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে একজন মুসলমানের মতো দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টির সাথে চিন্তা করার, দুনিয়ার আদর্শিক ও বাস্তব সমস্যাবলীকে

www.bjilibrary.com

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার এবং সে সম্পর্কে একজন মুসলমানের ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী হতে পারবো।

• এর থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পূর্ণ ও খাঁটি মুসলমান হবার জন্যে কুরআন মজীদের সঙ্গে হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান কতোখানি আবশ্যক। এর জবাবে যদি বলা হয় যে, একজন সাধারণ মুসলমান হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান ছাড়াও মুসলমানের মতো জীবন যাপন করতে পারে, তাহলে আমি বলবো যে, এ জ্ঞানটা হাদীসের প্রয়োজন না থাকার পক্ষে কোনো দলিল নয়। আর এটা দলিলরূপে স্বীকৃত হলে এ দলিল কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রয়োজন না থাকার পক্ষেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ, একজন সাধারণ মুসলমান কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞানেও খুব কমই পারদর্শী হয়ে থাকে এবং তা সত্ত্বেও সে নিজের জীবনে শরয়ী বিধান অনুবর্তন করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাধারণ লোকেরা না কখনো নবুয়াতের যুগে আদর্শ মুসলমান ছিলো আর না তার পরে কখনো তারা আদর্শ মুসলমান হবার গৌরব লাভ করেছে। আদর্শ মুসলমান তো আসলে সে যুগে তাঁরাই ছিলেন এবং আজো তাঁরাই রয়েছেন, যাঁরা কুরআন ও হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানশাস্ত্রে দূরদৃষ্টির অধিকারী—যাঁদের শিরা উপশিরায় কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান এবং নবী করীম (স)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ প্রবেশ লাভ করেছে। আর জনসাধারণ তখনো এসব আদর্শ মুসলমানের অনুসারী ছিলেন—আজো রয়েছেন। নবুয়াতের যুগে যেসব সাহাবা যতো বেশী হযরতের সাহচর্য এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ততো বেশী আদর্শ মুসলমান বলে গণ্য হতেন। তাঁদের মুকাবিলায় যারা হযরতের সাহচর্য এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেনি, তাদেরকে কখনো জ্ঞান বা কর্মের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। নিসন্দেহে, এরা উভয়েই মুসলমান ছিলেন, কিন্তু উভয়ের মর্যাদাগত পার্থক্যকে কখনো উপেক্ষা করা চলে না।

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৩৪

www.bjilibrary.com

কুরআন ও সুন্নাতে রসূল

জনৈক ভদ্রলোক লিখেছেনঃ

'আমি হাদীসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার প্রবন্ধগুলো নিয়মিত পড়েছি। আমি কোনো অন্ধ হাদীস বিরোধী নই। রসূলে করীমের যে কোনো উক্তিকে নির্বিচারে বর্জন করার পক্ষপাতী আমি নই। আবার যে কোনো দুর্বল রেওয়ায়েতকে মেনে নিতেও প্রস্তুত নই। এ দু'টি নীতিগত বিষয় সম্পর্কে আমার ও আমার বন্ধুদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি ঃ

(১) কুরআন মজীদ কি মুক্তি বা নাজাতের জন্যে যথেষ্ট নয়? যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে নামায সংক্রান্ত বিস্তৃত নিয়মাবলীকে—যা কুরআন বহির্ভূত—কেন প্রাথমিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হবে?

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভগুলোর (যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি—যা বছরে বা জীবনে একবার মাত্র আদায় করা প্রয়োজন) বিস্তৃত বিবরণ তো কুরআন পেশ করেছে। কিন্তু যে নামায দৈনিক পাঁচবার আদায় করা আবশ্যক, তার বিবরণ কেন পেশ করা হয়নি?

(২) ক ঃ মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ কি রেওয়ায়েত নয়?

খ ঃ এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে জাতির ঐক্যসূত্র বিচ্ছিন্ন এবং যার সামনে বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান, একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্তমান, একটি বিশেষ পদ্ধতির ওপর নীতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া সে জাতি উন্নতি করতে পারে না। এমতাবস্থায় রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করে মুসলিম জাতির জন্যে কি আপনি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রত্যাশা করতে পারেন? আমি বিশ্বাস করি, বর্তমানে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও একতার দ্বারাই মুসলমানরা নাজাত লাভ করতে পারে। এখন নীতিগতভাবে এ ঐক্য-প্রতিষ্ঠার কী পন্থা আপনি নির্দেশ করবেন?'

আপনি যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন, সেগুলো তেমন জটিল কিছু নয়। একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আপনি নিজেই সেগুলোর জবাব পেতেন। আপনি আমার যে প্রবন্ধগুলোর উল্লেখ করেছেন, তাতেও কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তবু যখন এই প্রশ্নগুলোতে আপনি বিভ্রান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং

www.bjilibrary.com

আরো কিছু লোক এতে জড়িয়ে পড়েছে, তখন তাদের সান্ত্বনার জন্যে সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করছি ঃ

(১) কুরআনে হাকীম 'নাজাতে'র জন্যে নয়, বরং 'হেদায়েতের' জন্যে যথেষ্ট। এর কাজ হচ্ছে নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক কর্মের পথনির্দেশ করা। এ পথনির্দেশের ব্যাপারে সে নিসন্দেহে যথেষ্ট। কিন্তু মুক্তি বা নাজাতের জন্যে শুধু কুরআন পড়াটাই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তার নির্দেশিত পথে চলা, কুরআন-প্রচারিত আকীদা পোষণ করা এবং তার নির্ধারিত মৌল আইন মুতাবেক জীবন যাপন করা।

(২) 'হেদায়েতের জন্যে কুরআন যথেষ্ট'—সাধারণত এ কথাটারও ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়। কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা যখন বলি যে, অমুক জ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করার জন্যে এটি যথেষ্ট, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে জ্ঞানশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তদ্বারা এই অর্থ বুঝায় না যে, এ গ্রন্থের ভাষা পড়তে পারে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই এর সকল তাৎপর্য আয়ত্ত করতে পারবে। এবং শুধু গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেই সে জ্ঞানশাস্ত্রকে কার্যত ব্যবহার করার মতো পারদর্শিতাও অর্জন করবে। কোনো গ্রন্থ যতোই ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ হোক না কেন, তার বিষয়বস্তু বোঝার জন্যে খোদ শিক্ষার্থীর মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ওই জ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন—যিনি শুধু গ্রন্থের তাৎপর্যই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experiment) ও অনুশীলনের (Exercise) মাধ্যমে জ্ঞানশাস্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়ও শিক্ষাদান করবেন, যা কোনো গ্রন্থে পুরোপুরি বিবৃত হওয়া সম্ভবপর নয় কিংবা শুধু গ্রন্থ পড়েই জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে তা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। বস্তুত কুরআন মজীদের অবস্থাও হচ্ছে এরূপ। কুরআন এ দৃষ্টিতে হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট যে, তাতে মানুষের সহজ-সরল পথে চলবার উপযোগী নির্ভুল জ্ঞান বর্তমান রয়েছে—তাতে আল্লাহর মনোনীত দীনের সমস্ত মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সে জ্ঞান থেকে উপকৃত হবার জন্যে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত, উপকৃত হবার জন্যে শিক্ষার্থীর আন্তরিক নিষ্ঠা থাকতে হবে এবং কুরআন বোঝার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিষয়গুলো তার অবহিত হতে হবে। দ্বিতীয়, কিতাবুল্লাহর বিষয়বস্তু বোঝবার, তার আয়াতরাজির নির্ভুল অর্থ ও মর্ম বাত্‌লাবার, তার বিধি-ব্যবস্থা নিজে পালন করে দেখাবার এবং তার আইন-কানুন বাস্তব জীবনে কার্যকরী করে সে

www.bjilibrary.com

সবের বিস্তৃত নিয়মাবলী নির্ধারণ করে দেবার উপযোগী এবং পারদর্শী শিক্ষাগুরু থাকতে হবে। এর প্রথম জিনিসটির সম্পর্ক হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে। আর দ্বিতীয় জিনিসটির ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই সম্পাদন করেছেন। পারদর্শী শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই আল্লাহ্ কুরআনের সাথে রসূলে করীম (স)–কে পাঠিয়েছেন। শিক্ষাগুরু হিসেবে তিনি যা কিছু বলেছেন বা শিখিয়েছেন, তা আল্লাহ্র তরফ থেকেই আসতো—কুরআন যেমন আল্লাহ্র তরফ থেকে আসতো। কাজেই একে কুরআনের বহির্ভূত বলা সমীচীন নয়। যে ব্যক্তি এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং কুরআনকে এই অর্থে যথেষ্ট মনে করে যে, তদনুসারে আমল করার জন্যে নবী করীম (স)–এর আদর্শিক ও বাস্তব হেদায়াতের প্রয়োজন নেই, সে মূলত এ কথাই বলে যে, শুধু কুরআন অবতরণই যথেষ্ট ছিলো এবং আল্লাহ্ তার সঙ্গে একজন রসূল পাঠিয়ে (নায়ুজুবিল্লাহ্) একটি অনর্থক কাজ করেছেন।

(৩) আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, নামায ইত্যাদি সংক্রান্ত বিবৃত বিষয়াদি কুরআন বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও কেনো প্রাথমিক কর্তব্য বলে ঘোষিত হবে? এর জবাব এই যে, নামায ইত্যাদি সম্পর্কে রসূলে করীম (স)–এর নির্দেশিত বিষয়াদিকে কুরআনের বহির্ভূত বলা একেবারেই ভুল। কোনো পারদর্শী চিকিৎসক যদি চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো নিয়ম–কানুনকে পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে শিষ্যদেরকে বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আপনি তাকে 'চিকিৎসা–বিজ্ঞান বহির্ভূত' বলতে পারেন না। কোনো অধ্যাপক যদি ইউক্লিডসের কোনো সমস্যাকে নক্সা এঁকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আপনি তাকে ইউক্লিড বহির্ভূত বলতে পারেন না। বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলীতে শুধু মূলনীতি ও সূক্ষ্ম বিষয়াদিই বিবৃত করা হয়। আর ব্যবহারিক বিষয়াদি শিক্ষকদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়। কারণ শিক্ষক সম্ভব পরীক্ষা–নিরীক্ষার সাহায্যে যে বিষয়টিকে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাতলাতে পারেন, তাকে লিখিত ভাষায় বিবৃত করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয়িত হবে, তবুও শিক্ষার্থীদের পক্ষে লিখিত বিবরণ অনুযায়ী সঠিকভাবে আমল করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। তাছাড়া এতে গ্রন্থের সাহিত্য গুণ বিনষ্ট হওয়ার প্রশ্ন তো আছেই। একজন নগণ্য মানুষ পর্যন্ত জ্ঞান–বিজ্ঞান ও শিল্পকলা শিক্ষাদানের বেলায় এ বৈজ্ঞানিক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে, আর আপনি চান যে, যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কুরআন নাযিল করেছেন, তিনি একে উপেক্ষা করলে ভালো হতো! আপনি চান যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কিতাবে নামাযের সময়–

www.bjilibrary.com

জ্ঞাপক নক্‌শা বানিয়ে দিলে, রাকয়াতগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দিলে এবং রুকূ, সিজদা, কিয়াম ও কুয়ূদের ধরনটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলে ভালো হতো। বরং নামাযের প্রচলিত বইগুলোর মতো প্রতিটি ধরনের চিত্রও এঁকে দিলে ভালো করতেন। পরন্তু তকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত পঠনীয় সূরা-কেরাত ও দোয়া-দরূদগুলো লিখে দিলে এবং তারপর প্রত্যেক নামাজীর জন্যে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি মাস্‌য়ালা-মাসায়েলগুলো লিপিবদ্ধ করলে ভালো হতো। এভাবে কুরআনের অন্তত দু'তিন পারা নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যেতো। একইভাবে রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির বিস্তৃত মাসয়ালা বর্ণনায়ও দু'তিন পারা করে ব্যয়িত হতো। সেই সঙ্গে শরীয়াতের অন্যান্য বিষয়গুলোর—যেগুলো প্রায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর পরিব্যাপ্ত—খুঁটিনাটি নিয়ম ও বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট করা হতো। এরূপ হলে তো নিসন্দেহে আপনার আকাংখা পূর্ণ হতো এবং শরীয়তের কোনো বিষয়ই 'কোরআন বহির্ভূত' হতো না, কিন্তু এর ফলে কুরআন মজীদের কলেবর অন্তত ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতো বিশাল হতো এবং একটি সংক্ষিপ্ত নীতি-নির্দেশক কিতাব হিসেবে এর দ্বারা যেসব ফায়দা অর্জিত হয়ে আসছে, তা সবই বাতিল হয়ে যেতো।

(৪) এটা তো আপনি নিজেও স্বীকার করেন যে, কুরআন-হাদীসে নামায রোযা এবং ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত নিয়মই বিবৃত করা হয়নি। বরং সেগুলোর ফরয হওয়ার ওপরই শুধু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সেগুলো কায়েম করার জন্যে পরপর তাকিদ করা হয়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও সেগুলো আদায় করার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে—সেগুলোকে কিছুতে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক নিয়ম বলা যেতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, সেগুলোর খুঁটিনাটি নিয়ম নির্ধারণ করছে কে? এ প্রসঙ্গে যার যেরূপ ইচ্ছা আমল করার জন্যে কি কাজটি প্রত্যেকের বিচার-শক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত ছিলো? যদি এরূপ করা হতো, তাহলে দু'জন মুসলমানের নামাযও সম্ভবত একরূপ হতো না। অনুরূপভাবে ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যবহারিক পদ্ধতিতেও মুসলমানদের মধ্যে কোনোরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতো না। আজকে আপনি যে 'জাতীয় ঐক্যসূত্রের' বিভিন্নতার জন্যে অনুতাপ করছেন, তা শুধু কতিপয় পদ্ধতির মতভেদের ফল। তবুও প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে কোটি কোটি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কুরআনী বিধি-ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ব্যবহারিক নিয়ম নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই

www.bjilibrary.com

যদি স্বাধীন হতো, তাহলে ইসলামের অনুবর্তীদের মধ্যে আদৌ কোনো নিয়ম শৃংখলার অস্তিত্ব থাকতো না। এ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগুলোকে যে জিনিসটি এক জাতিতে পরিণত করেছে, তা বিশ্বাস ও কর্মের সাধর্ম্য ও সমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, একটি সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কর্মগত ঐক্য বিশ্বাসগত ঐক্যের চাইতেও বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হচ্ছে প্রবৃত্তির গোলাম। কেবল অনুভূতি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাই তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। আর এ কর্মপন্থার সাদৃশ্য ও সাধর্ম্যই মানুষের মধ্যে সামাজিক অনুভূতির সৃষ্টি করে। কাজেই কর্মপন্থাকে লোকদের ইখতিয়ারের ওপর ছেড়ে দেয়ার অনিবার্য পরিণতি এ হতো যে, নিছক বিশ্বাসগত ঐক্যবলে মুসলমান কখনো এক জাতিতে পরিণত হতে পারে না।

কাজেই এটা যখন সর্বজনস্বীকৃত যে, জাতীয় ঐক্যের জন্যে কর্মগত ঐক্য অপরিহার্য এবং যেসব বিস্তৃত নিয়ম-কানুনের দ্বারা এ ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে সেসব বিবৃত করেননি, তখন নবী করীম (স) ছাড়া কুরআন মুতাবেক আমল করার নিয়ম বিধান তৈরী করার অধিকার আর কার ছিলো—আপনিই বরং বলুন। তাঁর নির্ধারিত নিয়ম ছাড়া আর কিসের ভিত্তিতে এ জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো? তিনি ছাড়া আর কাকে হাকেমে আ'লা স্বীকার করে সমস্ত মুসলমান তার অনুসরণের ব্যাপারে একমত হতে পারতো? বস্তুত আজ তেরোশো বছর ধরে সমগ্র মুসলমান যে একই ধরনে নামায পড়ে, একই পন্থায় হজ্জ সমাপন করে, একই সময় একইভাবে রোযা পালন করে—এটা হযরত (স)-এরই শিক্ষার প্রেরণার ফল। কেবল খুঁটিনাটি ব্যাপারেই তাদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং তারও কারণ এ নয় যে, কোনো মুসলমান ঐসব খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারণ করার ব্যাপারে নিজকে হকদার মনে করে। বরং তার কারণ এই যে, প্রত্যেক দল যেসব খুঁটিনাটি নিয়ম মেনে চলে, নিজস্ব জ্ঞান মুতাবেক সেগুলোকে হযরত (স) অনুসৃত নিয়ম মনে করে, এরপর হযরত (স)-এর ইমামত এবং তাঁর সুন্নত অবশ্য পালনীয় হওয়ার কথা। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক ছাড়া গোটা উম্মতই একমত, আর এ ঐকমত্যের ওপর মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য নির্ভরশীল।

(৫) আপনি কুরআন মজীদে আর একবার সন্ধান করে দেখুন, তাতে রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিস্তৃত নিয়মাবলী কোথায় রয়েছে? যাকাত সম্পর্কে তো

www.bjilibrary.com

এটুকুও বলা হয়নি যে, কোন্ জিনিসের কতোটা যাকাত দিতে হবে এবং যাকাতের নিছাব কি। হজ্জ ও রোযাতে যেসব নিয়ম কানুনকে আপনি বিস্তৃত নিয়মাবলী বলে আখ্যা দিচ্ছেন, তা নামায সংক্রান্ত নিয়মাবলীর চাইতেও সংক্ষিপ্ত। আপনি একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, কুরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈমান সংক্রান্ত শিক্ষা বর্ণনার ওপরই সমগ্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ এটাই হচ্ছে দীন-ইসলামের বুনিয়াদ। আর এবাদাত ও মুয়ামেলাত—তথা ব্যবহারিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে শুধু মূলনীতি ও মৌলিক সমস্যাবলীই বিবৃত করা হয়েছে আর বিস্তৃত নিয়মাবলী রসূলে করীমের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

(৬) মুসলমানদের ধ্বংসের মূল কারণ রেওয়ায়েতে নয়, বরং সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, জাহেলী বিদ্বেষ, খুঁটিনাটিকে মূলনীতির চাইতে বেশী গুরুত্ব দেবার নির্বুদ্ধিতা, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলকে ছেড়ে নিজস্ব কামনা-বাসনার প্রতি সীমাহীন নির্ভরতা এবং নিত্যনতুন পন্থা ও প্রণালী উদ্ভাবন করার প্রবণতা। এ জিনিসগুলো না থাকলে রেওয়ায়েতের মতানৈক্যের ফলে কোনোই ফেতনার সৃষ্টি হতে পারে না। রেওয়ায়েত দুর্বল হোক কি শক্তিশালী এবং তাদের মধ্যে যতোই মতানৈক্য থাকুক—তার সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন স্বয়ং রসূলে করীম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অনুসারীরাও হযরতকে তাদের নেতা ও শাসক মানার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। তাছাড়া রেওয়ায়েতের মতভেদের ফলে শুধু খুঁটিনাটি বিষয়েই মতভেদের সৃষ্টি হয়। কারণ দীন সংক্রান্ত মূলনীতি তো সব কিতাবুল্লাতেই বর্তমান রয়েছে, যা রেওয়ায়েতের মতভেদ থেকে উর্ধে এবং সমগ্র মুসলমানের কাছে সমান। কাজেই মুসলমান যদি আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এ সত্যটি উপলব্ধি করে যে, তারা সবাই কিতাবুল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী, রসূলে করীমের অনুগামী এবং তাদের মধ্যে দীন-ইসলামের মূলনীতি সমান—তাহলে খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন পন্থার অনুসারী হয়েও তারা পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এ উপলব্ধিটা না থাকলে রেওয়ায়েতের গোটা স্তূপ আগুনে নিক্ষেপ করলেও মতানৈক্য দূর হতে পারে না। কারণ মানুষের নফসের ভেতর এমন শয়তান রয়েছে, যা কুরআনকেও যুদ্ধ বিগ্রহের উপকরণ বানাতে কুণ্ঠিত নয়।

(৭) 'এক নিয়মে'র কথা আপনি কী অর্থে বলছেন? এর দ্বারা খুঁটিনাটি বিষয়েও কোনো মতভেদ থাকবে না-এ যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে

www.bjilibrary.com

পারে না। এমন কি মানবীয় প্রকৃতির সাথে মাত্র দু'জন লোকের দৃষ্টিকোণও সম্পূর্ণ এক হওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই আদৌ কোনো মতানৈক্য ও কর্ম-বৈসাদৃশ্য বর্তমান থাকবে না—এমনতরো 'এক নিয়ম' কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অবশ্য আপনি 'এক নিয়ম' বলতে যদি নীতিগত ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মকেই বুঝাতে চান, তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূল সেরূপ নিয়মই কায়েম করে দিয়েছেন। আর মুসলমানরা যদি মূলনীতি ও খুঁটিনাটির পার্থক্যটা বোঝে এবং উভয়ের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে, তবে সেরূপ নিয়ম সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

(প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৩৪)

www.bjilibrary.com

একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তার জবাব

তরজুমানুল কুরআনের জনৈক পাঠক লিখছেন ঃ

'আমি আল্লামা হোসাইন বিন্ মুবাররক (মৃত্যু ৯০০ হিজরী) কৃত 'তাজরীদুল বুখারীর' উর্দূ অনুবাদের (ফিরোজ উদ্দীন কর্তৃক লাহোর থেকে প্রকাশিত) ৮১ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি অধ্যয়ন করেছি ঃ

হযরত আনাস বিন্ মালেক থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম (স) রাত-দিনের মধ্যে একই সময়ে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন এগারো জন (একটি বর্ণনা অনুসারে নয় জন ছিলেন)। হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তিনি কি এতোটা শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন ঃ আমরা তো বলতাম যে, তাঁকে তিরিশ জন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছে।

আশা করি, আপনি উপরোক্ত হাদীসটির যথার্থ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন। এটা কি সত্য যে, হযরত একই সময়ের মধ্যে তাঁর স্ত্রীদের সমীপবর্তী হতেন? আর যদি সমীপবর্তী হয়ে থাকেন, তাহলে তা হযরত আনাস কী করে জানতে পারলেন? হযরত কি এ সমীপবর্তিতার কথা হযরত আনাসকে বলেছেন? কিংবা স্ত্রীদের কেউ এ দাম্পত্য সম্পর্কের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন? অথবা হযরতের দাম্পত্য গোপনীয়তার কথা হযরত আনাস সর্বদা জানতে পারতেন? কিংবা হযরত আনাস এই গোপনীয়তার কথা জানবার জন্যে তৎপর থাকতেন? স্ত্রীদের কাছে গমনের জন্যে যখন হযরতের পালা নির্দিষ্ট ছিলো, তখন এতো দ্রুত সমীপবর্তী হওয়ার কী প্রয়োজনটা ছিলো? এক সময় এতো বেশী স্ত্রী গমনের ফলে হযরতের স্বাস্থ্য ও পৌরুষের ওপর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না?

এই হাদীসটি বুখারী শরীফের দু'জায়গায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রথমত, কিতাবুল গুসলো اِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِه بِغُسْلٍ وَاحِد শীর্ষক অনুচ্ছেদে। দ্বিতীয়ত, কিতাবুন্ নিকাহে مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِه فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ শীর্ষক অনুচ্ছেদে। প্রথম অনুচ্ছেদে হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপঃ

www.bjilibrary.com

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُوْرُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ احْدٰى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَوَ كَانَ يُطِيْقُهُ ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ اُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلَاثِيْنَ –

"নবী করীম (স) রাত ও দিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রীদের কাছে একই সময় ঘুরে আসতেন এবং তাঁরা সংখ্যায় এগারো জন ছিলেন। কাতাদাহ্ বলেনঃ আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর এতোখানি শক্তি ছিলো? আনাস জবাব দিলেন, আমরা পরস্পরে বলাবলি করতাম যে, হযরতকে ৩০ জন পুরুষের শক্তি দান করা হয়েছে।"

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সাঈদ বিন্ আবী উরুব কাতাদার বরাত দিয়ে হযরত আনাসের এ হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ–

"নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীদের কাছে একই রাত্রে চক্কর দিতেন এবং সে সময়ে তাঁর স্ত্রী ছিলো নয় জন।"

উভয় হাদীস একই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে ; আর তাহলো এই যে, কেউ যদি একাধিকবার স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে প্রত্যেক বারই গোসল করা অপরিহার্য নয়। বরং সকল বারের জন্যে একবার গোসল করাই যথেষ্ট। এছাড়া নবী সহ-ধর্মীনীদের সংখ্যা নয় কি এগারো জন ছিলেন এবং হযরত তাঁদের সবার সঙ্গে সহবাস করার শক্তি রাখতেন কিনা, এটা শুধু প্রসঙ্গত এসে গিয়েছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী উভয় জায়গায় তরজুমা অধ্যায়ে غسل واحد লিখিছেন।

ইমাম নাসায়ীও بَابُ اِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ اِحْدَاثِ الْغُسْلِ শীর্ষক অনুচ্ছেদে একই বিষয় সম্বলিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। একটিতে আছে طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ একরাত্রে তিনি স্ত্রীদের কাছে যাতায়াত করেন এবং শুধু একবার গোসল করেন। অপর হাদীসে আছে كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ তিনি স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং তারপর একবার মাত্র গোসল করতেন।

www.bjilibrary.com

আবু দাউদ بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَعُوْدُ শীর্ষক অনুচ্ছেদে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ অর্থ একদিন তিনি স্ত্রীদের কাছে যাতায়াত করেন এবং তারপর একবার গোসল করেন। এরপর হযরত আবু রাফে' থেকে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذَا وَعِنْدَ هٰذَا قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا- قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ-

"একবার হযরত তাঁর স্ত্রীদের কাছে চক্কর দেন এবং প্রত্যেকের কাছেই পৃথকভাবে গোসল করেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি একবার কেন গোসল করলেন না? হযরত বলেন, এটা হচ্ছে অধিক পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি।"

অতপর হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তার ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ بَدَالَهُ اَنْ يُّعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً

"তোমাদের যে কেউ আপন স্ত্রীর কাছে গমন করবে এবং তারপর দ্বিতীয় বার সমীপবর্তী হতে চাইবে, সে যেনো উভয় সমীপবর্তিতার মধ্যে অযু করে নেয়।"

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিজীও আব্‌ওয়াবুত্‌ তাহারাতে উদ্ধৃত করেছেন, এই তিন শ্রেণীর হাদীস একত্র করলে একটিমাত্র মাসয়ালা বেরোয়। তাহলো এই যে, একাধিকবার স্ত্রী-সহবাস করলে প্রত্যেকবার পৃথকভাবে গোসল করাই হলো অধিকতর পবিত্র পন্থা। এটা যদি সম্ভব না হয় তো 'অন্তত অযু করে নেয়া উচিত। কিন্তু এটা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়। একাধিকবার স্ত্রী-গমনের পর কেবল একবার গোসল করে নিলেও পবিত্রতার শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

এখন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্নিবিষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। নবী করীম (স) এমন একটি জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যা তাহজিব ও তামাদ্দুনের একেবারে প্রাথমিক স্তরে

www.bjilibrary.com

ছিলো। তাঁর ওপর আল্লাহ্ তায়ালা শুধু তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিশুদ্ধ করার কাজই ন্যস্ত করেননি বরং তাদের বাস্তব জীবন পরিশুদ্ধ করা, তাদেরকে মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে মার্জিত চরিত্র, পবিত্র সামাজিকতা, সুসভ্য নাগরিকতা, সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার-বিধি (Manners) শিক্ষা দেয়ার কাজও তাঁরই ওপর ন্যস্ত ছিলো। কেবল ওয়াজ-নছিহত আর বচন-ভাষণ দ্বারাই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। যদি কতিপয় নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে ডেকে কিছু বাচনিক হেদায়াত দান করা হতো, তাহলে ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনকালে একটি গোটা জাতিকে অসভ্যতার নিম্নতম স্তর থেকে সভ্যতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত করা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। এর জন্যে তাঁর নিজের জীবনেই তাদের সামনে মানবতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ পেশ করা এবং সে আদর্শ অনুসারে তাদের জীবন গঠনের পূর্ণ গঠনের পূর্ণ সুযোগ দান করার একান্ত প্রয়োজন ছিলো। তাই সে কাজই তিনি সম্পাদন করেন।

বস্তুত তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি দিককে জাতির শিক্ষার জন্যে উন্মুক্ত (Public) করে দিয়ে আত্মত্যাগের অতুলনীয় নজীর স্থাপন করেছিলেন। জীবনের কোনো জিনিসকেই তিনি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার (Private) মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। এমন কি, যেসব বিষয় দুনিয়ার কেউ সাধারণ্যে উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত হয় না, সেগুলোও তিনি গোপন করেননি। তিনি সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর কাজের পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে লোকদেরকে সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। একজন পয়গাম্বর ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি এতো বড়ো কুরবাণী কিছুতেই করতে পারে না। আর কোনো ব্যক্তি নিজের গোটা জীবনকে এভাবে লোক-চক্ষুর সামনে তুলে ধরার মতো দুসাহসও করতে পারে না। বস্তুত এই একটি মাত্র জিনিসই সেই বিস্ময়কর লোকটির নবুয়াতকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। দুনিয়ার অতীত ও বর্তমান ইতিহাসে তিনিই একমাত্র পুরুষ, যিনি পূর্ণ তেইশটি বছর সর্বদা ও সর্বাবস্থায় লোকচক্ষুর সামনে জীবন যাপন করেছেন—হাজার হাজার লোক তার প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি রেখেছে। নিজ গৃহে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সাথে আলাপ-ব্যবহারের ভেতরেও তার যাচাই-পরখ হচ্ছে এবং এতে গভীরতর অনুসন্ধানের পরও তাঁর চরিত্রের ওপর একটি কালির ছিটাও লক্ষ্য করা তো দূরের কথা, বরং অপরকে তিনি যা কিছু শিক্ষা দিতেন, তার নিজের জীবনও তার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ছিলো এ সত্যই

www.bjilibrary.com

প্রমাণিত হয়েছে। বরঞ্চ এ সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কখনো এক লহমার জন্যেও ন্যায়পরতা, তাকওয়া, সততা ও পবিত্রতার আদর্শ স্থান থেকে বিচ্যুত হননি—এ সত্যই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর তাই দেখা গিয়েছে যে, যারা সবচাইতে নিকট থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে, তারাই সবচাইতে বেশী তাঁর অনুরক্ত হয়েছে।

যাহোক, এটা ছিলো প্রাসঙ্গিক কথা। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো এই যে, চলাফেরায়, ওঠা-বসায়, শয়নে-জাগনে, পারিবারিক কার্যকলাপে, এবাদাত-বন্দেগীতে, সামাজিক আদান প্রদানে—এক কথায় জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর আমলকে দেখার জন্যে নবী করীম (স) লোকদেরকে সাধারণ অনুমতি প্রদান করেছিলেন। অনুরূপভাবে তাকে যারা দেখেছে, তাদের থেকে শোনার, যারা জেনেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করার, এমন কি খোদ তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করার এবং সেই আদর্শ (Ideal) জীবনের অনুকরণে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করার উপদেশ দিয়েছেন। এভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধারাকেও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে অবহিত করার জন্যে তিনি স্বীয় স্ত্রীদেরকেও সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। বস্তুত লোকদের বাহ্যিক জীবনই শুধু নয়, তাদের গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য জীবনও যাতে সভ্যতা ও ভব্যতায়, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় সুশোভিত হয়ে ওঠে, সে জন্যেই তিনি এরূপ করেছিলেন। এ কারণেই তাঁর পুন্যবর্তী স্ত্রীগণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এমন সব বিষয়াদিও লোকদের কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, যেগুলো সাধরণভাবে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না কিংবা অপরকে জানবার সুযোগ দিতেও সম্মত নয়। পরন্তু এ শিক্ষার ব্যাপারটিকে সহজতর করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর স্ত্রীদেরকে তামাম মুসলমানের জন্য প্রকৃত মায়ের মতো মর্যাদা দিয়েছিলেন। বস্তুত মায়েরা যাতে পুত্রদের সাথে খোলাখুলি ও নিসঙ্কোচে আলাপ করতে পারেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিতার প্রতিটি ক্রিয়া-কলাপকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা, হালাল ও হারামের সীমারেখা জানা এবং পাক-নাপাক ও সভ্যতা-অসভ্যতার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে তাদের সামনে বিবৃত করতে পারেন, তজ্জন্যে এরূপ করা হয়েছিলো। তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে হযরত অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়া সত্ত্বেও লোকদের শিক্ষার জন্যে লজ্জাকে শিকায় তুলে রেখেছিলেন। এবং সব রকমের ব্যাপারে নিজের আধ্যাত্মিক সন্তানদের—যার মধ্যে পুত্র ও কন্যা সকলে শামিল ছিলো—নিজেই পথনির্দেশ করতেন। তাদেরকে যা কিছু ইচ্ছা জিজ্ঞেস করবার

www.bjilibrary.com

অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তার কর্মধারা দেখে একটি পবিত্র, সুসভ্য ও মার্জিত জীবনের পরিচয় জানবার সুযোগ দান করেছিলেন।

পোশাক ও দেহের পবিত্রতা ছিলো এ শিক্ষারই একটি অংশ। সেকালের আরববাসীরা তো অসভ্য ছিলো ; আজকে যেসব জাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আসমানে ওঠার দাবী করে, তাদের অবস্থাটা কি দেখা যাচ্ছে? খাওয়ার পর তারা মুখ পর্যন্ত পরিষ্কার করতে জানে না। পায়খানা-পেশাবের পর দৈহিক পবিত্রতা সম্পর্কে অবহিত নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে আর পাতলুনের বোতাম লাগিয়ে চলে যায়। পায়খানার পর কামোড থেকে উঠে অমনি টাবের মধ্যে নেমে যায়।

আর নারী-পুরুষের সম্পর্কের বেলায় তো এদের অসভ্যতা, নির্লজ্জতা ও অপবিত্রতা এতোখানি সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, কোনো ভদ্রলোকের সামনে তা আলোচনা করা চলে না। আজকের সুসভ্য ও প্রগতিশীল জাতিগুলোর অবস্থাই যখন এরূপ, তখন সভ্যতা ও তামাদ্দুনের প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত একটি জাতির অবস্থা আর কী হবে! তাই নবী করীম (স) আগমন করে এদের মনের পরিশুদ্ধিই শুধু করলেন না, তাদেরকে পোশাক ও দেহের পবিত্রতার নিয়মও শিখিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে পবিত্রতার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করলেন, অপবিত্রতা ও পবিত্রতার পার্থক্যবোধ জাগ্রত করলেন। জীবন যাপনের নোংরা, ঘৃণ্য, অমার্জিত ও অর্থহীন পন্থাগুলোকে নাকচ করে দিলেন। নিজের কথা ও কাজের দ্বারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সভ্যতার নিয়ম-কানুনের অনুরক্ত করে তুললেন। এ কারণে হযরতের পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কতকটা তাদের সামনে উন্মুক্ত করে ধরা একান্ত অপরিহার্য ছিলো। বস্তুত লোকেরা যা জিজ্ঞেস করে না, জিজ্ঞেস করতে পারে না কিংবা তিনি মুখে বলবার সুযোগ পাবেন না, তাও যাতে তাঁর জীবনধারা দেখেই বুঝতে পারে, সে জন্যেই এ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। এভাবে তাঁর গোটা জীবনই একটা শিক্ষায় পরিণত হয়েছিলো। তিনি মুখে মুখেই লোকদের জন্যে একটি জীবন্ত শিক্ষায় পরিণত হয়েছিলেন।

লোকেরা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে যখনি তাঁর স্ত্রীদের এবং অন্যান্য সাহাবী ও সাহাবিয়াদের ভাষায়, এমন কি খোদ হযরতের নিজস্ব ভাষায় জানাবাত, হায়েয, নেফাস এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে মানুষের কর্মনীতি সংক্রান্ত মাস্‌য়ালা-মাসায়েলের বর্ণনা পড়ে, অমনি এগুলো লজ্জাহীন কথা বলে

www.bjilibrary.com

প্রতিবাদ শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই তারা বুঝতে পারতো যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত তাঁর উম্মতের জন্যে এ একটি মস্তবড়ো আত্মত্যাগ বরণ করেছেন। যে মহান ব্যক্তি এতোদূর লজ্জাশীল ছিলেন যে, তাঁর সহধর্মীনীরা পর্যন্ত কখনো তাঁকে বিবস্ত্র দেখতে পায়নি, এমন কি যিনি কখনো নিজেও বিবস্ত্র হওয়া পসন্দ করেননি, তিনি শুধু নিজ উম্মতকে পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও সভ্যতা শিক্ষা দেয়ার জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতম ঘটনাবলী পর্যন্ত বাইরে প্রকাশ করতে স্বীয় স্ত্রীদের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে যতোদূর সম্ভব ওয়াকিফহাল হওয়া এবং বাইরের লোকদের কাছে তা প্রকাশ করার জন্যে নিজের বিশেষ খাদেমকে সুযোগ দিয়েছিলেন। এটা কি কোনো মামুলি আত্মত্যাগ ছিলো? বস্তুত এ আত্মত্যাগের ফলে শুধু আরববাসীরই নয়, বরং দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, পোশাকের পবিত্রতা, চালচলনে নির্মলতা এবং যৌনাচরণের সভ্যতা ও শোভনতার এক সাধারণ নিয়মের অনুবর্তী হয়। নচেত এ বিষয়গুলোকে যদি নিছক ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বিচারবোধের ওপর ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা ব্যক্তিগত জীবনের গোপন দিকগুলোতে পশুর অনুরূপ হতো। কারণ এ দিকগুলো সম্পর্কে মানুষের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর কোনো ব্যবস্থা আজো দুনিয়ার কোথাও হয়নি।

হযরতের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে হযরত আনাসের অবহিতি সম্বন্ধে প্রশ্নকারী যেসব সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এ হচ্ছে সেগুলোর জবাব। এবার আমরা প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের প্রতি আলোকপাত করছি।

শুরুতে আমরা যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছি, তাতে كان يطوف ياكان يدور ياطاف ইত্যাকার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো 'চক্কর দেয়া' 'বেড়ান' ইতাদি। এ দ্বারা এই তাৎপর্য বোঝা যায় যে, হযরত (স) কখনো কখনো এক রাত্রের ভেতর তাঁর সমস্ত স্ত্রীর কাছে গমন করতেন। অবশ্য তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিলো এক এক রাত এক এক স্ত্রীর কাছে অতিবাহিত করা, কিন্তু কখনো কখনো এমনো হতো যে, এক রাত্রেই তিনি সবার কাছে ঘুরে আসতেন। এখানে বর্ণনাকারী শুধু এটুকুরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, তিনি সবার কাছে গিয়েছেন। কিন্তু সবার কাছে গেলে সবার সঙ্গে সহবাসও করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটা বর্ণনাকারী নিজেই অনুমান করছেন যে, সবার কাছে যখন গিয়েছেন, তখন সবার সঙ্গে

www.bjilibrary.com

সহবাসও করেছেন। বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আনাস। তাঁর বয়সের দিকে তাকালে তাঁর পক্ষে এ ধরনের অনুমান করাটা বিস্ময়কর কিছু নয়। তিনি যখন হযরতের খেদমতে নিয়োজতি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১০ বছর। আর তাঁর মৃত্যুকালে হয়েছিল ২০ বছর। কাজেই এ ধরনের বিষয়ে এতো কম বয়সের একটি যুবকের অনুমান খুব বেশী নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কারণ যুবক ছেলে যখন কোনো স্বামীকে স্ত্রীর কাছে যেতে দেখে, তখন তার মন অনর্থক সহবাসের দিকে ধাবিত হয়। স্ত্রীর সঙ্গে এক বয়স্ক লোকের সম্পর্ক যে শুধু সহবাসের সম্পর্কই হয় না—এ কথাটি সে আন্দাজই করতে পারে না।

পরন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে, হযরতের পুন্যবতী স্ত্রীদের মধ্যে একজন, অর্থাৎ জয়নাব বিন্‌তে খোজায়মা (রা) হিজরী ৩ সালে হযরতের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং মাত্র দু-তিন মাস জীবিত থেকে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় হযরত সওদাহ্ ছিলেন অতিশয় বয়োবৃদ্ধা এবং এ জন্যে তাঁর পালা দিয়েছিলেন হযরত আয়েশাকে। এ দু'জনকে পৃথক করার পর হিজরী ৪ সালে হযরতের স্ত্রী ছিলো মাত্র তিনজন। ৫ হিজরীতে একজন বৃদ্ধি পায়। হিজরী ৬ সালে আরো একজন বাড়ে। ৭ হিরীতে তিনি আরো ৩জন স্ত্রী পরিগ্রহণ করেন। এভাবে শেষ বয়সে হযরতের স্ত্রী সংখ্যা মাত্র ৮ জনে দাঁড়ায়—যাঁদের সঙ্গে তিনি রাত্রিবাস করতেন বলে অনুমান করা চলে। কাজেই নয় বা এগারো জন স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করা সম্পর্কে যে অনুমান করা হয়, এ দ্বারা তারও দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে।

হযরত আনাস তো শুধু এটুকু বলেছেন যে, হযরত (স)-কে ৩০/৪০ জন পুরুষের সমান শক্তি দেয়া হয়েছিলো। অন্যান্য রেওয়ায়েতে—যেগুলো আবু নয়ীম, আহমদ, নিসায়ী, হাকেম প্রমুখ উদ্ধৃত করেছেন—তো এর চাইতেও বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, হযরতকে যে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিলো, তারা দুনিয়ার নয়, বরং বেহেশ্‌তী পুরুষ। আর বেহেশ্‌তের পত্যেক পুরুষ দুনিয়ার একশো পুরুষের সমান শক্তিশালী হবে। এভাবে চল্লিশকে একশো দিয়ে গুণ দিলে দেখা যায় যে, হযরতের মধ্যে চার হাজার পুরুষের সমান শক্তি ছিলো। এসব কথা নেহাত ভক্তিমূলক। আর এগুলো এমন লোকেরা বলেছেন, যারা হযরতের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত ছিলেন। আর তাই যেসব অস্বাভাবিক শক্তিকে তাঁরা সদিচ্ছার সঙ্গে গৌরবের

www.bjilibrary.com

বিষয় মনে করতেন, হযরতের মধ্যে সেগুলোর সমাবেশ ঘটেছে বলে বিশ্বাস পোষণ করতেন। এ বিষয়গুলোতেই বর্তমান কালের একজন সুপণ্ডিত ও সম্মানিত ব্যক্তি—যার জ্ঞান-গরিমা ও পরহেজগারীর প্রতি আমরা পুরোপুরি শ্রদ্ধা পোষণ করি—তাঁর একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। অতপর তিনি এভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, হযরত নবী করীম (স) চার হাজার পুরুষের সমান শক্তি রাখতেন এবং ১৬ হাজার স্ত্রী রাখার যোগ্য ছিলেন, তবু তিনি মাত্র ১১ জন স্ত্রীতেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এ কথাগুলো যদিও অতিশয় ভক্তি-বিহ্বলতার কারণে বলা হয়েছে ; কিন্তু এ ধরনের কথা যে কোনো লেখনী থেকে যে কোনো নিয়াতেই বেরোক না কেন, আমরা এ কথা না বলে পারছি না যে, এভাবে আল্লাহ্‌র নবীর যৌনশক্তি পরিমাপ করা সুস্থ রুচিবোধের পক্ষেও পীড়াদায়ক—একে ইসলামের দুশমন, সংশয়বাদী ও সন্দিগ্ধমনা লোকদের মুকাবিলায় যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের সামনে মহাম্মাদ (স)-কে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য হিন্দু দেবতাদের মতো পেশ করে এর দ্বারা তাদের মনে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত হবে বলে আশা করা তো দূরের কথা হযরতের বহুবিবাহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির প্রতিবাদে বহুতরো অকাট্য দলিল প্রয়োগ করা যেতে পারে সেগুলোকে বর্জন করে এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করা নিসন্দেহে দুঃখজনক। বিশেষ করে যখন আলেমদের দুশমনরা তিলমাত্র ভুলকে তাল বানিয়ে প্রচার করে এবং আলেমদের পরিবর্তে খোদ ইসলামের ওপরই হামলা চালিয়ে বসে, তখন এ ধরনের অসর্তকতা আরো পীড়াদায়ক।

(প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬)

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রধান কার্যালয়	*বিক্রয় কেন্দ্র*
আধুনিক প্রকাশনী ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	☐ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী ☐ ৫৫, খানজাহান আলী রোড, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা তারের পুকুর, খুলনা ☐ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম